প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৬

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস । ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪
মুদ্রক : সুধীর শিকদার
শিকদার প্রিণ্টার্স । ১৫এ নলিন সরকার স্ট্রিট । কলকাতা ৪

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার নট-জীবনের প্রথম দীক্ষা আপনার কাছে। আপনিই আমার প্রথম নাট্যগুরু। তাই—তাহারই ফল—'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম। ভাল হউক—মন্দ হউক—এ গ্রন্থ আপনার ভাল লাগিবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি—

কলিকাতা
১৭ই শ্রাবণ ১৩৪০

চিরকৃতজ্ঞ
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৭৫-১৯৩৪

বাঙলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে তিরিশটি নাটক — এবং একাধিক মঞ্চসফল নাটক — ও একটি অমূল্য নাট্যস্মৃতির রচয়িতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজ কিন্তু অনেকটাই অবজ্ঞাত। সাহিত্যিক আদর্শের তারতম্যই যদি তাঁর প্রতি উত্তরকালের উপেক্ষার একমাত্র কারণ হ'ত, তাহ'লে তাকে যুগধর্ম হিশেবে মেনে নিতে আপত্তি থাকতনা। এ-কথা সত্যি, তাঁর নাটকগুলো প্রত্যক্ষতই লেখা হয়েছিল মঞ্চের প্রয়োজনে। এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা ভাবতে অভ্যস্ত যে মঞ্চ-মুখ্য নাটকমাত্রেই অপকৃষ্ট! কিন্তু নাট্যসাহিত্যে অপরেশচন্দ্রের স্থান যেখানেই হোক্-না কেন, মঞ্চের ইতিহাসে তিনি একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এবং সেইজন্যেই গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯১২) পর অংশত ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর (১৯১৬) পর থেকে সম্পূর্ণভাবে, মনোমোহনে শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা (১৯২৪) পর্যন্ত বাঙালি দর্শকের রুচি ও চাহিদা এবং মঞ্চের প্রবণতা ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক উপকরণ নিহিত আছে অপরেশচন্দ্রের নাটকগুলিতে।

সমকালীন দর্শকের মনোরঞ্জক অনেক-কিছুই অপরেশচন্দ্র পরিবেষণ করেছিলেন তাঁর নাটকে। তবু লোকলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি তাঁকে এতটা নির্বিবেক ক'রে তোলেনি, যাতে তিনি গা ভাসাতে পারতেন জনপ্রিয়তার জোয়ারে। একাধিক যুগান্তরের দর্শক তিনি, নতুন যুগের পদধ্বনিও শুনতে পেরেছিলেন। গিরিশ ঘরানার শেষ পুরুষ অপরেশচন্দ্র তাই নতুন যুগের প্রতিবন্ধকতা করেননি, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন মানিয়ে নিতে, না-পারলে স'রে দাঁড়িয়েছেন সমর্যাদায়। নাট্যকার-প্রধান মঞ্চ যখন ক্রমে পরিণত হচ্ছে অভিনেতৃ-প্রধান মঞ্চে, বাঙলা নাট্যশালার সেই সন্ধিক্ষণের সাক্ষী অপরেশচন্দ্র। বিদায়ী ও নবাগতের প্রতি তিনি সমান আকৃষ্ট: যেমন দানীবাবুকে বরণ ক'রে আনেন নাট্যাচার্য হিশেবে, তেমনি দুর্গাদাস-তিনকড়ি চক্রবর্তী-অহীন্দ্র চৌধুরীর হাতে পেশাদারি মঞ্চের নাড়াও বাঁধেন তিনি। অন্য অনেকের মতো প্রতিভাভীতিও যে তাঁর ছিলনা, শিশিরকুমারকে আর্ট থিয়েটারে নিয়ে আসার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

জীবনের উপান্তে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙলা মঞ্চের পরবর্তী পর্বের অভিনিবেশ কেন্দ্রিত হবে সামাজিক সমস্যামূলক নাটকে। অনুরূপা দেবীর তিনটি উপন্যাসের তাঁর করা নাট্যরূপ তারই প্রমাণ দেবে। এগুলির ব্যবসায়িক সফলতা সত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ও স্বভাবের সীমা পেরিয়ে এ-জাতীয় নাটক লিখতে বসেননি। মঞ্চ তাঁর প্রথম প্রণয় হ'লেও নাটকের গুণেও যে তিনি দৃষ্টি-বিমুখ ছিলেননা, তার পরিচয় নাটক নির্বাচনে তাঁর মনের ব্যাপ্তিতে : একদিকে সংস্কৃত প্রহসন ও কংগ্রীভ বা শেরিডন, অন্যদিকে কালিদাস বা ইবসেন। পুরনো অঙ্কবিভাগবহুল নাট্যরচনারীতি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করলেও বাঙলাদেশে তাঁর পরিচালনাধীন মঞ্চই প্রথম একাঙ্ক প্রযোজনার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

তাঁর এই মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা যে নিছক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি-প্রেষিত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর নাটকের ভাষা বিশ্লেষণ করলে। গিরিশযুগের যে-নাট্যসংস্কারের মধ্যে তাঁর নটজীবনের বিকাশ হয়েছে, সেই ধর্মনির্ভর পৌরাণিক নাটকের কালবুট তিনি ত্যাগ করেননি, কিন্তু তাঁর ভাষায় লেগেছিল রাবীন্দ্রিক লালিত্য। এবং রবীন্দ্রনাথকে পেশাদার মঞ্চে সফল প্রমাণের সিংহভাগ আজ শিশিরকুমারকে দেওয়া হ'লেও, ইতিহাস সাক্ষী দেবে অপরেশচন্দ্র পরিচালিত আর্ট থিয়েটারও সে-কৃতিত্বের অর্ধাংশভাগী। *

১

বর্ধমান জেলার নাড়ুগ্রামের ভগবানদাস মুখোপাধ্যায়রা সাত ভাই। ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্প্রীতির জন্য তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'সাতভেয়ে মুখুজ্যে' নামে। ব্রাহ্মণের অহমিকা তাঁদের পুরোমাত্রায় থাকলেও বহুবিবাহ তাঁরা করেননি, তবে কুলীনের কুল রাখতে ঘরজামাই হয়েছিলেন। ভগবানদাসও সেই ধারাতেই তৎকালীন নদীয়া জেলার মহেশপুরের পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রী পদ্মা দেবীর একমাত্র কন্যা শান্তমণিকে বিবাহ ক'রে সেখানেই বাস করতে থাকেন। তাঁদের তিন কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে বিপ্রদাস (১৮৫২-১৯১৪) মধ্যম। আচার-বিশ্বাসে মুখুজ্যেরা ছিলেন

* ৫ ভাদ্র ১৩৩২-এর 'নাচঘর'-এ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয় : "রবীন্দ্রনাথ এবার পাঁচ ছ'খানি নূতন নাটক লিখছেন। নাট্যজগতের কাছে এ এক পরম আনন্দ সংবাদ! আশা করি এইবার বাংলার সমস্ত রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অভিনয় হ'তে সুরু হবে। এই আশাতীত সৌভাগ্যের জন্য আমাদের সমস্ত কৃতজ্ঞতা আর্ট থিয়েটারের প্রাপ্য! কারণ তাঁরাই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রসিককে জমিয়ে তুলেছেন!'

শাক্ত, কিন্তু বিপ্রদাসের বিবাহ হয় স্থানীয় গোঁসাইবাড়ির নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে। এঁদেরই একমাত্র সন্তান অপরেশচন্দ্র মহেশপুরে তাঁর বাবার মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই ১৮৭৫।

অপরেশচন্দ্রের জন্মের পর বিপ্রদাস গোবরডাঙ্গা রাজবাড়ির উৎসাহে মহেশপুর ছেড়ে চ'লে আসেন। সেখানে স্থায়ী কোন জীবিকার সুযোগ না-হওয়ায় তিনি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে মেদিনীপুর যান। প্রায় দুই বৎসর সেখানে কাটিয়ে বিপ্রদাস কলকাতায় ফিরে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'কৃষিতত্ত্ব' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ (১৮৮৩) পর্যন্ত পত্রিকা পরিচালনার পর তিনি খণ্ডশঃ 'পাক-প্রণালী', 'মিষ্টান্নপাক', 'রন্ধনশিক্ষা' প্রভৃতি প্রকাশ করতে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিত্তশালী পরিবারের মেয়েদের রান্না শিখিয়ে ও ভোজে রান্নার নির্দেশ দিয়ে পরিবার প্রতিপালনের মতো অর্থ উপার্জন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঁচ বছরে হাতেখড়ির পর থেকে অপরেশচন্দ্রের পড়া শুরু হয় টালার পাঠশালায়। কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্কুলেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি, তারপর কয়েক বৎসর নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে প'ড়ে অপরেশচন্দ্র ভর্তি হন মেট্রপলিটন একাডেমিতে। ওঁদের বাস তখন চিৎপুর-বিডন স্ট্রিট সন্নিহিত অঞ্চলে। স্কুলে পড়বার সময়েই প্রতিবেশী থিয়েটারের কর্মী ও কর্তৃপক্ষীয়দের সহায়তায় থিয়েটার দেখা শুরু হয়। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি, অপরেশচন্দ্রের বয়স তখন ষোল, নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ রায় (মনোমোহন পাঁড়ের পিসতুতো ভাই। পরবর্তীকালে অপরেশচন্দ্র এঁকে 'পুষ্পাদিত্য' উৎসর্গ করেন।) তাঁকে একটি 'এ্যাক্টিং'-এর আড্ডায় নিয়ে যান। সে-বছর তিনি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তাই ঠিকমতো মহলায় যোগ দিতে না-পারলেও যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চললেন নিয়মিত। কিন্তু ঐ-বৎসরের শেষের দিকে, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় (১৭ অক্টোবর ১৮৯২) তাঁর মায়ের মৃত্যু একদিকে যেমন তাঁর পরীক্ষার প্রস্তুতিকে বানচাল ক'রে দিল, তেমনি বাড়ির নারীস্নেহও আর অবশিষ্ট রইলনা তাঁর জন্য। বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নাট্যচর্চা এতদূর এগোল যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ১৮৯৩-এর এনট্রান্সের অঙ্ক পরীক্ষায় 'সধবার একাদশী'র 'ইংরাজী বুকনীগুলি' লিখে রেখে চ'লে এসেছিলেন। ফল যা হওয়ার উচিত ছিল, তাই হ'ল। পরীক্ষা-বৈতরণী পারের দুরাশা তাঁর মনে আর জাগেনি।

কেতাবতি পড়া যখন বন্ধ হ'ল, সেই অখণ্ড অবসরের সম্পূর্ণ টাই অপরেশচন্দ্র উৎসর্গ করলেন অভিনেতা হওয়ার সাধনায়। শ্যামপুকুরের এ্যাক্‌টিং-এর আখড়া থেকে তখন তাঁরা মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তকে গুরু মেনে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'প্যাণ্ডোরা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন। মনে তখন অমৃত মিত্র, মহেন্দ্র বসু হওয়ার বাসনা। সে-বাসনায় গৌরব যতটাই থাক্, এ-কথা না-মেনে উপায় নেই, তার জন্যে পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত ছিলেননা তিনি। শুধু তিনি কেন, সে-যুগের যে-কোন অভিনেতাই এই অধ্যবসায়ের গুণে আর-কিছু না-হোক্ কণ্ঠসম্পদে অধিকার অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু প্যাণ্ডোরা থিয়েটার কোন নাটক মঞ্চস্থ করার আগেই বাড়ির আদেশে দলের 'কাপ্তেন'কে নাট্যসংসর্গ চিরকালের মতো ত্যাগ করতে হ'ল। মনোমোহনবাবু ঋণ দিয়েও সম্প্রদায়টিকে রক্ষা করতে পারলেননা। প্যাণ্ডোরা শুধু নামেই বেঁচে রইল। এই সময়ে অপরেশ-চন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্র বসুর কাছে অভিনয় শেখার জন্য যান। কিন্তু সে-পরিবেশ তাঁর ভালো লাগলনা। অপরেশচন্দ্রের এই নাট্যোৎসাহ বিপ্রদাসেরও আদৌ ভালো লাগেনি—তখনকার দিনে ভালো না-লাগার কারণও ছিল যথেষ্ট, তাছাড়া তিনি তেমন অসাধারণ বাবা ছিলেননা। তাঁরই গঞ্জনায় কৃতসংকল্প অপরেশচন্দ্র তাই বাড়ি ছাড়লেন। প্রায় আট মাস এখনকার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চলে বেড়িয়ে আবার বাবারই অনুনয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। প্যাণ্ডোরার ভাঙা দল তখন আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা চলছে। অপরেশচন্দ্র তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তার পুনর্জন্মে বাধা পড়ল অচিরেই।

এর পরবর্তী পর্ব মঞ্চের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের জীবনের দীর্ঘতম বিচ্ছেদের পর্ব। জীবিকা অন্বেষণের সময় তখন তাঁর। ব্রাহ্মণের সমাদরে ব্যারিষ্টার কে. বি. দত্তের বাবাকে ভাগবত পাঠ ক'রে শোনান—পরিপাটি জলখাবার, সঙ্গে সামান্য দক্ষিণা পান। পূর্বপরিচিত মনোমোহন পাঁড়ে তখন কন্‌ট্রাক্টর, মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে ঠিকাদারি করেন। এই সময় ই. আই. আর.-এর পার্সেল অফিসে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন বুকিং ক্লার্কের চাকরি করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে হোর মিলার কোম্পানির কেরানিগিরিতে বহাল হন অপরেশচন্দ্র। এই সময়েই বিপ্রদাস বাগ-বাজারের গাঙ্গুলীবাড়ির অসামান্যা সুন্দরী কন্যা শিখরবাসিনীর সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের বিবাহ দেন। পাত্রীর বয়স তখন দশ-এগার। ১৯০৪ পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র প্রধানত চাকুরিজীবী।

এই জীবন থেকে আবার থিয়েটারের জীবনে ফিরে আসার ইচ্ছে হয়ত তাঁর মনে সুপ্ত ছিল, কিন্তু নানা দলাদলির মধ্যে বাইরে থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এসে প্রতিষ্ঠালাভ তখনকার দিনে সহজসাধ্যও ছিলনা। অপরেশচন্দ্র তখন লেখার জগতে হাত পাকাচ্ছেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণের মাধ্যমে 'প্রভাকর' ও 'প্রয়াস' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। নলডাঙার জমিদার-বন্ধুর বাড়িতে কখনো-সখনো শখের অভিনয় করেন, কিন্তু পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তখন। এই সময়ে, ১৯০৩ সালে, কন্ট্রাক্টর মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে বড়দিনের আট রাত্রির 'হাউস' কিনে টিকিট বিক্রির ভার দেন অপরেশচন্দ্রকে। এতদিন মনোমোহন থিয়েটারে টাকা লগ্নী করেছেন, কিন্তু নিজে ব্যবসায়ে নামেননি। এই আট দিনের বিক্রীতে প্রলুব্ধ হয়ে তিনি এবার থিয়েটারের ব্যবসা শুরু করতে মনস্থ করেন। এদিকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর শিক্ষকতায় নড়াইলের জমিদার-বাড়িতে সংগঠিত 'ইলিসিয়াম থিয়েটার' নামে একটি সম্প্রদায়ে অপরেশচন্দ্রের ডাক পড়েছিল—অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে এখানেই অপরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে। সেখানে তিনি 'চন্দ্রশেখর', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি নাটকে নায়কের ভূমিকায় মহলা দেন। অর্ধেন্দুশেখরের কাছে এই চরিত্রগুলিতে শিক্ষাই একভাবে নট হিশেবে অপরেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ক'রে দেয়।

অমরেন্দ্রনাথ তখন ক্লাসিক ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী, চুনীলাল দেব মিনার্ভার লেসি, দুর্গাদাস দে সেক্রেটারি। অর্থঘটিত ব্যাপারে চুনীলাল ও দুর্গাদাসের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের অসদ্ভাব হওয়ায় এবং মনোমোহনের কাছে ঋণের কিস্তির টাকা বাকি পড়ায় ১৯০৪ সালের ২৭ জুলাই অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার অবশিষ্ট দুই বৎসরের 'লীজ' মনোমোহনের নামে লিখে দেন। মনোমোহন ইলিসিয়াম থেকে অপরেশ-চন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে আসেন। এখানে প্রধানত চুনীবাবুর আগ্রহে ও দৃঢ়তায় 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার, 'সংসারে' প্রিয়নাথ ও 'জনা'য় প্রবীরের ভূমিকায় বদলি অভিনেতা হিশেবে অপরেশচন্দ্র মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশের সুযোগ পান। কল-কাতার থিয়েটারে তখন উপহার-প্রথার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেপ্টেম্বরের শেষে উপহারের উন্মাদনা কিছুটা ক'মে গেলে ষ্টার থেকে নিয়ে আসা হ'ল অর্ধেন্দু-শেখরকে, ইউনিক থেকে তারাসুন্দরীকে। তারাসুন্দরীর সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের এখানেই প্রথম পরিচয়, যা ক্রমে প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের সাফল্যের ইতি-হাস রচনা করবে। ডিসেম্বরের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় এলে মনোমোহনের প্রতিষ্ঠার ষোড়শ কলা পূর্ণ হ'ল।

১৯০৫ সালে, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি গিরিশচন্দ্রের সম্মতিক্রমে অপরেশচন্দ্রের নাম মিনার্ভার ম্যানেজার হিশেবে বিজ্ঞাপিত হ'ল। গিরিশচন্দ্রের 'হর-গৌরী', 'বলিদান' খুলেও যখন মনোমোহনের লাভের অঙ্ক তেমন বাড়লনা, মিনার্ভা সম্প্রদায় কলকাতায় অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে জুন-জুলাই মাসে পুরী ও কটকে অভিনয় করতে যায়। অপরেশচন্দ্র এই সময় কলকাতা ও উড়িষ্যা দু-জায়গাতেই প্রয়োজন-মতো অভিনয় করতেন। কিন্তু তাতেও অর্থের বিশেষ সুরাহা না-হওয়ায় গিরিশ-চন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' খোলার আয়োজন করা হয়। প্রথমে মনোমোহনের অভি-প্রায় অনুসারে সিরাজের ভূমিকা দেওয়া হয় অপরেশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল দানীবাবু এই পার্ট করেন। ক্ষুণ্ণ হ'লেও অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে পার্ট ফেরৎ দিয়ে অগস্টের মাঝামাঝি মিনার্ভা ত্যাগ করেন।

মিনার্ভা ছাড়ার সময়, অপরেশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন, আর কখনো পেশাদার মঞ্চে আসবেননা। প্রায় এক বৎসর তিনি সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেও, বাল্যবন্ধু এবং ষ্টারের শিল্পী অক্ষয়কালী কোঁয়ার যখন ষ্টারে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, তখন অপরেশচন্দ্রের সাধ্য ছিলনা সে-প্রস্তাব প্রত্যা-খ্যান করেন। উপরন্তু, ষ্টারে তখন তাঁর বহু অভিলষিত অমৃতলাল মিত্রের কাছে অভিনয় শেখার প্রলোভন। বিনা পারিশ্রমিকে অপরেশচন্দ্র ষ্টারে যোগ দিলেন ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে' মোহনলালের ভূমিকায় সুখ্যাতি পেলেও প্রধানত অমৃতলাল বসুর সঙ্গে কোন কারণে মতান্তর হওয়ায় ১৯০৭ সালের এপ্রিলেই চ'লে এলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কোহিনূরে। তাঁর পদ হ'ল সহকারি ম্যানেজার। কোহিনূরের দলগঠনের ব্যাপারে অন্যান্য থিয়েটার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙানোর কাজও প্রধানত অপরেশচন্দ্রই করেন। ন্যাশানাল থেকে তারাসুন্দরীকেও নিয়ে আসা হয়। এই সময় থেকেই অপরেশচন্দ্র ও তারা-সুন্দরী স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে থাকেন। 'চাঁদবিবি' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয়ের পর, অক্টোবরের শেষে নতুন নাটক 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকা নিয়ে মতান্তরের ফলে কয়েকদিনের ব্যবধানে তারাসুন্দরী ও অপরেশচন্দ্র কোহিনূর ছেড়ে আবার ষ্টারে চ'লে যান। সেখানে অপরেশচন্দ্র অবশ্য নতুন কোন নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এদিকে ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারির শেষে 'রাজা অশোক' খোলার আগে ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল কোহিনূর ত্যাগ করায়, সেখানকার কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হয়ে অপরেশচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনলেন। সঙ্গে এলেন তারাসুন্দরী। ১১ ডিসেম্বর অস্থায়ী ম্যানেজার হিশেবে অপরেশচন্দ্রের

নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল। এই বছরেই অপরেশচন্দ্র পিতা হলেন। তাঁর স্ত্রী শিখরবাসিনীর গর্ভে কন্যা মমতা ও তারাসুন্দরীর গর্ভে অপরেশচন্দ্রের ঔরসে পুত্র নির্মলের জন্ম হয়। সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এই নির্মলই ছিল অপরেশচন্দ্রের চোখের মণি।

১৯০৯-এর জুলাইয়ের শেষে প্রধানত তারাসুন্দরীর আর্থিক আনুকূল্যে অপরেশচন্দ্র 'বাণী থিয়েটার' নামে একটি ভ্রাম্যমাণ দল খোলেন। স্বল্পজীবী এই প্রতিষ্ঠানটির জীবনে এম্পায়ার মঞ্চে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের সম্মানে আয়োজিত অভিনয়ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্যবসায়িক দিক থেকে দলটি কোন স্থায়িত্বই অর্জন করতে পারেনি। মাত্র আট-নয় মাসে প্রচুর লোকসান স্বীকার ক'রে তারাসুন্দরী ও অপরেশচন্দ্র আবার মিনার্ভায় ফিরে আসেন ১৯১০-এর এপ্রিল নাগাদ। এই বাণী থিয়েটারের সূত্রেই প্রবোধ গুহের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের পরিচয় হয়। মহেন্দ্র মিত্রের মিনার্ভায় এক বৎসর থাকার পর ১৯১১-এর জুলাইয়ে অপরেশচন্দ্র কোহিনূরে চ'লে আসেন। কোহিনূরের অধিকারী তখন শরৎকুমার রায়। ২৭ অগস্ট ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সম্মিলিতভাবে 'বলিদান' অভিনয়ের পর কোহিনূর থিয়েটারের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। নীলামে কোহিনূর কিনে নিলেন মিনার্ভার তৎকালীন স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে। কোহিনূরে তখন অভিনয় বন্ধ; অপরেশচন্দ্র ফিরে এলেন মিনার্ভায়। তারাসুন্দরীও তখন সেখানে। এই সময় থেকে ষ্টারে আর্টের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৩ থেকে ১৯২২ এই দীর্ঘ দশ বৎসর এঁরা দু-জনে অভিনয় করবেন একই সঙ্গে—মিনার্ভা ও ষ্টার মঞ্চে, অবিচ্ছিন্নভাবে। ১৯১২ সালে অপরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা তমসার জন্ম হয়।

মনোমোহনের মিনার্ভা যেমন নট হিশেবে অপরেশচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, এবার তেমনি তাঁকে নাট্যকারের সম্মান এনে দিল। মহেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই উপেন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে মকদ্দমা চলাকালীন (মে ১৯১২-জুলাই ১৯১৪) 'গৃহলক্ষ্মী' থেকে 'আহুতি' প্রযোজনা পর্যন্ত মিনার্ভার অধিকারী ছিলেন মনোমোহন পাঁড়ে। এর পর তিনি কোহিনূরে মনোমোহন প্রতিষ্ঠা ক'রে চ'লে গেলে, উপেন্দ্রকুমার মিনার্ভার লেসি হন। এবং অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার। অপরেশচন্দ্রের পিতা বিপ্রদাস পরলোকগমন করেন ৩০ নভেম্বর ১৯১৪। জীবনের শেষের দিকে বিপ্রদাস পুত্রের সাফল্যে যথেষ্ট প্রীত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অপরেশচন্দ্র 'শুভদৃষ্টি' পিতার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং মহেশপুরে তাঁর নামে একটি বিদ্যালয় ক'রে দেন। মিনার্ভায় তাঁর চতুর্থ নাটক 'রামানুজ' প্রথম তাঁকে মঞ্চসাফল্য এনে দেয়। 'রামানুজ'

মকদ্দ হওয়ার সামান্ত ব্যবধানেই স্ত্রীর গর্ভে অপরেশচন্দ্রের প্রথম পুত্রসন্তান হরিচরণ ভূমিষ্ঠ হন। এই সময় থেকেই অপরেশচন্দ্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠার, বিশেষত বৈধ সংসারের প্রতি মনোযোগের সূত্রপাত—যদিও তারাসুন্দরীর সঙ্গে সম্পর্ক তখনো অব্যাহত। এবং পুত্র হরিচরণের জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই তারাসুন্দরীর গর্ভে অপরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান প্রতিভার জন্ম হয়। ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি অপরেশ-চন্দ্র বড়ো মেয়ের বিয়ে দেন মাইনিং ইঞ্জিনীয়র নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই বিবাহের জন্ম অপরেশচন্দ্রকে মিনার্ভার লেসি উপেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে তেইশ শো টাকা ঋণ করতে হয়। অপরেশচন্দ্রের শেষজীবনের অসহায় দিনগুলি এই কন্যা ও জামাতার কাছেই কাটে।

এদিকে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকেই ষ্টার থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অনঙ্গ হালদার লীজ নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে না-পারায়, কর্তৃপক্ষ অগস্ট ১৯১৮ থেকে লীজ দেন গিরিমোহন মল্লিককে। ঐ-বছরেই গিরিমোহনের সঙ্গে এক চুক্তিক্রমে অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী ষ্টারে যোগ দিলেন ডিসেম্বরের গোড়ায়। অপরেশচন্দ্রই যথাবিধি ম্যানেজার। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী' নিয়ে শুরু করলেও, উপেন্দ্র মিত্র অভিনয়স্বত্ববিধি প্রয়োগ ক'রে কোর্টের সহায়তায় এই নাটকের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন। দেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত 'ওথেলো'ই গিরি-মোহনের স্বত্বাধীন ষ্টারের একমাত্র সফল প্রযোজনা।

১৯২০-র এপ্রিলের মাঝামাঝি, বাঙলা বছরের শেষে গিরিমোহন স্বত্ব ত্যাগ করলে অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগীর কাছ থেকে অপরেশচন্দ্র ষ্টারের লীজ নেন—বাঙলা নববর্ষ থেকে দেড় বছরের জন্ম মাসিক ১২০০ টাকা ভাড়ায়। সেলামি বাবদ গিরিমোহনকে দিতে হ'ল ৯২৫০ টাকা এবং ষ্টারের মালিকদের ৯০০ টাকা ও এক রাত্রির সম্মান-অভিনয় বাবদ ৭০০ টাকা। এছাড়া ভাড়াটিয়া খাজনা অতিরিক্ত। ষ্টারের গুডউইল ব্যবহারের অধিকার তখনো তাঁর ছিলনা। ১৯২১-এর অগস্টে তার জন্ম সেলামি দিতে হ'ল আরো ৫০০০ টাকা। অক্টোবর ১৯২১-এ আরও দু-বছরের জন্ম চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হ'ল। ভাড়া বেড়ে দাঁড়াল মাসিক ১৫৫০ টাকা। এই মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতেই অপরেশচন্দ্র ক্রমাগত নাটক লিখতে থাকেন। ষ্টারের অভিনেতৃ সম্প্রদায়ও ততদিনে দল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। বহু ব্যয় সত্ত্বেও এই থিয়েটার অপরেশচন্দ্রকে এবার প্রভূত সচ্ছলতা এনে দিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তারাসুন্দরীর জমির উত্তর দিকে অপরেশচন্দ্র জমি কিনে বাড়ি তৈরি

করান। পরে প্রধানত তাঁরই উদ্‌যোগে এখানে রাখালকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর পুজোর শেষে অপরেশচন্দ্র এই জমি পুত্র হরিচরণের নামে লিখে দেন। এদিকে উপেন্দ্রকুমার পুরনো ঋণের টাকা অবিলম্বে দাবি ক'রে উকিলের চিঠি দেন ১৯২২-এর জানুয়ারির শেষে। আপসে উভয় পক্ষে স্থির হয়, ফেব্রুয়ারি থেকে মাসে ১৫০ টাকা ক'রে দিয়ে অপরেশচন্দ্র ঋণ শোধ ক'রে দেবেন। অবশ্য মাস তিনেক পরেই এককালীন ১৯০০ টাকা দিয়ে অপরেশচন্দ্র এই ঋণ পরিশোধ করেন। এই বছরেই পুজোর পর মিনার্ভা আগুনে পুড়ে যায়।

কিন্তু এই সময়ে নাট্যজগতে বিপ্লবের সূচনা করেছে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'অলৌকিক আবির্ভাব'। শিশিরকুমারের ক্ষমতা তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা দিলেও এ-কথা অস্বীকার করা বোধহয় ইতিহাস-বিরুদ্ধ হবে যে, সময়ও তাঁকে প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। অমরেন্দ্রনাথের অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র যে-বিশ্লেষণ করেছেন, শিশিরকুমার প্রসঙ্গেও তা প্রায় অবিকলভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে। অমরেন্দ্রনাথের ছিল পারিবারিক প্রতিষ্ঠা, শিশিরকুমারের অধ্যাপকের সম্মান। কারণ যাই হোক্, শিশিরকুমারের জনপ্রিয়তা আবার প্রমাণ ক'রে দিল, 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না।' এ-সত্য আর-কেউ না-বুঝুন, অপরেশচন্দ্র বুঝেছিলেন। তাই অন্য কোন চেষ্টা না-ক'রে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ অপরেশচন্দ্র আর্ট থিয়েটারকে ষ্টারের আসবাব সমেত সমস্ত স্বত্ব বিক্রি ক'রে দিলেন নগদ ২৫০০০ টাকা ও ১০০ টাকার ২৫০টি শেয়ারের বিনিময়ে। সতীশ সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্র হলেন এই লিমিটেড কোম্পানির ডাইরেক্টর। প্রবোধচন্দ্র গুহ সেক্রে-টারি। ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ থেকে শুরু হ'ল আর্টের জয়যাত্রা। ৫০০ টাকা মাইনের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন অপরেশচন্দ্র। তারাসুন্দরী আর্টের সঙ্গে প্রথমে কোন সংস্রব রাখেননি। ১৯২৩-এই অপরেশচন্দ্র দ্বিতীয় কন্যা তমসার বিবাহ দেন কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই বিবাহ উপলক্ষ ক'রেই তারাসুন্দরীর সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের প্রথম মতান্তর উপস্থিত হয়। ষ্টারের হস্তান্তরে ক্ষোভ ছাড়াও আর্টের সঙ্গে তারাসুন্দরীর অসহযোগের অন্যতম কারণ এইটি। অপরেশচন্দ্রের একমাত্র ও অনেকটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ভদ্রা' এই সময়ে প্রকাশিত হয়। বইটি সম্ভবত তারাসুন্দরীকেই উৎসৃষ্ট।

অপরেশচন্দ্রের নতুন নাটক 'কর্ণার্জুন' নিয়ে আর্টের পর্দা উঠল ৩০ জুন ১৯২৩। পরবর্তীকালের একাধিক প্রখ্যাত অভিনেতার প্রথম মঞ্চাবতরণের ঘটনা হিসেবে

এবং মঞ্চসাফল্যের নিরিখেও এই নাটকটির প্রযোজনা বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল। এর পরেও এই আর্টেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন অহর গাঙ্গুলী ও তুলসী চক্রবর্তী। এবং প্রধানত অপরেশচন্দ্রেরই উদ্‌যোগে বিভিন্ন সময়ে অমৃতলাল বসু, দানীবাবু ও চুনীলাল দেবকে আর্ট থিয়েটারে নিয়ে আসা হয়েছে। আমেরিকা যাওয়ার আগে শিশিরকুমারকেও কয়েক মাসের জন্ত এখানে বরণ ক'রে এনেছেন অপরেশচন্দ্র। ১৯২৭-২৮-এ পুরনো বিসম্বাদ ভুলে এক বছরের জন্ত তারাসুন্দরীও আর্টের মঞ্চে অভিনয় ক'রে গেছেন। নবীন ও প্রবীণের এই সম্মিলনের কৃতিত্ব অপরেশচন্দ্রের অতিরিক্ত পাওনা।

'কর্ণার্জুনে'র সাফল্য অপরেশচন্দ্রকে শেষবারের মতো উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল ১৯২৪ জুড়ে। কমপক্ষে পাঁচটি নতুন ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে নামলেন তিনি। নামত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্রের সম্পাদনায় 'রূপ ও রঙ্গ' প্রকাশিত হ'লেও, কার্যত এর শুধু সম্পাদক নয়, প্রধান লেখক ছিলেন অপরেশচন্দ্র। এছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতেও তখন তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বৎসর শেষ হওয়ার আগেই অপরেশচন্দ্রের ইদানীংকার নিত্য সহচর পুত্র নির্মলের মৃত্যু তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিভিয়ে দিল। তাঁর শরীরও তখন ভাঙতে শুরু করেছে। তারাসুন্দরীর সঙ্গে শেষ সম্পর্কসূত্রও মুছে গেল। তাঁর এই অমিতাচারী জীবনে নির্মলই ছিল সেই শিখা, যা তাঁকে অবৈধ সন্তানকে স্বীকারের সাহস দিয়েছিল। 'বন্দিনী'র মর্মস্পর্শী উৎসর্গ-কবিতাটি তারই প্রমাণ। বেঁচে থাকলে ছেলেটি যে নাট্যবোধে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'ত তার সাক্ষ্য আছে অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মস্মৃতিতে।

১৯২৫-এর গোড়ায় ভালুকপাড়ার বাসা ছেড়ে অপরেশচন্দ্র উঠে এলেন মানিকতলায়, যেখান থেকে 'রূপ ও রঙ্গ' ছাপা হ'ত, সেই বাড়িতে। ঐ-বছরেই জামতাড়ায় স্ত্রীর নামে সম্পত্তি কিনেছিলেন অপরেশচন্দ্র, সেখানেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছেন। রোগের আক্রমণে তাঁর শরীর তখন অশক্ত, ঘাড় বেঁকে গেছে। সেই অবস্থাতেই 'চিরকুমার সভা'য় রসিকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পান তিনি; রবীন্দ্রনাথ নাম দেন 'রসিকবাবু'। নট হিশেবে এর পরে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র আর মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে না-পারলেও, তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন নাট্য রচনায়। জীবনের এই শেষ আট বৎসরে তিনি তাঁর সমগ্র নাট্য-সংগ্রহের প্রায় অর্ধেক রচনা করেছেন। প্রশংসা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও অপরেশচন্দ্রের প্রাণপ্রাচুর্য তখন স্তিমিত হয়ে আসছে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে 'কর্ণার্জুন' ২৫০ রাত্রি অতিক্রম করেছে। ২৪ মে ১৯২৫

শততম অভিনয়-রজনীতে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ তাঁকে 'নাট্যবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। নিবারণ দত্ত তাঁকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিয়েছেন। আচার্য হরপ্রসাদের কাছ থেকে মৌলিকত্ব ও সাহিত্যকৃতীর স্বীকৃতি, পেয়েছেন তিনি। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ রেকর্ডে তিনকড়ি চক্রবর্তীর সহযোগে 'কর্ণার্জুন'-এর কর্ণ ও পরশুরামের দৃশ্য (P 7568) এবং 'সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ' নামে একটি প্রহসন ও উল্টো পিঠে কোহিনূরবালার সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিদ্যা-দিগ্‌গজ ও আসমানীর দৃশ্যটি (P 8244) প্রচারিত হয়েছে। ১৬টি রেকর্ডে সম্পূর্ণ 'চণ্ডীদাস' পালাটি (P 9453-68) রেকর্ড ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানি অপরেশচন্দ্রকে একটি বড়ো গ্রামোফোন ও এক সেট্ রেকর্ড উপহার দিয়েছেন। তাঁরই 'সুদামা' অবলম্বনে অহীন্দ্র চৌধুরী 'কৃষ্ণসখা' ছবি তৈরি করেছেন। সমাজের গণ্যমান্যের মধ্যে তখন তিনি একজন পরিগণিত হচ্ছেন। অপরেশচন্দ্র এখন শুধু নট বা নাট্যকার নন, নাট্যাচার্য। নতুন নাট্যশালা 'রঙমহল'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটনে তখন তাঁকে বরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন স্বয়ং শিশিরকুমার।

১৯২৫-এর শেষে নির্মল চন্দ্র আর্ট থিয়েটারের ডাইরেক্টর পদ থেকে বিদায় নেওয়ায় তাঁর জায়গায় এলেন গদাধর মল্লিক—গদাই মল্লিক নামেই যিনি বেশি পরিচিত। আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে সংস্রবের অবশিষ্ট ক-টি বৎসরে অপরেশচন্দ্রের নাটক রচনার স্থায়ী জায়গা ছিল গদাই মল্লিকের পাতিপুকুরের বাগানবাড়ি। আগেই বলেছি, মূলত 'কর্ণার্জুন'-এর বোলবোলাই আর্ট থিয়েটারের আর্থিক সাফল্যের বনিয়াদ তৈরি করেছিল। কিন্তু এই সাফল্য তাঁদের এতটাই উচ্চাশী করেছিল যে অতীতের ব্যর্থতার সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও অপরেশচন্দ্র ও আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় মনোমোহন লিজ নিয়ে একসঙ্গে জুড়ি চালাতে চেষ্টা করলেন (জুন ১৯২৭ -জুন ১৯২৮)। এবং বলা বাহুল্য, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুনাম ক্ষয় করা ছাড়া এ-চেষ্টা থেকে আর্টের কোন নতুন উপার্জন হয়নি। এরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে আর্ট থিয়েটার করনানি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে লিজ বন্ধক রেখে শতকরা বারো টাকা সুদে ১৫০০০ টাকা ঋণ করে—এই ঋণই অবশেষে বৃদ্ধি পেয়ে আর্টের অবলুপ্তি নিশ্চিত করবে।

যেমন জীবনের শুরুতে, তেমনি জীবনের শেষেও অপরেশচন্দ্র অস্থিরভাবে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন। ১৯২৮-এ তিনি বাড়ি নেন বরাহনগর কুটীঘাটে, ১৯৩০-এর মাঝামাঝি আবার ফিরে আসেন তাঁর কৈশোরের অঞ্চলে—জয় মিত্র স্ট্রিটে। লক্ষ করবার মতো, সামর্থ্য থাকলেও কলকাতায় অপরেশচন্দ্র কখনো বাড়ি

করেননি, যদিও বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের তুলনায় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ১৯৩২-এর জুনে গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছোটো মেয়ে আলোকময়ীর বিয়ে দিয়ে অপরেশচন্দ্র পিতার কর্তব্য সমাধা করেন। এদিকে থিয়েটারেও তখন দল ভাঙছে। আর্থিক অনটনের সঙ্গে-সঙ্গে কর্তৃপক্ষীয়দের বন্ধুত্বেও ফাটল ধরতে শুরু করেছে। আর্ট থিয়েটার অর্থেই অপরেশচন্দ্রের সুনাম ও প্রতিপত্তিও অন্যান্য ডাইরেক্টরদের ভালো লাগেনি। ইউরেমিয়া আক্রমণের বাহ্য লক্ষণ তখন অপরেশচন্দ্রের শরীরে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বহু ডাক্তার বন্ধু থাকা সত্ত্বেও নিজের আস্থামতো আমাদাস কবিরাজের চিকিৎসাবিধিই তিনি মেনে নিয়েছেন। এরই মধ্যে ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি পুরনো ঋণের জেরে করনানি ব্যাঙ্ক আর্ট থিয়েটারের ওপর ডিক্রি পায়।

আর্ট থিয়েটারের এই অপমৃত্যু হয়ত অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিল। বড়ো মেয়ে ও জামাই তাঁকে বছরের শেষের দিকে নিয়ে গেলেন তাঁদের কাছে। সেখানে গিয়ে তাঁর শরীর ভালোর দিকেই যাচ্ছিল। এপ্রিল ১৯৩৪-এর শেষ সপ্তাহে হঠাৎ অবস্থার অবনতি হ'লে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় তাঁর বড়ো মেয়েরই শ্বশুরবাড়িতে, মহেন্দ্র মিত্র লেনে। এখানেই অপূর্ণ ৫৯ বৎসর বয়সে অপরেশচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ১৫ মে ১৯৩৪। অপরেশচন্দ্রের আর্ট থিয়েটারের জায়গায় গ'ড়ে ওঠে শিশিরকুমারের নব-নাট্যমন্দির।

২.

মঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোত এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নিতান্তই অন্তর্মুখী। মজলিশী লোক ছিলেন, কিন্তু অপরিচয়ের বাধা কাটাতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল অপরিসীম। তখনকার আর পাঁচজন বাঙালির মতো তিনিও ভোজনরসিক ছিলেন, বিশেষত ফল ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। 'শ্রীগৌরাঙ্গ' রচনার সময় এক মাস তাঁর বন্ধু পরমবৈষ্ণব আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনিও নিরামিষ আহার করেন। শুধু সাত্ত্বিকতাই নয়, দিন-ক্ষণ-যাত্রার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সংস্কারপ্রবণ। ধনী তিনি ছিলেননা। কিন্তু অন্যের প্রার্থনা কখনো ফেরাতে পারতেননা এবং সে-দানের কথা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও অগোচর থাকত। মাছ ধরা ছিল তাঁর নেশা। সিগারেট ও গড়গড়া কোনটিতেই আপত্তি ছিলনা। কিন্তু মদ্যপানে তিনি কখনো আসক্ত হননি। স্বাজাতিকতা ছিল তাঁর অত্যন্ত তীব্র। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তিনি ছিলেন স্বরাজপন্থী ও দেশবন্ধুর অনুগামী। অপরেশচন্দ্রের উৎসাহে

দেশবন্ধুর অন্ত্যেষ্টিযাত্রার চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল আর্টের মঞ্চে। দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে বিশেষ অভিনয়েরও ব্যবস্থা করেন তিনি (২৯ জুন ১৯২৫)। সে-যুগের অনেকের মতোই ব্যক্তিগত চরিত্রে স্খলনের চিহ্ন থাকলেও, অপরেশচন্দ্র প্রধানত ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ও হয় বেলুড় মঠে। রাখাল মহারাজ ও ভাব মহারাজের সঙ্গে তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। রাগ তাঁর স্বভাবে ছিলনা। যেমন নিজের, তেমনি অন্ত কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা তিনি সর্বদাই এড়িয়ে চলতেন।

কিন্তু তবুও অপরেশচন্দ্র নিঃশত্রু ছিলেননা। একদা তাঁর বন্ধু বিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইরাণের রাণী' ও 'বন্দিনী' প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবেশগত বিচ্যুতির জন্ত অপরেশচন্দ্রকে কটাক্ষ করেছেন ('আনন্দ-বাজার পত্রিকা' ১৯২৪ ও 'সচিত্র শিশির' ১৯২৫)। এ-কথা সত্যি, অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার থাকাকালেই মঞ্চে নানারকম ট্রিক সীন্ বা জাঁক-জমক দেখিয়ে দর্শক টানার প্রবণতা আর্ট থিয়েটারে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এমন-কি, শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখাবার জন্ত আর্ট থিয়েটার নামক প্রতিষ্ঠানেও কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মঞ্চে স্থান দেওয়া হোতো, দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের আর অর্জুনের প্যাকাটির তীর বর্ষণ দেখিয়ে যুদ্ধের ইলিউশন সৃষ্টির চেষ্টা করা হোতো, বৃষকেতুকে করাত দিয়ে কেটে দেখানো হোতো যে, সে আসলে অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কোলে। কাগজের হাতীতে চড়ে ঔরংজীব যুদ্ধ করছেন তাও দেখেছি গোলকুণ্ডা নাটকের অভিনয়ে।" ('বাংলার নাটক ও নাট্যশালা', গুরুদাস ১৯৫৭, পৃ ১৩৮-৩৯) আমরা আরো যোগ করতে পারি, এই আর্ট থিয়েটারেই পারসিক দৃশ্যপট মিশরীয় বা মুঘল পরিবেশে বা বিপরীতক্রমে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং অপরেশচন্দ্র যেহেতু ম্যানেজার ছিলেন, এ-ত্রুটি তাঁকেও অর্শাবে। কিন্তু রাখালদাসের আক্রমণে সমালোচনার তুলনায় ব্যক্তিগত বিষোদ্গার ছিল বেশি—এবং তাতে সুরুচিরও অভাব ছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী অবশ্য এই বিরূপতার একটি কারণ তাঁর স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন: "আসল কথা হচ্ছে, রাখালদা 'দনুজমর্দনদেব' বলে একটি নাটক লিখেছিলেন (ওর আগে তিনি 'মহীপাল' ও 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নামে দুটো নাটক লিখেছিলেন বলে জানতাম), সেটি নিয়ে এসেছিলেন আর্ট থিয়েটারে। হরিদাসবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা, 'দাদা' বলে ডাকতেন। নাটকটি হরিদাসবাবুর কাছে আনতে উনি বললেন—ও নিয়ে

আমি ত খাঁটাখুঁটি করি না, অপরেশবাবুকে গিয়ে বলো।...আবার অপরেশ বাবু কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছুঁতেন না, বিশেষ করে নতুন নাট্যকারদের। ... তিনি রাখালদার নাটক যথারীতি ছুঁলেন না, বললেন—নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেক্টররা! ওঁরা ত সব আপনার বন্ধুও! ওঁদের বলুন!" ('নিজেরে হারায়ে খুঁজি', প্রথম পর্ব, আই. এ. পি. ১৯৬২, পৃ ৩২৩)

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন নাটক অপহরণের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের নাম বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে। যেমন, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রামানুজ' বা শিশিরকুমারের অধিকার থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' হরণ প্রসঙ্গে। যে-কোন পাঠক দু-জনের 'রামানুজ' পড়লেই বুঝতে পারবেন, তাঁদের বক্তব্যও ব্যবহার কত ভিন্ন। তাছাড়া ক্ষীরোদ-প্রসাদের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের অসদ্ভাব ছিলনা। 'কিন্নরী' নাটক প্রসঙ্গে ক্ষীরোদ-প্রসাদ তাঁকে লেখেন, "আমার অনেক বই আপনার সংশোধন করা আছে। সুতরাং এটা আপনিই দেখিয়া দিবেন। আমার অবসর নাই।" আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের কাছে চিঠিটি এখনো রক্ষিত আছে। 'সীতা' হরণে অপরেশচন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল স্পষ্ট জানা না-গেলেও, এই নাটকটিকে যে তিনি উঁচুদরের মনে করতেননা, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তবে পরবর্তী-কালে শিশিরকুমারের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের সম্পর্কের—আর্ট থিয়েটারে শিশির-কুমারের আগমন, নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের প্রশংসা বা নাট্যনিকেতনে অপরেশ-চন্দ্রের শেষ নাটক অনুরূপা দেবীর 'মা'র প্রযোজনা—ভিত্তিতে মনে হয়, অপরেশ-চন্দ্র সম্ভবত এ ব্যাপারে যুক্ত ছিলেননা। অবশ্য সজ্ঞদায়িত্ব অস্বীকার করা কঠিন।

নাট্যকার হিশেবে অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রেরই অনুগামী—তাঁর মতো প্রতিভা-বান না-হ'লেও দক্ষ। সম্ভবত নিজের ক্ষমতার এই সীমা তাঁর জানা ছিল। আর জানা ছিল ব'লেই পৌরাণিক ধারাতে তিনি সফল মৌলিক নাটক রচনা করতে পেরেছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে হয় অনুবাদ, না-হয় নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটকে অনুস্যূত কাব্য তাঁর রচনায় পাওয়া যাবেনা, কিন্তু সে-ক্ষতি অনেকাংশে পূরণ করে তাঁর নাটকের সংঘাত ও গতির তীব্রতা। নাটকের ব্যাকরণ তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত। সংলাপ আন্তরিক ও আবেগ-মন্দ্র। মৃগাঙ্কর ভূমিকায় অভিনয়কালে স্বয়ং শিশিরকুমার স্বীকার করেছিলেন অপরেশচন্দ্রের সংলাপ রচনার কুশলতা (দ্র শঙ্কর ভট্টাচার্য, 'নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার', ডি. এম. ১৩৭৭, পৃ ১৯০)। আর তাঁর বাঙলা ভাষাও ইংরেজির অপঘাত থেকে মুক্ত—শব্দসমাবেশ ওজস্ব ও শ্রুতিমধুর। তাঁর 'চণ্ডীদাস' বা 'মগের মুলুক' তার প্রমাণ। অতিরিক্ত

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাষার লালিত্য ও শব্দঝঙ্কার। তবে নাট্যরচনায় তাঁর সবথেকে উল্লেখযোগ্য গুণ বোধহয় বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ। তাঁর পৌরাণিক নাটক তাই শুধু পুরাণাশ্রয়ী নয়, পুরাণ-ব্যাখ্যা। যেমন, 'কর্ণার্জুন' বা 'শ্রীকৃষ্ণ'। আবার কখনো ভক্ত-হৃদয়ের আকুতি বিষয়ের সঙ্গে তাঁর মনের সেতুবন্ধন করেছে। 'সুদামা' বা 'শ্রীগৌরাঙ্গ' তার উদাহরণ। কিন্তু যেখানে বিষয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ প্রত্যক্ষ নয়, সেখানেই রূপান্তরে তিনি কল্পিত অংশের যোজনা করতে গিয়ে কাল- ও ভাব-গত পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেননি। 'রাখীবন্ধন' বা 'ইরাণের রাণী'র মৌলিক ত্রুটি সেখানেই। আবার অনুবাদে এই রূপান্তরের সুযোগ নেওয়ায় কখনো পুরনো নাটকেও তিনি সমকালীন অভিপ্রায় আবিষ্কার করতে পেরেছেন। কংগ্রীভের *The Double Dealer* অবলম্বনে 'দুমুখো সাপ' নাটকে তিনি স্থানীয় মঞ্চের নেপথ্যস্থিত কূটনীতিকে প্রকাশ করেছেন।

শুধু নাটকের ধারাতেই নয়, নাটক রচনা ও শিক্ষণ-পদ্ধতিতেও অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের অনুবর্তী। তাঁরও অভ্যাস ছিল মুখে-মুখে ব'লে যাওয়া, লিপি-করেরা তা লিখে নিতেন। প্রধানত জানকীনাথ বসু, কখনো হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'গণেশে'র কাজ করেছেন। মহলায় তিনি নাটকটি অভিনয়োপযোগী ক'রে প'ড়ে দিতেন। অর্ধেন্দুশেখর যেভাবে হয়ত অভিনয়ে নটের গতিবিধি (movement) বা বিন্যাস (composition) দেখিয়ে দিতেন, অপরেশচন্দ্র তেমন করতেননা -- অন্তত আর্ট থিয়েটারের সময় যে করতেননা, অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতি-কথায় সে-অভিযোগ স্পষ্ট। কিন্তু গলা তৈরির ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। শ্রীশম্ভু মিত্রের কাছে শুনেছি, গদাই মল্লিকের বাগানবাড়ির পুকুরে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তিনি স্বরপ্রক্ষেপ শেখাতেন।

নট অপরেশচন্দ্রের অভিনয়ের যে-সব সমালোচনা তখনকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলোর প্রশংসার মূল ভিত্তি ছিল অপরেশচন্দ্রের কণ্ঠ-স্বরের ঐশ্বর্য ও তাঁর আবৃত্তির যাদুকরী প্রতিভা। তাঁর অভিনয়ের যা রেকর্ড শুনেছি, তাতেও তাঁর এই উদাত্ত কণ্ঠসম্পদের পরিচয় আছে — উদারা থেকে তারার মধ্যে সাবলীল তার ওঠানামা। কিন্তু তাঁর অভিনয়রীতি মনে হয়েছে দমক-দেওয়া। অবশ্য তখনকার দিনে স্বাভাবিক অভিনয় প্রত্যাশা করাও হয়ত অসঙ্গত। অন্যদিকে তাঁর কায়িক অভিনয়েও বীর ও হাস্য রসাত্মক চরিত্রই সম্ভবত বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। এবং শেষোক্ত ধরনের চরিত্রে অভিনয়ে অপরেশচন্দ্র কখনো যে স্থূলতার আশ্রয় নেননি — হলফ ক'রে এ-কথা বলা যাবেনা। 'কপালকুণ্ডলা'র

চাটুজ্যের ভূমিকার সমালোচনা তার প্রমাণ। তবে এই আপস না-ক'রে কোন মঞ্চের অধিকারীর চলাই হয়ত তখন সম্ভব ছিলনা। এবং সে-বিষয়ে তিনি যে অচেতন ছিলেননা, তার প্রমাণ, অহীন্দ্র চৌধুরীকে সখেদে বলেছিলেন, "আমাদের প্রকৃত মনিব হচ্ছে কারা জানেন? ঐ যারা এক টাকা-দুটাকার টিকিট কিনে পিছনের সারিতে বসে। এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন হয়। কাজেই এদের রুচি-বহির্ভূত কোনো জিনিস আমরা করতে পারি না। বিদেশীরা পারে, তাদের নাট্য-অনুশীলন করবার সুযোগ আছে, তাদের এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল থিয়েটার আছে —চাঁদায় চলে—তাঁরা নতুন জিনিস দিতে পারবেন না কেন?" (অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৩) আজ প্রায় সত্তর বৎসর পরেও বাঙলার নাট্যপরিচালকদের সেই একই আক্ষেপ।

'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'

অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন, "অভিনয়কে তো আর কলে পুরিয়া রাখা যায় না।" গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের সময় কথাটা সত্যি ছিলো। তাঁরা তখন ধ'রেই নিয়েছিলেন, 'দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায়'। একমাত্র উপায় হয়ত ছিল লেখা ; তবে লিখে যে অভিনয়ের কতটা প্রকাশ করা যায়, তাও সন্দেহের অতীত নয়। তাই গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে যে-সব লেখা আমরা পাই, তার অধিকাংশই হয় স্তুতি নয় নিন্দা, উচ্ছ্বাস বা বিদ্রূপ। বস্তুত, তাঁদের অভিনয় বা নাট্যশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্মৃতিকথার ইতঃস্তত উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, যদি-না অপরেশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বইটি রচনা করতেন। বইটি যে আত্মচরিত নয়, নাট্যস্মৃতি—এ-কথা অপরেশচন্দ্র কখনো ভোলেননি। বিষয়ের কাছে নিজেকে তিনি সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন, আত্মগৌরব প্রচারের বাসনা কখনো তাঁকে পেয়ে বসেনি। আর সেই সুবাদেই গিরিশচন্দ্র ও অমৃত মিত্রের যোগেশ বা অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের করুণাময় চরিত্রের রূপায়ণ বা গিরিশচন্দ্র ও অতুল মিত্রের করা 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপের তুলনা আজও বাঙালি নাট্যরসিকের কাছে প্রবাদপ্রতিম হয়ে রয়েছে। কাগজে তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা নয়, তাঁর নাটক প'ড়েও ততটা নয়, অপরেশচন্দ্রের নাট্যবোধ কতদূর পরিণত ও প্রাজ্ঞ ছিল তার দলিল : 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'।

নিজেকে গৌণ-ক'রে নাট্যশালার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সমকালকে দেখার ক্ষমতা ছিল ব'লেই অপরেশচন্দ্রের এই নাট্যস্মৃতি ব্যক্তিগত পক্ষপাতের পরিবর্তে ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। তাই গিরিশচন্দ্র তাঁর পার্ট ফিরিয়ে নিলেও, সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে কিছুদিনের জন্য থিয়েটার ছাড়তে হ'লেও, অপরেশচন্দ্র ছাপার হরফে গিরিশচন্দ্রের ওপর তার শোধ তোলেননি। বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, বাঙলা মঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র। অমরেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতা বা সংগঠনক্ষমতা, তাঁর নাট্যপ্রতিভা ও নাট্যানুরাগের প্রশংসা করলেও অপরেশচন্দ্র এ-কথা ভুলতে পারেননি যে অমরেন্দ্রনাথ নাট্যশালাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে তাকে আমোদাগারে পরিণত করেছিলেন। ইতিহাসকারের এই নিরপেক্ষতা অপরেশচন্দ্রের ছিল ব'লেই নট ও নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'লেও, অভিনয়-শিক্ষকরূপে তিনি যে অর্ধেন্দুশেখরকে তুলনায় ভালো মনে করতেন—সে-অভিমত কোথাও গোপন রাখেননি। এই অনপেক্ষ বিচার, এরও উৎস তাঁর নিবেদিত নাট্যপ্রীতি।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ২ থেকে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় (বর্ষ ১/২৯ সংখ্যা) "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে।[১] পত্রিকাটি উঠে গেলে 'নবযুগে' (বর্ষ ২ / ১৩ সংখ্যা) থেকে দ্বিতীয় খণ্ড হিশেবে কয়েকটি সংখ্যায় স্মৃতিকথার অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়।[২] এর সঙ্গে 'রূপ ও রঙ্গে' প্রকাশিত "শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর"[৩] ও 'সচিত্র শিশিরে' প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনা "রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রভাব"[৪] জুড়ে দিয়ে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষের দিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইয়ের শেষে লেখা ছিল : "আমরা এইখানেই প্রথম পর্ব শেষ করিলাম।" বাহুল্য বলা, এর পরবর্তী পর্ব কখনো প্রকাশিত হয়নি।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যাণ্ডোরা থিয়েটারের উদ্‌যোগ পর্ব থেকে পত্রিকায় প্রকাশের সময় (১৯২৪) পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল অপরেশচন্দ্র তাঁর এই নাট্যস্মৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ-জাতীয় রচনাকে তাঁর আত্মপ্রচারমূলক মনে হ'লেও বন্ধু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের উৎসাহে ও পীড়াপীড়িতে তিনি এই স্মৃতিকথা রচনা করতে বাধ্য হন। অপরেশচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মতো এই বইটিও মুখে-মুখে ব'লে যাওয়া; ফলে স্মৃতি তাঁকে কখনো কখনো যেমন প্রতারিত করেছে তেমনি সময়ের উল্লেখেও তাঁর বিভ্রান্তি ঘটেছে। পাঠকের সুবিধার্থে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

ক. 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বইটিতে অপরেশচন্দ্রের বয়সের বিভিন্ন উল্লেখে অসঙ্গতি আছে। পত্রিকায় প্রকাশকাল (১৯২৪) থেকে হিশেব করলে প্রথম দুটি উল্লেখ : 'এতদিন পরে ত্রিশ বৎসরের পরিপূর্ণ স্মৃতির আলোকে' এবং 'এখন, প্রায়

১. 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত ১২টি কিস্তিতে (সংখ্যা ২৯, ৩০, ৩২, ৩৭-৪৩, ৪৫ ও ৪৬) প্রথম থেকে বর্তমান সংস্করণের ১০৮ পৃষ্ঠার ৫ম লাইন [১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ ফাল্গুন 'নাচঘর পত্রিকায় প্রকাশিত (বর্ষ ১/১৪ সংখ্যা) গিরিশ-স্মৃতি-সভায় পঠিত অভিভাষণটি এই শেষ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।] পর্যন্ত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবং তখনো 'ক্রমশঃ' ছিল।

২. 'নবযুগ' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩২ কার্তিক ১৪ থেকে মাঘ ৯ পর্যন্ত ৫টি কিস্তিতে (সংখ্যা ১৩, ১৭-১৯ ও ২৩) বর্তমান সংস্করণের ১০৮ পৃষ্ঠার লাইন ৬ থেকে ১২৯ পৃষ্ঠার লাইন ৬ ও ১৪৯ পৃষ্ঠা পরিচ্ছেদ ১৬ থেকে ১৫১ পৃষ্ঠা লাইন ১৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

৩. সংখ্যা ১ ও ৩। বর্তমান সংস্করণের ১৫১ পৃষ্ঠা ২৬ লাইন থেকে ১৫৭ পৃষ্ঠা ৪ লাইন পর্যন্ত।

৪. বর্ষ ১ / ৩৩-৩৭ সংখ্যা। বর্তমান সংস্করণের ১২৯ পৃষ্ঠা লাইন ৭ শুরু থেকে ১৪৯ পৃষ্ঠা ৭ লাইন পর্যন্ত।

অর্দ্ধশতাব্দী এ জীবনভোগের পর' (পৃ ৩৭) থেকে অপরেশচন্দ্রের জন্মসাল ১৮৭৫-ই সমর্থিত হয়। এবং প্যাণ্ডোরা থিয়েটারের সময় ১৯২৪ থেকে ত্রিশ বৎসর আগে হ'লে দাঁড়ায় ১৮৯৪। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পরেই (পৃ ৪০) তিনি প্যাণ্ডোরা থিয়েটার প্রসঙ্গ শুরু করেছেন 'বয়স যখন বছর ষোল' ব'লে। প্রথম এ্যাক্‌টিং-এর আড্ডায় যাওয়া ও পরীক্ষার পর বীণা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নেওয়ার মধ্যে ইংরেজি বৎসর ঘুরে গেছে। সুতরাং এই হিশেবমতো তাঁর বয়স হওয়া উচিত [১৬+১=] ১৭। এবং তখন থেকে 'প্রায় দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে' (পৃ ৭১)—'বোধহয় ১৯০৪ সাল' (পৃ ৭২)-এ তাঁর বয়সের হিশেব দাঁড়ায় [১৭+১০=] ২৭। কিন্তু প্যাণ্ডোরা থিয়েটার পর্বে (১৮৯৪) অপরেশচন্দ্রের বয়স হওয়া উচিত ১৯ এবং কাজেকাজেই ১৯০৪ সালে ২৯। বয়সের উল্লেখে এই অসঙ্গতির কথা আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নকে জানালে তিনি আমায় লেখেন : "অপরেশচন্দ্রের জন্ম সনতারিখ যাহা দিয়াছি, তাহা অপরেশচন্দ্রই লিখিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজেন বন্দ্যো আমার নিকটই লইয়াছে। তুমি অনুমান করিতে যাইও না। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসরে যাহা আছে তাহাতে গোলমাল থাকা স্বাভাবিক। স্মরণ করিয়া লেখা, দশ পাঁচ-দিন অন্তর অবসরমত বলা। আমি যাহা লিখিয়াছি উহাই ঠিক।" (২৩ শ্রাবণ ১৩৭৯)

খ. অপরেশচন্দ্র লিখেছেন : "যতদূর স্মরণ হয়—প্রথম থিয়েটার দেখি "বেঙ্গল থিয়েটারে" বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'। তখন আমার বয়স বোধহয় আট নয় বৎসরে বেশী হইবে না।…যিনি মনোরমা সাজিয়াছিলেন তিনি বঙ্গের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী।" (পৃ ৩৮) এখানে স্পষ্টতই ভুল হয়েছে। কারণ বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী মাত্র সাত-আট মাস যুক্ত ছিলেন ১৮৭৭ সালে। তখন অপরেশচন্দ্রের বয়স দুই। সুতরাং অপরেশচন্দ্র যদি আট-নয় বয়সের আগে থিয়েটার না-দেখে থাকেন, তাহ'লে বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনীর অভিনয় তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

গ. অপরেশচন্দ্র লিখেছেন : "কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুর্মুখ রায় ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার অভিভাবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া ফেলিল।" (পৃ ৬৫) গুর্মুখের মৃত্যুর পর নয়, তিনি নিজেই 'সমাজ পীড়নে বা অন্য কারণে' থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করেন। (দ্র বিনোদিনী দাসী, 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত [সুবর্ণরেখা ১৩৭৬], পৃ ৪৩-৪৪)

ঘ. অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত রমাপতি দত্ত ছদ্মনামে তাঁর

খুল্লতাতের জীবনী 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) গ্রন্থে অপরেশচন্দ্রের কয়েকটি ভুল দেখিয়েছেন। আমি সেগুলি সংকলন ক'রে দিলাম।

A. অপরেশচন্দ্রের মন্তব্য : "'হরিরাজ' 'অমর-গ্রন্থাবলী' ভুক্ত হইয়া বসুমতী আফিস হইতে বিক্রীত হইতেছে!" (পৃ ৫৫) এটি ঘটনা। কিন্তু রমাপতি দত্ত এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের সমস্ত স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি নিজের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সহিত হরিরাজের প্রকাশ-স্বত্বও বসু-মতীকে বিক্রয় করেন।—গ্রন্থ রচনাকালে অপরেশবাবু একেবারেই ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ জীবিতকালে হরিরাজকে কখনও তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া চালান নাই ; স্বপ্রকাশিত কোন অমর গ্রন্থাবলীতে হরিরাজ স্থান পায় নাই ; বরঞ্চ বহুবার হ্যাণ্ডবিলে, বহু বিজ্ঞাপনে তিনি "নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত সেই যুগযুগান্তকারী নাটক হরিরাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, কে গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।" ('রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ ১৫০ পা-টী)

B. ক্লাসিকে 'হরিরাজে'র ভূমিকা প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন, "জয়াকর সাজিয়াছিলেন ৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)...।" (পৃ ৫৫) রমাপতি দত্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের সাক্ষ্যে প্রমাণ করেছেন, ঐ-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ('রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ ১৫১ পা-টী)।

C. অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত মিনার্ভার ঢাকা সফর এবং সেখানে পুঁটু-রাণীর গহনা বাঁধা রাখার নেপথ্য-ঘটনা সবিস্তারে জানিয়েছেন রমাপতি দত্ত (দ্র 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ ৩৫১-৫৭)। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন, "এই সময়েই অমর-বাবুর ক্লাসিক থিয়েটার 'রিসিভারে'র হাতে যায়...।" (পৃ ৭৩) প্রকৃতপক্ষে এই দুই ঘটনার মধ্যে এক বছরের ব্যবধান (দ্র 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ ৩৫৭ পা-টী)।

G. দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' মঞ্চে 'রাণা প্রতাপ' নামে প্রযোজিত হয়। এই নাটক অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে ষ্টার ও দ্বিজেন্দ্রলালের মতবিরোধের (পৃ ৯৩) অপরেশচন্দ্রের ব্যাখ্যা ছাড়াও ভিন্নতর একটি কারণ জানিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ। থিয়েটারের পাশ দেওয়ায় ষ্টার কর্তৃপক্ষের অমনোযোগে দ্বিজেন্দ্র-সুহৃদ অধরচন্দ্র মজুমদার রুষ্ট হন এবং তিনিই নাকি দ্বিজেন্দ্রলালকে নাটকটি মিনার্ভায় অভিনয়ের জন্য দিতে সম্মত করান (দ্র 'দ্বিজেন্দ্রলাল', ১৩২৩, পৃ ১৪২-৪৪)।

D. "জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এবং "মিলে সব ভারত সন্তান" (পৃ ৯৯) গানদুটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত হ'লেও (যথাক্রমে 'সরোজিনী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

নাট্যসংগ্রহ, ১৯৬৯, পৃ ২২৪ ও 'পুরুবিক্রম', তদেব, পৃ ৩৯) এ-দুটির রচয়িতা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ (দ্র বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবন-স্মৃতি', ১৩২৬, পৃ ১৪৭ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', [১৯১৫], পৃ ৩৬)।

ছ. বর্তমান সংস্করণের ১০৬ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের নাম অপরেশচন্দ্র ভুল ক'রে অক্ষয়'চন্দ্র' লিখেছেন।

নট অপরেশচন্দ্র

১৯০৪	?	নবকুমার	কপালকুণ্ডলা	মিনার্ভা
	?	প্রিয়নাথ	সংসার	ঐ
	?	প্রবীর	জনা	ঐ
	নভেম্বর ৫	সূর্য	ঐন্দ্রিলা	ঐ
	ডিসেম্বর ১০	শঙ্কর	প্রতাপাদিত্য	ঐ
১৯০৫	এপ্রিল ৮	কিশোর	বলিদান	ঐ
	জুলাই ২৯	শক্তিসিংহ	রাণা প্রতাপ	ঐ
১৯০৬	অগস্ট ৪	মোহনলাল	পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	ষ্টার
১৯০৭	অগস্ট ১১	মল্লজী	চাঁদবিবি	কোহিনূর
	নভেম্বর ২১	মুরাদ সা	দৌলতে দুনিয়া	ঐ
১৯০৮	নভেম্বর ২৯	চাকাদাস	ভূতের বেগার	ঐ
	ডিসেম্বর ১৮	গুরু গোবিন্দ	পাঞ্জাব গৌরব	ঐ
১৯০৯	জানুয়ারী ৩০	রাজারাম	বীরপূজা	ঐ
	মে ৮	দারা	ময়ূর সিংহাসন	ঐ
	জুলাই ৩	স্বার্থশরণ	প্রতিফল	ঐ
	অগস্ট ২৯ [পরে]	দিলদার	সাজাহান	মিনার্ভা
১৯১০	অগস্ট ২৭	মাধাই	চৈতন্যলীলা	ঐ
	ডিসেম্বর ৩	বীতশোক	রাজা অশোক	ঐ
১৯১১	ফেব্রুয়ারী ৪	হাসান	পলিন	ঐ
	অগস্ট ২৬	বশিষ্ঠ	বিশ্বামিত্র	কোহিনূর
	নভেম্বর ২৫	ফরমাজ	জেনোবিয়া	ঐ
১৯১২	জুলাই ৬	খাঁজাহান	খাঁজাহান	ঐ
	অগস্ট ২৭	কিশোর	বলিদান	ঐ
	সেপ্টেম্বর ২১	হীরু ঘোষাল	গৃহলক্ষ্মী	মিনার্ভা
১৯১৩	মে ১০	অর্জুন	ভীষ্ম	ঐ
	সেপ্টেম্বর ২০	ওসমান	রূপের ডালি	ঐ
	নভেম্বর ১৫	কৃষ্ণবল্লভ	ভাগ্যচক্র	ঐ
	ডিসেম্বর ২০	তিলকচাঁদ	নবযৌবন	ঐ

১৯১৪	মার্চ ২১	যোবক	নিয়তি	ঐ
	সেপ্টেম্বর ৫	আমানেমহট্	ক্লিওপেট্রা	ঐ
	অক্টোবর ২৪	জাফর	রুমেলা	ঐ
	ডিসেম্বর ২৬	মূলরাজ	আহেরিয়া	ঐ
১৯১৫	মার্চ ৬	মহাব্রত	আহুতি	ঐ
	অক্টোবর ২	সিংহবাহু	সিংহলবিজয়	ঐ
	ডিসেম্বর ৪	শ্যামলাল	শুভদৃষ্টি	ঐ
১৯১৬	মার্চ ২৫	উপেন	বঙ্গনারী	ঐ
	জুলাই ১৫	যমুনাচার্য্য	রামানুজ	ঐ
১৯১৭	জুন ৩০	চন্দ্রশেখর	চন্দ্রশেখর	ঐ
	সেপ্টেম্বর ৮	সাহাবাজ	বঙ্গে রাঠোর	ঐ
১৯১৯	মার্চ ৮	ইয়াগো	ওথেলো	ষ্টার
১৯২০	মে ২২ [পরে]	চন্দ্রাবত কুম্ভ	রাখীবন্ধন	ঐ
	অগস্ট ২১	মিঃ রায়	ছিন্নহার	ঐ
১৯২১	ডিসেম্বর ৩	হাফেজ রহমৎ	অযোধ্যার বেগম	ঐ
১৯২২	জুলাই ১	বাদিওজ্জমান	নবাবী আমল	ঐ
১৯২৩	জুন ৩০	পরশুরাম	কর্ণার্জুন	ষ্টার/আর্ট
১৯২৪	জানুয়ারী ১	দাউদ সা	ইরাণের রাণী	ঐ
	জুলাই ২৩	চাটুজ্যে	কপালকুণ্ডলা	ঐ
	অগস্ট ২৮	মদন ঘোষ	প্রফুল্ল	ঐ
	অক্টোবর ২	রাজাবাহাদুর	রাজাবাহাদুর	ঐ
	ডিসেম্বর ২৫	ইস্‌কিবল	বন্দিনী	ঐ
১৯২৫	জুন ১৩	বিদূষক	জনা	ঐ
	জুলাই ১৮	রসিক	চিরকুমার সভা	ঐ
	?	দেবদত্ত	রাজা ও রাণী	ঐ
	?	কাত্যায়ন	চন্দ্রগুপ্ত	ঐ
	?	সাধক	বিল্বমঙ্গল	ঐ
১৯২৬	অগস্ট ২০	হরবল্লভ	দেবী চৌধুরাণী	ঐ
১৯২৮	জুন ২	শা সুজা	মগের মুলুক	ঐ

[হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-এর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৪৫) থেকে সংকলিত। পরিবর্ধিত ও সংশোধিত।]

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র

তথ্যক্রম : নাটকের নাম (অনুবাদ বা রূপান্তরের ক্ষেত্রে মূল লেখক ও বইয়ের নাম)। উৎসর্গ। প্রথম প্রকাশকাল। নাট্যালয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখ। পৃষ্ঠাসংখ্যা। মূল্য।

অপরেশচন্দ্রের সবকয়টি বইয়েরই প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। নাটকের বইগুলির প্রকাশকাল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৮) পৃ. ১২০-২১ থেকে সংকলিত।

১. রঙ্গিলা (Richard Sheridan, *Duenna*)। ২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪। মিনার্ভা ২৬ ডিসেম্বর ১৯১৪। ৪+৬৮। ছয় আনা।

২. আহুতি (Wilson Barett, *Sign of the Cross*)। আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহোদয়ের করকমলে এই গ্রন্থ সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল। ৫ মার্চ ১৯১৫। মিনার্ভা ৬ মার্চ ১৯১৫। ৬+৯৮। আট আনা।

৩. শুভদৃষ্টি (Lord Lytton, *Lady of Lyons*)। আমার পরম আরাধ্য দেবতা স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় পিতাঠাকুর মহাশয়ের পবিত্র নামে তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফল এই নাটক উৎসর্গ করিলাম। ৫ ডিসেম্বর ১৯১৫। মিনার্ভা ৪ ডিসেম্বর ১৯১৫। ৮+১৫২। এক টাকা।

৪. রামানুজ। পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীমদ্ সারদানন্দ স্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু। ১৭ জুলাই ১৯১৬। মিনার্ভা ১৫ জুলাই ১৯১৬। ৬+২০৪। এক টাকা।

৫. উর্ব্বশী (কালিদাস, 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্')। পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রীচরণকমলে। ২৭ মে ১৯১৯। ষ্টার ১৭ মে ১৯১৯। ৪+১১৪ এক টাকা।

৬. দুমুখো সাপ (William Congreve, *The Double Dealer*)। ২০ অগস্ট ১৯১৯। ষ্টার ৯ অগস্ট ১৯১৯। ৪+৯১। আট আনা।

৭. রাখীবন্ধন (Henrik Ibsen, *The Vikings at Helegeland*) নাট্য-সাহিত্যানুরাগী সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলালের করকমলে—সাদর উপহার। ৮ জুলাই ১৯২০। ষ্টার ২২ মে ১৯২০। ১০+৯৭+[৩]। এক টাকা।

৮. ছিন্নহার (Marie Corelli, *Worm Wood*)। নবীন ও প্রবীণের সম-সুহৃদ্ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু করকমলেষু। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০। ষ্টার ২১ অগস্ট ১৯২০। ৪+২০৭। এক টাকা চার আনা।

৯. বাসবদত্তা (ভাস, 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ', 'বাসবদত্তা')। পণ্ডিতাগ্রগণ্য

সুধী বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়েষু। ১১ মার্চ ১৯২১। ষ্টার ১৫ জানুয়ারী ১৯২১। ৬+১৬৯। এক টাকা।

১০. অযোধ্যার বেগম। পরম সুহৃদ্ কল্যাণভাজন শ্রীমান্ গদাধর মল্লিক করকমলেষু। ১০ ডিসেম্বর ১৯২১। ষ্টার ৩ ডিসেম্বর ১৯২১। ৮+১৭৫। দেড় টাকা।

১১. অপ্সরা। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২। ষ্টার ১৯ অগস্ট ১৯২২। ৪+৩৬। ছয় আনা।

১২. সুদামা। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের করকমলে। ১৫ নভেম্বর ১৯২২। ষ্টার ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২২। ৪+৭৫। আট আনা।

১৩. কর্ণার্জ্জুন। নাট্যবিদ্যাভারতী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কবি-ভূষণ মহাশয়ের করকমলে। ২৯ জুলাই ১৯২৩। ষ্টার (আর্ট) ৩০ জুন ১৯২৩। ৬+১৭৩+[৩]। দেড় টাকা।

১৪. ইরাণের রাণী (Oscar Wilde, *The Duchess of Padua*)। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র গুহ আশীর্ব্বাদভাজনেষু। ১২ জানুয়ারী ১৯২৪। ষ্টার (আর্ট) ১ জানুয়ারী ১৯২৪। ৮+১০০। এক টাকা।

১৫. বন্দিনী (Gilbert & Sullivan, *Aida*)। নির্ম্মল। ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪। ষ্টার (আর্ট) ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪। ৮+৯৪+[২]। এক টাকা।

১৬. শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ১৫ মে ১৯২৬। ষ্টার (আর্ট) ১৫ মে ১৯২৬। ৮+২২৬+[২২ (সচিত্র ৮)]। দেড় টাকা।

১৭. চণ্ডীদাস। সাহিত্যাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ সি-আই-ই মহোদয়ের করকমলে এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ উপহার দিয়া ধন্য হইলাম। ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৬। ষ্টার (আর্ট) ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬। ৬+১১৮+[২]। এক টাকা।

১৮. শ্রীরামচন্দ্র। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে। ১৯ জুলাই ১৯২৭। মনোমোহন (আর্ট) ১ জুলাই ১৯২৭। ৪+২০৪। দেড় টাকা।

১৯. মগের মুলুক। নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে। ১০ ডিসেম্বর ১৯২৭। ষ্টার (আর্ট) ৩ ডিসেম্বর ১৯২৭। ৬+১৬৮। দেড় টাকা।

২০. পুষ্পাদিত্য। বাল্য সুহৃদ্ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্দেশে। ২৪

ডিসেম্বর ১৯২৭। ষ্টার (আর্ট) ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৭। ৮+১০৪। এক টাকা।

২১. ফুল্লরা (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল')। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের করকমলে। ৭ ডিসেম্বর ১৯২৮। ষ্টার (আর্ট) ২১ অক্টোবর ১৯২৮। ৪+১৩০। এক টাকা।

২২. মন্ত্রশক্তি (অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ)। ১ মার্চ ১৯৩০। ষ্টার (আর্ট) ২৩ নভেম্বর ১৯২৯। ৪+১৭৪+[২]। এক টাকা।

২৩. শকুন্তলা (কালিদাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্')। ? ১৯৩০। ষ্টার (আর্ট) ৩০ অক্টোবর ১৯৩০। ৪+১৬০। এক টাকা।

২৪. মুক্তি (সংস্কৃত প্রহসন 'ভগবজ্জুকীয়ম্')। ১০ জুন ১৯৩১। ষ্টার (আর্ট) ১ জানুয়ারী ১৯৩১। ৮+৪৭। চার আনা।

২৫. শ্রীগৌরাঙ্গ। স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ নাটক উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ১ অক্টোবর ১৯৩১। ষ্টার (আর্ট) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩১। ৮+১৮৯+[৪]। এক টাকা।

২৬. পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ)। ১১ এপ্রিল ১৯৩২। ষ্টার (আর্ট) ১২ মার্চ ১৯৩২। ৬+১৬৯+[৪]। এক টাকা।

২৭. বিদ্রোহিনী। নাট্ট[ট্য]চার্য্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। ২ ডিসেম্বর ১৯৩২। ষ্টার (আর্ট) ৫ নভেম্বর ১৯৩২। ৮+১২৮। এক টাকা।

২৮. মা (অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ)। ১ জানুয়ারী ১৯৩৪। নাট্যনিকেতন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩। ৮+১৬৭। এক টাকা।

২৯. দালিয়া (রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ)। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স অভিনীত। দ্র মধু বসু, 'আমার জীবন (বাক্‌সাহিত্য ১৯৬৭), পৃ ১৮২।

৩০. রজনী (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ) গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। ষ্টার (আর্ট) ৫ ডিসেম্বর ১৯২৮। [দ্র শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, আই. এ. পি. ১৩৭৮), পৃ ৮৬। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (কলকাতা, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৪৫) পৃ ১১৫।]

৩১. নব জাগরণ বা রুক্মিণীহরণ নাটক। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ও অনভিনীত। সতীশচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'বসুন্ধরা' পত্রিকার ১৩৫৯-৬১ সালের প্রতিটি নববর্ষ ও শারদীয়, সাকুল্যে ছয়টি, সংখ্যায় এই নাটকটির তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

ভদ্রা (উপন্যাস)। যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইবেন তাঁহাকেই ইহা উপহার দিলাম। শ্রীঅপরেশ। বৈশাখ ১৩৩০। ৬+১৭৬+[৮]। দুই টাকা।

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (নাট্যস্মৃতি)। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু। শ্রাবণ ১৩৪০। ১০+১৯৫+[২]। এক টাকা।

গ্রন্থাকারে অসংকলিত অন্যান্য রচনা

'স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নট-জীবন' (পুস্তিকা)। অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর কোহিনূর থিয়েটারে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় অপরেশচন্দ্রের অভিভাষণ। কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত ও কোহিনূর থিয়েটার থেকে প্রকাশিত। তারিখহীন। পৃ ১১। [শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকায় (বর্ষ ৫ / ২ সংখ্যা) ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে এই দুষ্প্রাপ্য রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।]

"অভিনেতা", 'রূপ ও রঙ্গ', সংখ্যা ৪, ২২ কার্ত্তিক ১৩৩১, ৭৮-৮২ ; সংখ্যা ৫, ২৯ কার্ত্তিক ১৩৩১, ৯৫-৯৬ ;—(ভাব), সংখ্যা ৮, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৬১-৬৩ ;—(অনুকরণ), সংখ্যা ৯, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৮০-৮২ ;—(দর্শক ও সমালোচক), সংখ্যা ১১, ২৬ পৌষ ১৩৩১, ২০৯-১২ ;—(স্বর ও ভাবের অভিব্যক্তি—ভঙ্গিমা), সংখ্যা ১৪, ১৮ মাঘ ১৩৩১, ২৭৬-৭৯ ;—(নাটক—নটের স্থান নির্দেশ), সংখ্যা ১৯, ২৩ ফাল্গুন ১৩৩১, ৩৭১-৭৩ ; সংখ্যা ২০, ৩০ ফাল্গুন ১৩৩১, ৩৮৭-৮৯। [এই প্রবন্ধটির অংশবিশেষ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিনয় শিক্ষা' (অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে এবং শ্রী উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' পুরাতনী সংখ্যায় (সংখ্যা ১১, তারিখহীন) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।]

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি", 'রূপ ও রঙ্গ', সংখ্যা ১৪, ১৮ মাঘ ১৩৩১, ২৯২-৯৪।

"জয়দেব", 'রূপ ও রঙ্গ', সংখ্যা ৪৫, ২৭ ভাদ্র ১৩৩২, ৯৪১-৪৬।

"গিরিশচন্দ্র", 'নবযুগ', বর্ষ ২/২৬ সংখ্যা, ১ ফাল্গুন ১৩৩২, ৮৯৩-৯৭। অপিচ : 'নাচঘর', বর্ষ ২/৩৬ সংখ্যা, ৭ ফাল্গুন ১৩৩২, ৪-৭। [২৫ মাঘ মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ১৪শ বার্ষিকী স্মৃতিসভায় পঠিত।]

"স্বামী বিবেকানন্দ", 'বিশ্ববাণী', বর্ষ ১/৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪, ১৫৯-৬৪। [জামতাড়ায় বিবেকানন্দ লাইব্রেরির উদ্বোধনে পঠিত।]

"অমৃতলাল", 'মাসিক বসুমতী' অমৃতলালের স্মৃতি-অর্ঘ্য, শ্রাবণ ১৩৩৬, ৬৮-৭০। [১ অগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অমৃতলালের শোকসভায় পঠিত।]

সাহিত্য সেবক সমিতি প্রকাশিত 'প্রয়াস' পত্রিকার বর্ষ ২/১১ সংখ্যায় (নভেম্বর ১৯০০) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত "শৈল" গল্পটি অপরেশচন্দ্রের রচনা ব'লে আমার অনুমান। 'ভদ্রা' উপন্যাসের সঙ্গে গল্পটির যোগাযোগ লক্ষণীয়।

"নন্দলাল" (গল্প), 'যমুনা', বর্ষ ১০/৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭, ২৯৫-৩০১।

"স্মৃতিতর্পণ" (গান), 'রূপ ও রঙ্গ', বর্ষ ১/৩৬ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ় ১৩৩২, ৭৩০।

"ক্ষীরোদ-প্রয়াণ" (কবিতা), 'ভারতবর্ষ', বর্ষ ১৫/৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৪, ৪৯৯।

শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙলা নাট্যশালার পক্ষ থেকে দেওয়া মানপত্রটিও অপরেশচন্দ্রের রচনা।

মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বর্তমান সংস্করণে মূল গ্রন্থের বানান ও শব্দ-সমাবেশে অসমতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ভাষাগত কোন পরিমার্জন করা হয়নি। নির্দেশিকাটি পূর্ণতর করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা

আচার্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায় — শ্রীমতী বাণী মুখোপাধ্যায়

শ্রী গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় — অধ্যাপক শ্রী অলোক রায়

১৩৭৯ রাস পূর্ণিমা — স্বপন মজুমদার

প্রায় পনের বছর ছাপা ছিলনা বইটি। পুনঃপ্রকাশের সূত্রে কিছু নতুন তথ্য সংযোজনের সুযোগ নিয়েছি। পরিচয় না-থাকা সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর নাট্যগবেষক শিশির বসু আমায় কিছু অতিরিক্ত তথ্য জানিয়েছিলেন। সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

১৩৯৮ ঈদ-উজ-জোহা — স্ব ম

রঙ্গালয়ে

ত্রিশ বৎসর

[১]

তখন আর এখন—কত প্রভেদ ! বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ফটককে সেলাম করিয়া যেদিন পরিধিহীন সীমাহীন বিশ্বপ্রাঙ্গণের বুকে প্রথম পা দিয়া দাঁড়াইলাম, সেই একদিন—আর আজ ! এতদিন পরে ত্রিশ বৎসরের পরিপূর্ণ স্মৃতির আলোকে দেখিতেছি—সেই আমি, সেই আমার দেশবাসী, সেই আমার আত্মীয়-পরিজন, আমার বন্ধু, আমার শত্রু, সেই আমার ত্রিশ বৎসরের বাঙ্গলার, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত অতীত চিত্র ! হায় ! কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলিব ? যাহাদের কাঁধে হাত দিয়া একসঙ্গে বেড়াইয়াছি—তাহারা আজ কোথায় ? এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কতবার কাঁধ বদলাইয়াছি, কত পরিচিত পর হইয়াছে, কত অপরিচিত হাত বাড়াইয়া কাঁধ ধরিয়াছে—তাহাদের কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলিব ? অবিরল চোখের জলে যে ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা কবে শুকাইয়া গিয়াছে ; এ জীবন-অপরাহ্নে আর সে ফুল ফুটিবে না—চোখে আর জল নাই ! যে মোহকরী আশা, যে উদ্‌ভ্রান্তকারী কল্পনা, যে অপরিসীম সুখের অপরিসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা এ ক্ষুদ্র হৃদয়কে একদিন আলোড়িত, মথিত ও মুগ্ধ করিত—ত্রিশ বৎসর চলিয়া চলিয়া তাহাদের কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি ! পরিত্যক্ত শবের মত তাহারা এ সংসারের পথে কোথায় কতদূরে পড়িয়া আছে ! যখন পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তখন ভয়ে বিস্ময়ে হর্ষে শোকে এ অবসাদগ্রস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠে ! কী রাখিয়া কী বলিব ? আমার যাহা, তাহা আমারই ভাল, অপরের কি ? তবে এ আলোচনায় লাভ ?

কাহারও লাভের জন্য এ পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছি না। সত্যই তো, ইহাতে কাহারও কোন লাভ নাই ; আর আমার ? এখন, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী এ জীবনভোগের পর, কৈফিয়ৎ কাটিয়া জমার ঘরে যখন শূন্য পড়িয়া আছে—এখন যাহা বিগত, তাহাকে অক্ষরের ফাঁদে ধরিয়া রাখায় কেবল পণ্ডশ্রম ভিন্ন আর কী হইতে পারে ? কিন্তু তবু আমি এই পুরাতন কথা কিছু বলিব। সরল, সত্য, প্রত্যক্ষ কথা বা কাহিনী বা সময়ের চিত্র—যাহা দেখিয়া কোন না কোন ভাগ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল সংসার-প্রবেশ-মুখে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতে পারিবে—তখন আর এখন—হায় ! ইহার মধ্যে কত প্রভেদ !

গুটীপোকা পাকিয়া যেমন প্রজাপতি হয়, তেমনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাম লিখিয়া "আর্টিষ্ট" হইবার পূর্ব্বে প্রায় সকল অভিনেতাকেই "এমেচার"রূপ গুটীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পাকিতে হয়। অন্ততঃ আমাদের তো হইয়াছিল। কাজেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের এই "এমেচারি" অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলিতে হইতেছে। নীরস হইলেও, কিছু ব্যক্তিগত হইলেও, ইহা না-বলিয়া উপায় নাই। নটের "এমেচারি" জীবন অনেকটা পূর্ব্বরাগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অতএব আমরা পূর্ব্বরাগ হইতেই এ কাহিনী আরম্ভ করিলাম।

অতি তরুণ বয়সেই একটী দর্শনীয় বস্তু আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল —তাহা থিয়েটার। থিয়েটার পল্লীর নিকটে অর্থাৎ বিডন ষ্ট্রীটের অদূরেই আমাদের বাড়ী ছিল এবং এই থিয়েটার দেখিবার সুযোগও ছিল খুব বেশী। থিয়েটার সংশ্লিষ্ট অনেকেরই সহিত আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের পরিচয় ছিল; তাঁহাদের অনেকেই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; থিয়েটার লইয়া আমাদের বৈঠকখানায় অনেক আলোচনা ও আন্দোলন হইত। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার থিয়েটার দেখারও সুবিধা ঘটিত। যতদূর স্মরণ হয়—প্রথম থিয়েটার দেখি বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'। তখন আমার বয়স বোধহয় আট-নয় বৎসরের বেশী হইবে না। সে অভিনয়ের মধ্যে দুইটী চিত্র আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। এক—মাধবাচার্য্য, আর যিনি মনোরমা সাজিতেন, তাঁহার "আমি পুকুরে হাঁস দেখিগে গো" বলিয়া হাততালি দিয়া চলিয়া যাওয়া। পরে জানিয়াছিলাম, যিনি মাধবাচার্য্য সাজিয়াছিলেন, তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; এবং যিনি মনোরমা সাজিয়াছিলেন তিনি বঙ্গের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী। ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি সুপ্রসিদ্ধ ষ্টার থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গলে'র অভিনয় দেখি। 'বিল্বমঙ্গলে'র কোন চিত্রই আমার কৈশোর হৃদয়ে বিশেষ ছাপ দেয় নাই। কেবল একটী দৃশ্যের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। শ্মশানের দৃশ্যে যে অভিনেতা উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত মর্ম্মভেদী কণ্ঠে "চিন্তামণি" "চিন্তামণি" বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিতেন, তাঁহার বিল্বমঙ্গল অভিনয় যিনি একবার দেখিয়াছিলেন, তিনিই বোধহয় জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। সে অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। ইহার পর হইতেই আমার থিয়েটার দেখার ঝোঁক বাড়িয়া উঠে। কিন্তু ঝোঁক বাড়িলেই বা বাড়ীতে ছাড়িবে কেন? বিশেষ, তখন পাঠ্যাবস্থা, এবং আমার বয়সও অল্প; সুতরাং প্রত্যহ থিয়েটারে যাই কী করিয়া ভাবিতে লাগিলাম; ঝোঁকের মাথায় পথও বাহির হইয়া পড়িল।

বেঙ্গল থিয়েটারে তখন 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ের ভারি ধুম। প্রতি রবিবারে অপরাহ্নে অভিনয় হইত; আমরাও বেড়াইতে যাইবার আছিলায়, প্রায় প্রতি রবিবারেই অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অভিনয় দেখিতাম। প্রত্যহ পয়সা দিয়া কিংবা "পাশ" সংগ্রহ করিয়া থিয়েটার দেখার অবস্থা ও সুযোগ ছিল না। কিন্তু কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত আমি ও আমার দুই-একজন বাল্যবন্ধু, প্রত্যেকের জন্য মাত্র দুইটী হিসাবে পয়সা দিয়া থিয়েটার দেখিবার একটা স্থান আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। তখনকার বেঙ্গল থিয়েটারের পশ্চিমে একটা ভাঙ্গা পাঁচীল ছিল। পাঁচীলটী একজন হাড়ী কি ডোমের বাড়ীর সীমানায়; সেই পাঁচীলের উপর হইতে থিয়েটারের ভিতরের সব দেখা যাইত। আমরা পাঁচীলের মালিক এক বৃদ্ধাকে দুইটী করিয়া পয়সা দিয়া তিন-চারিজনে মিলিয়া থিয়েটার দেখিতাম। যখন মাহুত হাতী বাহির করিত, তখন কী আনন্দ! যখন নৃসিংহমূর্ত্তি হিরণ্যকশিপু বধ করিত, তখন কী উৎকট বিভীষিকা! এই স্থান হইতে আমরা দেখিতে পাইতাম—নারদ হুঁকায় দম দিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ষ্টেজে প্রবেশ করিতেছেন; আমাদের সুবিধা ছিল—আমরা নারদও দেখিতাম, ধোঁয়াও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে কোন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া হুঁকার জল ঢালিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইত, আমরা পলাইতাম। এই অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাহারও কাহারও সঙ্গে পরে থিয়েটার করিয়াছি; জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়াছি হুঁকার জল ঢালার স্মৃতি তাহাদেরও কাহার কাহার মনে আছে। প্রায় প্রতি রবিবারেই থিয়েটার দেখিতাম এবং প্রত্যহ বৈকালে খেলার সময় বাঁখারির তরবারি লইয়া যুদ্ধের অনুকরণ করিতাম। হিরণ্যকশিপুর "ম্যাড সিনে"র সেই 'ভীমচক্র' 'ভীমচক্র' চীৎকারে আমরা লোককে সময়ে অসময়ে এমন বিরক্ত করিতাম যে, তাহার জন্য বাড়ীতে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাও সহিতে হইত যথেষ্ট। কিন্তু কানমলা বা কঠোর শাসন আমাদিগকে 'ভীমচক্র' ছাড়াইতে পারে নাই; এবং "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" এই সনাতন বাক্য ঐ 'ভীমচক্রে'র আবর্ত্তনে উত্তরকালে যে আমাদিগকে থিয়েটার-চক্রের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; এবং এইজন্যই কতদিন মনে হইয়াছে, যদি লেখা-পড়াই করিতে হয়, তবে লেখাপড়া শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত থিয়েটার বোধহয় না-দেখাই ভাল। একদিকে নাটক নভেল পাঠের অনুরাগ, অন্যদিকে "চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর"—মাঝখানে অপরিপক্ক-জ্ঞান কিশোরবয়স্ক বালক বৃহ! 'ভীমচক্রে'র

প্রভাবে মা সরস্বতী চক্রবৃদ্ধি হিসাবেই দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, আর আমরাও স্কুলের পড়া ছাড়িয়া সেই অল্প বয়সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' মুখস্থ করিতে লাগিলাম।

[২]

বয়স যখন বছর ষোল, একদিন পথে বাহির হইয়াছি, এক বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল। অনেকদিন পরে দেখা। দুই-একটী কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাচ্ছিস ?"

সে বেশ গর্ব্বের সঙ্গে একটু গম্ভীর কণ্ঠেই বলিল—"আড্ডায়।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আড্ডা ! কিসের আড্ডা ? গাঁজার নাকি ?"

সে হাসিয়া বলিল—"দূর, তা কেন ? থিয়েটারের।"

"থিয়েটারের ? পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?"

"ছাড়ব কেন ? কলেজেও যাই, থিয়েটারও করি।"

"বটে ? তোর এতদূর উন্নতি হয়েছে ?"

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম ; কারণ বন্ধুটী আমার ছিল নিতান্ত পাড়া-গেঁয়ে এবং একান্ত পাঠানুরাগী। আমাদের কথা হইতেছে, এমন সময় পিছনদিক হইতে কে বলিয়া উঠিল—"বাবু, কেতনা ঘড়ি দের্ করেগা ?"

চাহিয়া দেখি, পশ্চাতে এক ঝাঁকামুটে ; তাহার ঝাঁকায় বাঁয়া ও তবলা। বন্ধুটী নিজের কথার প্রমাণস্বরূপ মুটের মাথায় বাঁয়া-তবলা দেখাইয়া বলিল—"এই দেখ্, বাঁয়া-তবলা, আড্ডায় বাজান হয়। জোড়াসাঁকোয় ছাইতে দিয়েছিলাম, নিয়ে যাচ্ছি। তুই কোথায় যাচ্ছিস ?"

আমি বলিলাম—"বেড়াতে।"

"আর বেড়াতে যায় না, আমাদের আড্ডা দেখে আসবি চল্।"

এইরূপ আড্ডার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা আমার ছেলেবেলা হইতেই ছিল। পড়াশুনা করি আর নাই করি, পাঁচালে বসিয়া থিয়েটার দেখা, 'ভীমচক্র' করা, গঙ্গার ধারে বেড়ান, কিংবা জয়দেব মুখস্থ করা ভিন্ন অন্য বদ্‌খেয়াল আমাদের ছিল না। এ বয়স পর্য্যন্ত অসৎ সঙ্গে কখনও মিশি নাই ; আড্ডার কথা শুনিয়াই, ঘৃণা ও উপেক্ষার সহিত বলিলাম—"আড্ডায় আবার ভদ্রলোক যায় ?"

বন্ধুটী বেশ সহজ এবং অকপটভাবেই বলিল—"নারে, সেরকম আড্ডা নয়,

সত্যিই ভদ্রলোকের আড্ডা। কেউ নেশাখোর বা ছোটলোক নেই, সবাই ভদ্রলোক, সবাই শিক্ষিত। তাস পাশা না-খেলে বিকেলে ঘণ্টা দুই ক'রে এ্যাক্‌টিং-এর চর্চ্চা করা যায়, মন্দ কি ?"

আজিকালিকার মত থিয়েটার করাটা তখন আর্টের চর্চ্চা বলিয়া কথিত হইত না। থিয়েটার বিশ্ববখাটেরাই করিত—আর থিয়েটার করাকে—যাক্ সে কথা। এই "আর্ট" সম্বন্ধে পরে অনেক কথাই বলিতে হইবে।

আমরা কথা কহিতেছি, এদিকে মুটে ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সে আর দাঁড়াইতে চাহে না। বন্ধুটী বলিল—"চ' না, কথা কইতে কইতে যাই, বেশী দূরে নয়।"

অধঃপতনের পথ সত্যিই "বেশী দূরে নয়!" পা পা করিয়া অগ্রসর হইলাম। পাঁজী দেখি নাই, তবে সেদিনের নক্ষত্র যে আমার পক্ষে শুভ ছিল না, জীবনে তা নির্ভুলরূপে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারের নিকটে শ্যামপুকুরের ধারে সেই বাবুটীর সঙ্গে যে বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম, তাহাই তাহাদের 'আড্ডা' নামে পরিচিত। দুই তলের উপর একটা নাতিদীর্ঘ হলের মত ঘর, চারিদিকে সার্শি খড়খড়ি দেওয়া জানালা, ঘরের মেজেয় দুইখানি লম্বা মাদুর পাতা, সামনে টানা বারান্দা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি,—একটী ভদ্রলোক, বেশ সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, সমুচ্চস্বরে একখানি পুস্তক পড়িতেছেন। পুস্তকখানি গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'। আর-একটী ভদ্রলোক বারান্দায় বসিয়া অতি নিবিষ্টচিত্তে তামাকু সাজিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে সারি সারি দশ-বারোটা কলিকা। বন্ধুবর ঘরে ঢুকিয়া মুটের মাথা হইতে বাঁয়া-তবলা নামাইয়া দিগ্বিজয়ী বীরের মত বেশ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন—"মশায়, একজনকে ধ'রে এনেছি, চেহারাটা যাহ'ক মন্দ নয়, দেখুন দেখি কিছু বলতে পারে কি না ?"

আমি অস্বোয়াস্তির সহিত গুটিগুটি সেই মাদুরে বসিলাম। পাঠনিরত ভদ্রলোকটী বই হইতে মুখ তুলিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একেবারে নতুন, না অভ্যাস আছে ?"

"না মশায়, সুবোধ ছেলে, কথাই কয় না, অনেকদিনের পর রাস্তায় দেখা, ধ'রে নিয়ে এলুম। দেখুন-না যদি ঘ'সে মেজে কিছু ক'রে নিতে পারেন—দল তো পুরু করা চাই ?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ তা তো বটেই, আর নতুনই তো ক্রমে পুরাণো হয়। কাটি ওঠার চেয়ে নতুনই বরং ভাল; আমিও তাই চাই।"

এইরূপ আলাপ হইতেছে, ইতিমধ্যে দুই-এক করিয়া প্রায় পাঁচ-ছয়টী ভদ্রলোক আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই যুবক, সমবয়সী ; দেখিলাম, দলের মধ্যে আমিই কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ। পুস্তক-হাতে-ভদ্রলোকটীকে দেখাইয়া বন্ধুবর বলিলেন,—"ইনিই রিহার্স্যাল মাষ্টার। অমৃত মিত্তিরের এ্যাক্‌টিং তো শুনেছিস, আর শোন্ দেখি এঁর গলা?" পাঠক স্মরণ রাখিবেন, তখনকার দিনে—এ্যাক্‌টিং-এর প্রধান উপাদান ছিল "গলা আর ফীলিং"। এই গলা ফীলিং সাধিতে আমাদিগকে যে কত কসরত করিতে হইয়াছিল সে কথা পরে বলিব।

ভদ্রলোকটী 'চণ্ড' বইখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "একটু পড় দেখি?" আমি বইখানি হাতে লইয়া চারিপাশে চাহিলাম ; দেখিলাম, যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা আমার পড়া শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। যিনি তামাক সাজিতেছিলেন, তিনি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্যে কী করিত জানি না, বহুবার থিয়েটার দেখিয়া এবং তাহার অনুকরণে 'ভীমচক্র' করিয়া খোলা গলায় পড়া আমার বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস ছিল। আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না-করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই পড়িতে লাগিলাম :

"হের অই চিতোর নগর পুণ্যধাম
উচ্চশির প্রাচীর বেষ্টিত, ধরাধর
গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে ; সূর্য্যবংশ অবতংস
বাপ্পারাও—কীর্ত্তি যাঁর ব্যাপ্ত ধরাতলে,
বসিতেন অই পুরে—"

একটা উক্তি পড়া শেষ হইল। ভদ্রলোকটী বলিলেন, "এতে তো গলার ওজন বোঝা যাবে না, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার চেঁচিয়ে বল দেখি।" যুবকগুলি উস্‌খুস্ করিয়া উঠিলেন, আমি প্রমাদ গণিলাম। নিজে পড়িতে পারি, তাই বলিয়া আর-একজনের ফরমাইস মত তাহার গলায় গলা মিলাইয়া বলা,—বিশেষ এতগুলি অপরিচিত যুবকের সম্মুখে—কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। বন্ধু আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি, বল্ না, মেয়েমানুষ তো নস? পুরুষ মানুষ!" আমি তখনও নির্ব্বাক—ভাবিতেছি, পুরুষ হইলেই কি সাত খুন মাপ, সে নাক কান কাটা বেহায়া, এখানে আসিয়া কী ঝকমারিই করিয়াছি! অনেকবার মনে মনে সেই পুরাণো 'ভীমচক্র' স্মরণ করিলাম। কিন্তু তাহাতেও সাহস বাড়িল না, বরং আরও লজ্জা আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বন্ধুটী তখন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্যই আমার সামনে

আসিয়া দাঁড়াইয়া, "এই দেখ্ আমি বলছি"—বলিয়াই ত্রিসপ্তম-সুরে আরম্ভ করিলেন :

"কি বলিব মন্ত্রিবর, বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা, তপ্ত লোহসম
ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়।"

বন্ধুটীর আমার গলা ছিল—কিসের মত বলিব ? বাজের মত, না ততোধিক ! প্রতি ছত্রে পর্দ্দায় পর্দ্দায় গলা চড়াইয়া "বিদরে হৃদয়" বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন—হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষু রক্তবর্ণ, কণ্ঠের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর একটু হইলেই মুখে গাঁজলা ভাঙ্গিবে—আমার তো কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। আমি মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "ও বাবা, এ কী আড্ডা!" রিহার্স্যাল মাষ্টার যিনি, তিনি বন্ধুটীকে ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম্, থাম্, তোকে আর চেঁচাতে হবে না।" বন্ধুবর তথাপি বার দুই "বিদরে হৃদয়"—"বিদরে হৃদয়" বলিয়া শেষে সত্যই চুপ করিলেন। ভদ্রলোকটী আমায় বলিলেন, "তুমি একবার চেঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বল তো ; তোমার গলাটা শুনে নিই।" আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যতদূর সম্ভব উচ্চকণ্ঠেই তাঁহার সঙ্গে দুই-চারি ছত্র আবৃত্তি করিয়া গেলাম। তিনি আমার কণ্ঠস্বরের তারিফ করিয়া বন্ধুটীকে বলিলেন, "বেশ মিষ্টি গলা, এর হ'তে পারে। একে নিয়ে আসিস।" বন্ধু বলিলেন, নিয়ে আসব, কিন্তু ও তো রোজ আসতে পারবে না ; ও যে এবার এক্জামিন দেবে।" তিনি বলিলেন, "মাঝে মাঝে এলেই হবে।" নিতান্ত অনিচ্ছায় এইরূপ অভাবনীয়ভাবে আমি সেইদিন, সেই আড্ডারূপ "যমদ্বারে মহাঘোরে" প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই আমিও ইহার একজন নিয়মিত সভ্য হইয়া গেলাম এবং তাহারই ফলে সেই বৎসরে—এই ঘটনার প্রায় মাস পাঁচেক পরে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়া, অঙ্কের খাতায় একান্ত অনন্যোপায় হইয়াই দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের প্রায় সমস্ত ইংরাজী বুকনীগুলি লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম !

[৩]

আড্ডায় শুনিলাম, জাহাজের কাপ্তেন ছাড়া স্থলপথেরও একরকমের কাপ্তেন আছে ; তাহারা জলে জাহাজের পরিবর্ত্তে সংসারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে জলে ভাসায়, বাপের বিষয় হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া ওড়ায়, মোসাহেব পোষে, মদ খায়,

বেশ্যা রাখে। আর ইহাদেরই দুই-একটা কাংলা কখন কখন থিয়েটার করে; সুতরাং থিয়েটার করিতে গেলেই এমনই একজন 'কাপ্তেন' আবশ্যক হয়। তখন অনেক থিয়েটারওয়ালারই কাপ্তেন-ধরার খুব সুখ্যাতি ছিল; অনেক কাপ্তেন অনেক থিয়েটাররূপ হাড়িকাঠে ঘায়েল হইয়াছিল। আমাদেরও আড্ডায় জল্পনা চলিতে লাগিল, খোঁজ কোথায় কাপ্তেন পাওয়া যায়। দিকে দিকে কাপ্তেন অন্বেষণের ধুম পড়িয়া গেল। কোন বিশিষ্ট জমীদার আমার সহপাঠী ছিলেন, বাল্যদুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাঁহাকেই আমরা কাপ্তেন ধরিলাম। স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় যে বীণা থিয়েটার করিয়াছিলেন তাহাই ভাড়া লইলাম। ঐ থিয়েটারের মালিক ছিলেন তখন "সুধা-সিন্ধু"র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমরা ভাড়া লইবার পূর্ব্বে সিটী থিয়েটার এই থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করিয়াছিল। বিপুল উদ্যমে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল; অভিনেত্রীর খোঁজ পড়িল; দিকে দিকে নবীন কর্ম্মীর দল অভিনেত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আর্টের নামে উৎসন্ন যাইবার এই একটা artistic উপায়। এই অভিনেত্রী অন্বেষণ ব্যপদেশেই এই সহরের কোন নিষিদ্ধ পল্লীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হই। এইরূপ ঘৃণিত পল্লীতে প্রবেশ আর পল্লীর রকমারী বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গান, ইহার মধ্যে যে কী সঙ্কোচ, কী ভয়, এবং সর্ব্বোপরি কী ঘৃণা সহজেই মনকে মলিন ও মুখকে আরক্তিম করিয়া তুলিত, তাহা—ভগবান করুন—পতিতার উদ্ধারকামী কোন সহৃদয় ভদ্রসন্তানকে যেন ঠেকিয়া শিখিতে না-হয়! পাপীকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও—এ পবিত্র নীতি, আর যাহার উদ্দেশেই উক্ত হউক, অল্পবয়স্ক অপরিপক্ক-বুদ্ধি বিচারবুদ্ধিহীন যুবকদের জন্য যে ইহা নয়, এ কথা তামা তুলসী গঙ্গাজল লইয়া হলফ করিয়া বলিলেও কোন পাপ হয় না!

[৪]

যে রাত্রে আমরা বীণা থিয়েটার দখল লই, সে রাত্রের কথা এখনও মনে আছে। মনে আছে, কেননা সেটী আমাদের নট-জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। স্কুল হইতে কলেজ প্রবেশের সময় ছেলেদের যেমন একটা নূতন গর্ব্ব নূতন উৎসাহ দেখা দেয়, তেমনি শ্যামপুকুরের আখড়া হইতে "পাবলিক ষ্টেজে" প্রবেশে আমরাও বেশ একটু আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

পৌষ মাস, বড়দিনের আর দুই-একদিন মাত্র বাকী, একদিন সন্ধ্যাবেলা

আমরা বীণা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলাম। পরিত্যক্ত নাট্যশালা ঠিক যেন একটা ভূতের বাড়ী। প্রবেশের পথ স্যাঁতসেঁতে, ভিতরে দুর্গন্ধ; ষ্টেজের একপাশে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম পড়িয়া ছিল, সেইটা টানিয়া লইয়া একজন বাজাইতে আরম্ভ করিল। কেহ সিন ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, কেহ দু-পা নাচিয়াই দিল। মাতাদীন বুড়ো দরোয়ান, রাজকৃষ্ণবাবুর আমলের লোক, সে আসিয়া একটা লম্বা সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই প্রিয়বাবু উপস্থিত হইয়া আমাদের দেখাইয়া দরোয়ানকে বলিলেন, "আজ থেকে এই বাবুরা ষ্টেজ ভাড়া নিয়েছেন, এঁদের হাতে সমস্ত চাবী দিয়ে দাও।" আমরা চাবী লইলাম, চাবী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "পজেসন"—দখল—পাকা সাব্যস্ত হইল। প্রিয়বাবু স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মাতাদীন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, কি চাই?" তখন রাত্রি হইয়াছে, সুতরাং অন্ধকারে প্রথম দরকার—আলো। আমরা বলিলাম, "বাপু, একটা আলোর ব্যবস্থা ক'রে দাও, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" বাস্তবিকই অন্ধকারে আমরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। খানিক পরে মাতাদীন একটা কেরো-সিনের ডিবা আনিয়া হাজির করিল। কোন অনিবার্য্য কারণে গ্যাস কোম্পানী গ্যাস পাইপ পূর্ব্বেই কাটিয়া দিয়াছিল। সাব্যস্ত হইল, রাত্রে আর বাড়ী যাওয়া নয়, এইখানেই থাকিতে হইবে। কিন্তু থাকার সঙ্গে খাওয়ার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ; সুতরাং প্রশ্ন উঠিল, আহারের কি হইবে? আমার সেই বন্ধুটী, যিনি আমায় সঙ্গে করিয়া প্রথম আড্ডায় লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই মুশকিল আসান করিলেন। তিনি বলিলেন, আজ তাঁহাদের বাড়ীতে একটা অন্নপ্রাশন, যদি কেহ বহিয়া আনিতে পারে, তিনি খাবার দিতে প্রস্তুত। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইলে বন্ধুটী একজনকে সঙ্গে লইয়া খাবার আনিতে গেলেন। আমরা বাজার হইতে কলসী আনাইয়া জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। ঘণ্টা দুই পরে, রাত্রি তখন প্রায় দশটা, দেখি এক ঝুড়ি খাবার লইয়া বন্ধুটী উপস্থিত। প্রবল আনন্দে ভূরিভোজন সম্পন্ন হইল। এই অপ্রত্যাশিত মিষ্টান্নলাভ আমরা শুভ বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। আহারের পর কিন্তু অনেকেরই উৎসাহ নিভিয়া গেল। পৌষ মাসের হাড়ভাঙ্গা কন্‌কনে শীত, চারিদিক ফাঁকা, হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে—আর কী মশা! দলের অনেকেই একে একে রণে ভঙ্গ দিল—রহিলাম আমরা তিনজন—সখ আমাদেরই উৎকট কিনা! শোবার বিছানা নাই; মাতাদীন কোথা হইতে একটা ছেঁড়া মাদুর আনিয়া দিল। ধূমান্বিত কেরোসিনের আলো পাশে রাখিয়া অগণিত মশকবাহিনী পরিবৃত

আমরা তিনটী প্রাণী সেই ছেঁড়া মাদুরের উপর গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়া পুনঃপুনঃ শুইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সাধ্য কি! এক একবার ভাঙ্গা হারমোনিয়ামটার দিকে তাকাই, একবার-বা ঝরির দিকে চাই, আর কত বিচিত্র কল্পনার নব নব চিত্র মানস-নয়নে জাগিয়া উঠে—ঠিক যেন ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্নের মত! সামনে "অডিটোরিয়ম" পড়িয়া আছে, স্তূপাকার বেঞ্চি ও ভাঙ্গা চেয়ার; ষ্টেজে যেমন মশা, অডিটোরিয়মে তেমনি ইন্দুরের ছুটোপুটি। সুতরাং ঘরে, বাহিরে, মনে এবং কানে সমান উপদ্রব। অতএব শুইবার চেষ্টা ও নিদ্রার আশা ত্যাগ করিয়া আমরা তামাক সেবায় ব্যাপৃত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই কিছু তামাক এবং একটা খেলো হুঁকা সংগৃহীত হইয়াছিল; এখন মুহুর্মুহু দা'কাটা চলিতে লাগিল, আর যত আকাশকুসুম কল্পনার জাল বোনা শুরু হইল। মনে হইল একদিন ঐ অডিটোরিয়মে বসিয়া কত লোক আমাদের অভিনয় দেখিবে; আমরা সকলেই তখন মনে মনে এক একটা "হিরো", আমরা অভিনয় করিব, লোকে আমাদিগকে বাহবা দিবে, হাততালি দিবে। উচ্চ আশা—আমাদের মধ্যে কেহ হইবেন গিরিশচন্দ্র, কেহ অমৃত মিত্র, কেহ মহেন্দ্র বসু ইত্যাদি। এখনকার মত তখন কলেজে কলেজে থিয়েটার হয় নাই, এম. এ., বি. এ. অভিনেতার আদর্শ গ্রহণ তখন স্বপ্নাতীত ব্যাপার! যাহারাই থিয়েটার করে, তাহাদেরই আদর্শ তখন হয় অমৃতলাল, নয় মহেন্দ্রলাল ইত্যাদি। আমরাও সেই আদর্শে বড় অভিনেতা হইবার এই উচ্চ আশায় তখন উন্মত্ত। এখন যেমন বায়োস্কোপের ছবি দেখিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা এবং মুখভঙ্গির বাতিক উঠিয়াছে, তখন এইভাবের অভিনয়ের ততটা প্রচলন ছিল না, কিন্তু গলা তৈরীর বাতিক ছিল সংক্রামক। কারণ রসবিকাশের প্রধান উপাদান ও অবলম্বন ছিল তখন কণ্ঠস্বর। কেমন করিয়া আমরা গলা তৈরী করিতাম, তাহার একান্ত দৃষ্টান্ত দিই।

শ্যামপুকুরের আখড়ায় গলা সাধার তেমন সুবিধা হইত না, কারণ চারিপাশে ভদ্রলোকের বাড়ী; অথচ গলা তৈরী না-হইলে বড় এ্যাক্‌টর হওয়া যায় না। এই উভয়সঙ্কটের মাঝখানে পন্থা খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের একটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান মিলিয়া গেল। নতুন খালের ধারে রেলওয়ে ব্রিজের নীচে সিমেণ্ট দিয়া খানিকটা পোস্তা গাঁথান ছিল। আমরা সেই স্থানটাই স্বর-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইলাম। দুপুরবেলায় আহারের পর সেখানে আমরা রিহার্স্যাল দিতে যাইতাম। আমাদের দলের আচার্য্য বা গুরু ছিলেন, প্রথম

দিন আখড়ায় যে ভদ্রলোকটীর নিকট পরীক্ষা দিই, তিনি। নানা কারণে তাঁহার নাম এখন প্রকাশ করিলাম না। থিয়েটারের সংস্রবে আসিয়া যাঁহারা সাধারণে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই নাম প্রয়োজনমত প্রকাশ করিব মাত্র। আমাদের সঙ্গে থাকিত হুঁকা, কল্‌কে, তামাক আর এক কুঁজো খাবার জল। আমাদের গলা তৈরীর বই ছিল 'পলাশীর যুদ্ধ'। চারিধারে মাঠ—বন, জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহরের দারুণ গরম—গা ঝল্‌সে যায়; কিন্তু তাহাতে কি? আমরা খালের ধারে পোলের নীচে গিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতাম—"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন!" কণ্ঠার শির ফুলিয়া উঠিত, দরদর ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইত, তৃষ্ণায় বুক গলা শুকাইয়া যাইত, তথাপি কম্পিটিসানে সে কী চীৎকার! বাঙ্গাল মাঝিরা নৌকা হইতে হাঁ করিয়া আমাদের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, কখনও-বা দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত; আমরা তাহাদিগকেই শ্রোতা মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে "দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন"—বলিতাম। এমনি দিনের পর দিন বেলা একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সমানে আমাদের গলা সাধার কসরৎ চলিত। অতঃপর সন্ধ্যা নাগাইদ আখড়ায় জমিয়া, আরম্ভ হইত 'ফাইন এ্যাক্‌টিং'।

এখন, যে কথা বলিতেছিলাম! রাত্রি যখন দুইটা কি তিনটা, শীতের প্রকোপে কেবল দা'কাটায় আর কল্পনায় রাত কাটান তখন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। পাতলা র‍্যাপার, হু হু করিয়া কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছে, বুকের ভিতর কাঁপুনী ধরিয়াছে—আমরা অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্বের সেই খালধারকে স্মরণ করিলাম—রাত্রের সেই শেষযামে, যতদূর সাধ্য উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন!" উদ্দেশ্য, ঘাম বাহির না-হউক, রক্ত গরম হইয়া শীত কমিতে পারে; কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। আমরা তন্ময় হইয়া চীৎকার করিতেছি, দেখি, সেই ভীষণ অন্ধকারে (কেরোসিনের ডিবার আলোটা তৎপূর্ব্বেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল) একজন পাহারাওয়ালা আমাদের মুখের উপর তাহার হাত-লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বোধহয় ঠিক করিতে পারে নাই, আমরা চোর কি পাগল! আমাদের চীৎকার থামিল, একটু লজ্জিত, ভীত, ততোধিক চমৎকৃত হইয়া প্রায় সপ্রতিভের মত আমরা বলিলাম, "জমাদার সাহেব, আমরা এ্যাক্‌টিং কর্‌তা হ্যায়, তোম্ এত রাত্রে কী মনে ক'রে আয়া?" জমাদারের কথায় বুঝিলাম আমাদের হিন্দী তাহার বোধগম্য হয় নাই এবং সে প্রতিরাত্রেই এখানে এই সময় নির্ব্বিবাদে ঘুমাইয়া আপন 'ডিউটী' বজায় করে।

এমনি করিয়া রাত্রি প্রভাত হইল—আমাদের পাবলিক ষ্টেজে প্রবেশের প্রথম রাত্রি! যাহারা বাড়ী গিয়াছিল, এক এক করিয়া তাহাদের সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। তখনই পরামর্শসভা বসিল; কীভাবে আমরা থিয়েটার করিব তাহার প্ল্যান স্থির হইল। আমাদের নূতন স্বত্বাধিকারী আসিলেন; আমরাও নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া কেহ হইলাম ম্যানেজার, কেহ ক্যাসিয়ার, কেহ-বা নাট্যাচার্য্য। অপেরা মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন হিঙ্গুল খাঁ; ইনি গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন, ইদানীং রাজকৃষ্ণবাবুর সময়ে বীণা থিয়েটারে অভিনয় দিতেন, গানের সুরও দিতেন। অনেকে ইহাকে বাঙ্গালী হেমবাবু বলিয়া জানিত।

ক্রমশঃ আমাদের দল জাঁকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অভিনেত্রী আমদানী বাড়িল। এই অভিনেত্রী সংগ্রহ তখন এখনকার মত সুলভ ছিল না, অনেক খুঁজিয়া-বাছিয়া জোগাড় করিতে হইত; অভিনেত্রী সংগ্রহের লোকও তখন পয়সা দিলে পাওয়া যাইত। নূতন দল বসাইয়া প্রত্যহ আমাদের যাচাই-বাছাই চলিতে লাগিল, পাবলিক থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া আমরা পছন্দ করিতাম না। নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী গড়িয়া লইব, ইহাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য; কাজেই নূতন দল গড়িয়া থিয়েটার খুলিতে দেরী হইতে লাগিল। রিহার্স্যালের জন্য বই বাছিয়া লওয়া হইল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'—কেননা নূতন দল তৈরী করিবার পক্ষে এই বইখানি বিশেষ উপযোগী। ইহাতে অনেক পুরুষের 'পার্ট' আছে, স্ত্রী লোকের পার্ট খুব কম। পার্ট নির্ব্বাচন হইল, রিহার্স্যালও চলিতে লাগিল।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে তাণ্তিয়া ভীলের জীবনী বাহির হইয়াছে, তাণ্তিয়ার নাম লইয়া খুব হুজুগ চলিতেছে। আমাদের শিক্ষক ও নাট্যকার, তাণ্তিয়াকে লইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র সঙ্গে 'পলাশীর যুদ্ধে'রও রিহার্স্যাল চলিতে লাগিল।

থিয়েটারের নামকরণ হইল প্যাণ্ডোরা থিয়েটার। ৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ৺দুর্গাদাস দে এই নামকরণ করেন। গিরিশবাবু তখন মিনার্ভার ম্যানেজার, পরামর্শের জন্য আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতেও যাইতাম। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় মঠে, পরে এই থিয়েটার লওয়ার সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। পাঁচ-ছয় মাস রিহার্স্যালই দিলাম, কিন্তু থিয়েটার খোলা হইল না। না-খুলিবার কারণ, ব্যবসায়বুদ্ধি আমাদের

আদৌ ছিল না। দিন গেল, প্লাকার্ড বাহির হইল, সাজ সরঞ্জাম তৈরী হইতে লাগিল, এমন সময় স্বত্বাধিকারী আটক পড়িলেন। তাঁহার বাড়ীর লোক অর্থাৎ অভিভাবকগণ জানিতে পারিয়া তাঁহার থিয়েটারে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন।

[৫]

টাকার টানাটানি পড়িল, মনোমোহনবাবু মহাজন হইয়া টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, দলে মতবিরোধ ঘটিয়া নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এদিকে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার একজন বন্ধু সহসা থিয়েটার গগনে আবির্ভূত হইলেন। ইঁহারা ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছিলেন আমাদিগকে তুলিয়া দিয়া বীণা থিয়েটার ভাড়া লইবেন, অর্থাৎ সিটী থিয়েটারের সেক্রেটারী বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এই সময় সিটীকে পুনঃপ্রকটিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যতদূর মনে হইতেছে, বোধহয় এবারে সিটী নাম বদলাইয়া গেইটী (Gaiety) থিয়েটার নাম গ্রহণ করে। ইতিপূর্ব্বে গিরিশবাবু নেপথ্যে থাকিয়া সিটীকে সাহায্য করিতেন। দানীবাবু তখন সিটীতে, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তখন সিটীর 'হিরো'। এই দলকে লইয়াই গিরিশবাবু প্রথমে মিনার্ভার ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে নানা কারণে এই দলের সঙ্গে গিরিশ-বাবুর বনিবনাও হয় নাই। মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী যত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ইঁহাদের বিরোধও তত বাড়িতে লাগিল। শেষে মিনার্ভা যখন খোলা হইল, সিটীর অনেককে তখন আর সে দলে বড় দেখা গেল না; সুতরাং সিটীর দল 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট' হইয়া ঘরে গিয়া বসিল; তাই দলপতি নীলমাধববাবুর এই দ্বিতীয় অভিযান। এখনও একজন বড়লোক ধরিয়া থিয়েটার করিবার প্রথা প্রচলিত, ব্যতিক্রম কেবল ষ্টারে ও বেঙ্গলে। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী তখন নাগেন্দ্রবাবু, ইনি ঠাকুরবাড়ীর দৌহিত্র। সুতরাং স্বত্বাধিকারী হারাইয়া আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাড়ীভাড়া বাকী পড়িল; সুযোগ বুঝিয়া নীলমাধববাবু অমরবাবুর বন্ধুকে সহায় করিয়া পুনরায় বীণা থিয়েটার 'লিজ' লইলেন, আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। আমাদের যে নূতন দল গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।

আমাদের দল ভাঙ্গিবার কয়েক মাস পরেই আমি স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুর নিকট অভিনয় শিক্ষার জন্য যাই। তখন তিনি এমারেল্ড থিয়েটার 'লিজ' লইয়া চালাইতেছিলেন। মহেন্দ্রবাবুই স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার এবং স্বর্গীয়

অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাট্যকার ; স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের নিকট হইতে এই থিয়েটার 'লিজ' লওয়া হইয়াছিল। এমারেল্ডে তখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে ছিলেন :

৺মতিলাল সুর	৺সুকুমারী দত্ত
৺জীবনকৃষ্ণ সেন	৺কুসুমকুমারী ("বিষাদ")
(এই সময়ে ষ্টার ছাড়িয়া	৺ক্ষেত্রমণি
এমারেল্ডে গিয়াছিলেন)	সরোজিনী
৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	(ঢাকার "কনক সরোজিনী",
("ফটাই" ; ইনি পরে	তখন "কাল সর")
ষ্টারে যোগদান করেন	
এবং বিশেষ প্রশংসাও পান)	

মহেন্দ্রবাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অতুলবাবু জীবনবাবু প্রভৃতির সহিতও বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। আমি অধিকাংশ সময় মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়া অভিনয় শিখিতাম ; শিখিতাম মাত্র, তখনও কিন্তু রঙ্গমঞ্চে রূপ ধরি নাই।

বাহিরের লোকের সাধারণ রঙ্গালয়ে টিঁকিয়া থাকা তখন বড়ই কষ্টকর ছিল। যাঁহারা থিয়েটার করিতেন, তাঁহারা বাহিরের লোককে বড় সহজে ঢুকিতে দিতেন না, দিলেও দলের সকলে বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটার তখনও একটা ব্যবসায়ের ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠে নাই। থিয়েটার যেন একটা কাপ্তেনী কাণ্ড! রাত্রে হৈ হৈ রৈ রৈ—আর দিনের বেলায় যাত্রার ভাঙ্গা আসরের ন্যায় একটা হতশ্রী ম্রিয়মান অবস্থা। আমি তখনকার এমারেল্ড থিয়েটারের একটা চিত্র দিতেছি।

সন্ধ্যা হইতে রিহার্স্যাল আরম্ভ হইত, তৎপূর্ব্বে অভিনেত্রীদের আনাইয়া গানের মহলা বসিত ; সন্ধ্যার পর বাবুরা আসিয়া জুটিতেন। রিহার্স্যালে অনেকটা বাগানবাড়ীর চিত্রও ফুটিয়া উঠিত। 'ডিসিপ্লিন' বলিয়া মানিয়া চলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। এই অবস্থায় হঠাৎ কোন বাহিরের লোক যদি রিহার্স্যালে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি সে সময়ের বাঙ্গলা থিয়েটার সম্বন্ধে যে ধারণা লইয়া যাইতেন, তাহা প্রীতিকর বলিয়া মনে করা যায় না। রিহার্স্যালে শিখালোর কাজ যে কিছু হইত না এমন নহে, তবে একটা ইন্‌ষ্টিটিউশন বা স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ হইত না। ষ্টেজের উপর মাদুর পাতিয়া

অভিনেতা অভিনেত্রীরা একসঙ্গেই বসিত, গড়গড়ায় তামাক, হাতে হাতে পানের খিলি, মাঝে মাঝে উইং-এর আড়ালে গিয়া মদ খাওয়া, এবং ক্রমশঃ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যস্থিত বোতল গেলাসের সেই মাদুরের ফরাসেই আবির্ভাব, ইহাতেই রিহার্স্যালকাণ্ডের পর্য্যবসান হইত। সময়ে সময়ে অবাধ ইয়ারকি ও অসংযত ভাষার প্রয়োগনৈপুণ্যে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম; কারণ আমরা তখন সবেমাত্র স্কুল ছাড়িয়া থিয়েটারে ভিড়িয়াছি, সুতরাং এইসব ব্যাপার আমাদের নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। ইহার উপর দলের দু-চারজনের ব্যবহারও বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। একদিনের ঘটনা বলি:

শীতকাল, রিহার্স্যালে বসিয়া আছি, হঠাৎ একজন অভিনেতা—এতদিন পরে আর নামটা করিব না, তবে বেশ খ্যাতনামা অভিনেতা—কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমার গায়ের কাপড়খানা একবার দাও তো ভাই, আমি চট ক'রে ঘুরে আসি।" দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেইদিন নূতন একখানি আলোয়ান গায়ে দিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাহা হইলেও দ্বিরুক্তি না-করিয়া গায়ের কাপড়খানা খুলিয়া দিলাম —ভদ্রলোক "এখনি আসিতেছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বসিয়াই আছি—আট, নয়, দশ, ক্রমে বারোটা বাজিয়া গেল, ভদ্রলোকের "এখনি আসি"র আর সময় হইল না। রিহার্স্যাল ভাঙ্গিয়াছে, বারোটা বাজিয়াছে, ষ্টেজে বড় একটা কেহ নাই, মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে এখনও ব'সে আছ?" অন্যদিন দশটার মধ্যে বাড়ী যাইতাম। আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "এই মাটি করেছে! সে কাপড় কি আর পাবে? সেটা এতক্ষণ মদের দোকানে জমা হয়েছে!" আর দু-চার বছর বয়স কম হইলে হয়তো কাঁদিয়াই ফেলিতাম, নতুন গায়ের কাপড়, সবে সেইদিন গায়ে দিয়াছি! বলিলাম, "বলেন কি?" মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর কি? তা যাক্, আজ আর কষ্ট ক'রে কাজ নাই, বাড়ী যাও, কাল দুপুরে 'অমুক' স্থানে একবার খবর নিও, যদি বরাত ভাল হয় পেলেও পেতে পার; সে বোধহয় আজ সেখানে গিয়েই জুটেছে।" "অমুক" স্থানটা যে কোন ভদ্র পল্লীতে ছিল তাহা নহে, আমার কিন্তু তখন "অমুক" স্থানে যাইতে বাধিত না; অভিনেত্রী-অনুসন্ধান ব্যপদেশে অনেক "অমুক" স্থানে যাওয়াই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্রবাবুর কথাই শুনিলাম। পরদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখি গায়ের কাপড় নাই, তবে যিনি লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বেশ নিরাপদেই আছেন। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না-হইয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আরে এস এস, ভাগ্যিস গায়ের কাপড় এনেছিলাম,

তাই এখানে পদার্পণ হ'ল।" তাঁর আপ্যায়ন আমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না; আমি তখন সাগ্রহে খুঁজিতেছিলাম কোন্ আলনায় বা বিছানার পাশে আমার গায়ের কাপড়খানা স্থান পাইয়াছে; অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না! তাহার পর কী করিয়া গায়ের কাপড়খানা আদায় করিয়াছিলাম, সে কথা আর নাই বলিলাম।

এই এমারেল্ড থিয়েটারেই দেখিয়াছি, অবশ্য আমি দুই-একজন অভিনেতার কথাই বলিতেছি, রিহার্স্যাল কিংবা অভিনয় ভাঙ্গার পর তাঁহারা আর বাড়ী যাইতেন না। থিয়েটারের 'কার্টেন' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও চিত্তের উপর একখানি 'কার্টেন' পড়িত। সে কার্টেনে অভিনেতার বাড়ী ঘর সংসারের দিকটা ঢাকা পড়িয়া যাইত, ভাসিয়া উঠিত কেবল তরলা প্রকৃতি প্রসাদাৎ "সচ্চিদানন্দরূপং শিবোহহং শিবোহহম্!" বোতলের তরল আনন্দ আকণ্ঠ উদরে, মহাদেবের ধুতুরা-ফুলা কলিকা হাতে; পিটের একখানা ভাঙ্গা বেঞ্চ কাহারও আসন হইয়াছে, কেহ-বা ষ্টেজের একপাশে মহাসমাধিতে নিমগ্ন, কাহাকে-বা চেনা পাহারাওয়ালা ধরিয়া গাড়ীবারান্দার নীচে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে! পরদিন বেলা বারোটায় ইঁহাদের সমাধি ভাঙ্গিত; এই সমাধি-ভঙ্গের পর সাধকের যে চেহারা ফুটিয়া উঠিত, তাহা লইয়া বাড়ীতে আর যাওয়া যায় না, কাজেই তাঁহাদের আর বাড়ী যাওয়া ঘটিত না। পকেটে বখেয়া সেলাই, কিন্তু দেহ ধারণ করিতে হইলেই আহারের প্রয়োজন। নতুন বাজারের গাঙ্গুলীমশায় তো বেয়াড়া লোক; তাঁহার হোটেলে নগদ পয়সা না-দিলে তিনি আর ভাতের থালা সামনে ধরিয়া দেন না, কাজেই নগদা বিদায়ের প্রত্যাশায় নিত্য দ্বিপ্রহরে এই দল জুটিতেন ম্যানেজার মহাশয়ের বাড়ীতে। আহারান্তে ক্লান্ত দেহ বাড়ীর দিকে আগাইতে চাহিত না, তাই তাঁহারা আবার থিয়েটারেই ফিরিয়া আসিতেন এবং সুস্থ চিত্তে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। অপরাহ্ণে যখন অভিনেত্রীদের আনাইবার জন্য গাড়ী বাহির হইত, সেই সময় ইঁহাদের চমক ভাঙ্গিত; যে যার উঠিয়া মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া টেরী কাটিতে বসিতেন। তাহার পর "বেশ পরিবর্ত্তন"; পরিধানে কোঁচান কাপড়, পায়ে পম্প সু, গায়ে ডবলব্রেষ্ট সার্টের উপর বুকখোলা ওয়েষ্টকোট (তখন এই বেশেরই বেশী প্রচলন ছিল), তাম্বুল-চর্চ্চিত অধর—একেবারে নটবর বেশ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ চিত্র কিছু সকল অভিনেতার নহে; তবে একটা দলের মধ্যে খুঁজিলে এইরকম দু-চারজনকে তখন সহজেই পাওয়া যাইত। ইহারাই

ছিলেন থিয়েটারের অষ্টপ্রহরের সাথী। এখনও খুঁজিলে কোন কোন থিয়েটারে এইরূপ "সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং-"-এর দলের দু-একজনকে যে না-পাওয়া যায় এমন নহে; তবে এই ক্রমোন্নতির দিনে আমরা আশা করি ক্রমশঃ ইহাদের বংশ লোপ হইয়া আসিবে; কিন্তু আসিবে কি? অগ্নিপরীক্ষায় উত্তরণের আশা করা সহজ, কিন্তু পরিণাম?

প্রথম বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া আমরা কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের সহিত দেখা করি। তিনি আমাদের থিয়েটার করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার সেই উপদেশবাণী এখনও মনে আছে; বরং কেবল মনে আছে নয়, যত দিন গিয়াছে, মনে দৃঢ় বসিয়া গিয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবু বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আপনারা ছেলেমানুষ; থিয়েটার না-করাই ভাল। কারণ স্থানটা বড় স্বাস্থ্যকর নয়। পরকালে নরক আছে শুনেছেন তো? ইহকালের নরক হ'ল এই থিয়েটার। তবে প্রভেদ এই, পরকালের নরক দুঃখের, আর ইহকালের নরক সুখের নরক! দুঃখের নরকে রক্ষা আছে, কিন্তু সুখের নরকে কোনকালেই নিস্কৃতি নেই।"

পাবলিক থিয়েটার ভাল লাগিল না। ছাড়িয়া দিলাম। তখনকার থিয়েটারী আবহাওয়া ঠিক যেন খাপ খাইল না। বয়স অল্প হইলেও মনে মনে তখন দুরাশা জন্মিয়াছিল—আমরা জনে জনে 'ভয়ঙ্কর অভিনেতা' হইব। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিপরীত! যাঁহারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহারা নূতন কাহাকেও দলে লইতে বড় রাজী নহেন। থিয়েটারের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়; সুতরাং থিয়েটারে ঢুকিবার মত লোভনীয় তখন বিশেষ কিছুই ছিল না। খুব ভাল অভিনেতার বেতন তখন চল্লিশ কি পঞ্চাশ; তাও সব থিয়েটারে সব সময় মাসে মাসে ঠিক মাহিয়ানাও সকলে পাইতেন না। যাঁহারা বেতনভোগী অভিনেতা ছিলেন—তাঁহারা যে কেবল পয়সার খাতিরেই থিয়েটার করিতেন, তাহা নহে। উৎকট সখের জন্যই তাঁহারা যে এই নটবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

থিয়েটার নব অনুরাগ। নিজেরা থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এমারেল্ড থিয়েটারও ভাল লাগিল না; বাড়ীও ভাল লাগিল না। মাস আষ্টেক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া পশ্চিমাঞ্চল ঘুরিয়া আসিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের ভাঙ্গা দল আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সহরের কোন "অমুক" পল্লীতে ঘর ভাড়া লইয়া রিহার্স্যাল শুরু করিয়াছে। আর এবার—কেবল অভিনেতা তৈয়ারী নয়, নূতন অভিনেত্রীদেরও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উদ্দেশ্য, আবার

একটা পাবলিক থিয়েটার দখল করিয়া বসিতে হইবে। এখনকার মত তখন পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে সখের থিয়েটারের চলন হয় নাই। বিশেষতঃ অভিনেত্রী লইয়া সখের থিয়েটারের চলন খুব কমই ছিল। আমরা পুনরায় দল করিলাম বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য এ নহে, যে দু-এক রাত্রি কোথাও অভিনয় করিয়া সখ মিটাইব। একটা স্থায়ী থিয়েটারের দল গঠনই আমাদের সঙ্কল্প।

কিন্তু দল গঠন হইলেই তো গোল মিটিল না। থিয়েটারের বাড়ী চাই। তদর্থে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এবারে টাকার যোগাড় করিতে পারিলাম না। আখড়ায় (বিশুদ্ধ ভাষায়, "ক্লাবে")—কেবল রিহার্স্যাল ও শিক্ষানবিশীই হইতে লাগিল। পাবলিক থিয়েটারে প্রবেশ মরীচিকার মত দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

অর্থ এবং নানা কারণে আমরা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিন্তু বাহির হইতে আর-একজন প্রতিভাবান নট আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া ফেলিলেন ; ইনি স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। থিয়েটারে শিক্ষানবিশী না-করিয়া, বাহির হইতে আসিয়া যে, কেহ তখনকার থিয়েটারী চক্রের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন অমরবাবু। পাবলিক থিয়েটারে 'হিরো' সাজার পথ তিনিই প্রথম প্রশস্ত করিয়া দেন, সুলভ করিয়া তুলেন। বীণা থিয়েটার ছাড়িয়া আমরা যখন আখড়া দিতেছি সেই সময়েই ক্লাসিকের সৃষ্টি হয়। সে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে নাম দিয়া একটী সখের থিয়েটার খোলেন, এবং কোরিন্থিয়ানের ষ্টেজ ভাড়া লইয়া কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এক রাত্রির জন্য অভিনয় করেন। শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এই দলে ছিলেন। সিরাজ অমরেন্দ্রনাথ, মোহনলাল চুনীবাবু এবং ক্লাইবের ভূমিকায় 'ইয়ং গিরিশ ঘোষ' বলিয়া দানীবাবুর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর মিনার্ভার ষ্টেজ ভাড়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথ এক রাত্রি 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'বেল্লিক বাজার' অভিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপ সখের থিয়েটারের পালা গাহিতে গাহিতে তিনি যে পেশাদার থিয়েটারের সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম হয় ক্লাসিক।

স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের এমারেল্ড ষ্টেজে স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী তখন সিটী থিয়েটার চালাইতেছেন ; ইহা তাঁহাদের গেইটীর পরে ; কিন্তু দল ভাল চলে না, কারবার লোকসানী, বাড়ী ভাড়া বাকী ; সুকৌশলী অমরেন্দ্রনাথ সেই অবসরে

গোপালবাবুর নিকট হইতে এমারেল্ড ষ্টেজ ভাড়া লন। নীলমাধববাবুর সিটী দ্বিতীয় কিস্তি ভাঙ্গিয়া গেল ; সেই ভাঙ্গা দলের কতক লোক এবং অন্যান্ত থিয়েটার হইতে দুই-চারিজনকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া অমরবাবু নূতন দল করিলেন। এই সময় পোষাক পরিচ্ছদ ও অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়া তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল 'ভিক্টোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব'। এই ক্লাবের পরিচালক ছিলেন ৺চন্দ্রনাথ সেন ও শিক্ষক ছিলেন নটগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর। এই প্রাইভেট থিয়েটার অনেকদিন হইতেই কলিকাতা রামবাগানে একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম পার্ব্বণোপলক্ষে সহর ও মফঃস্বলে অভিনয় করিয়া বেড়াইত। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন নাই তখন এই সম্প্রদায়ে ৺নগেন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'হরিরাজ' নাটক অভিনীত হইত। নগেন্দ্রবাবু পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের ভাগিনেয়। ইঁহার অভিনয় করিবার একটু বিশেষ সখ এবং অধিকারও ছিল ; ইনি সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেটে'র অনুকরণে, অনুবাদে ও অবলম্বনে যে নাটক লেখেন তাহাই 'হরিরাজ'। অনেকে বলেন 'হরিরাজে'র প্রথম খসড়া করেন 'বিশ্বকোষ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ; কিন্তু এখন দেখিতেছি 'হরিরাজ' 'অমর-গ্রন্থাবলী'ভুক্ত হইয়া বসুমতী অফিস হইতে বিক্রীত হইতেছে !

অমরবাবু ক্লাসিকে এই 'হরিরাজ' যখন অভিনয় করেন, তখন ভিক্টোরিয়া ক্লাবের যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের দুই-একজনের নাম মনে আছে। জয়াকর সাজিয়াছিলেন ৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), যঁনি পরে মিনার্ভায় খ্যাতিলাভ করেন ; দধিমুখ ৺ভোলানাথ দাস, শ্রীলেখা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী স্বর্গীয়া ছোটরাণী ইত্যাদি।

নূতন থিয়েটার খুলিয়া অমরবাবুকে প্রথম প্রথম বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল ; তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল 'আলিবাবা' খোলার পর হইতে। ষ্টারে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণবাবুর 'লয়লা-মজনু' এবং মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন' অভিনয়ের পর 'আলিবাবা'র মতন এমন জমাটী অপেরা তখন আর হয় নাই। 'লয়লা-মজনু'র ইবলিসমায় ও মুন্নাবাঁদি, এবং 'আবু হোসেনে'র মসুর ও দাই নূতন বেশ লইয়া 'আলিবাবা'র আবদালা ও মর্জ্জিনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই 'আলি-বাবা'রও প্রথম তিন-চারি রজনীর অভিনয়ে এক শত দেড় শত টাকার বেশী বিক্রয় হয় নাই ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তারপর যত দিন গিয়াছে, ততই 'আলিবাবা'র বিক্রয় বাড়িয়াছে। তখন ৭।৮ শত টাকা বিক্রয় হইলেই 'ফুল হাউস' হইয়াছে

বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, ক্লাসিকের বিক্রয় বার শত আঠার শত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ক্লাসিকের এই বিক্রয়াধিক্যের অন্যবিধ কারণও ছিল। নানা বিশৃঙ্খলায় মিনার্ভা তখন হৃতশ্রী হইয়া আসিতেছিল; বেঙ্গল থিয়েটার বিশেষ আড়ম্বর না-করিয়া সাবেক চাল বজায় রাখিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কাপ্তেনী আক্রমণের পূর্ব্বসূচনায় এই বৃদ্ধ জীর্ণ প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ যেন ক্রমেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। এদিকে প্রবীণ নাট্যনায়ক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার একটি সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছিল। ষ্টারের সব দিকেই ধরা-বাঁধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসিতে হইত যেন ভয়ে ভয়ে—বহুদিনের প্রতিষ্ঠার উত্তাপে ষ্টারের ব্যবহার মাঝে মাঝে দর্শক-বৃন্দকে একটু বিশেষরূপেই অনুভব করিতে হইত। অকুতোসাহস অমরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন; 'আলিবাবা' প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিডন ষ্ট্রীটের দর্শকবৃন্দ বোলচাল কাটিয়া, শিস্ দিয়া, দুই-একটা অসঙ্গত ইয়ার্কি কপ্‌চাইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্ব্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন। থিয়েটার যেন বুরোক্রেসীর রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন। ফলে দাঁড়াইল, ক্লাসিকে যখন "বাদুড় ঝোলে"—ষ্টারের বেঞ্চ তখন শূন্য! ষ্টারের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় 'প্রতাপাদিত্য' খোলার পর। গিরিশচন্দ্রও এ সময় এক থিয়েটারে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি কখনও মিনার্ভায়, কখনও ষ্টারে, কখনও ক্লাসিকে—এইরূপভাবেই দিন কাটাইতেছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে থিয়েটার জগতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহার থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলের মাথায়ও লেখা হইতে লাগিল "হৈ হৈ কাণ্ড—রৈ রৈ ব্যাপার!" ষ্টার থিয়েটারের গাম্ভীর্য্য, মিতব্যয়িতা, সংযম, শৃঙ্খলা, এতদিন বাঙ্গলা থিয়েটার জগতের একটা আদর্শস্বরূপ ছিল, অমরবাবু সে সব উল্টাইয়া দিলেন। অন্য থিয়েটার মহলে অভিনেতা অভিনেত্রী ভাঙ্গাইবার একটা সাড়া পড়িয়া গেল; নিজের দল পুষ্ট করিবার জন্য তিনি দ্বিগুণ, চারিগুণ পর্য্যন্ত মাহিয়ানা দিয়া লোক ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। সাধারণতঃ সে সময় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার বেতনের হার ছিল মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, অপেরা মাষ্টার পাইতেন ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ, ড্যান্‌সিং মাষ্টারের বেতনও তদনুরূপ; খুব বড় অভিনেত্রীর বেতনও ষাট-পঁয়ষট্টির বেশী ছিল না। ইহার পূর্ব্বে স্বর্গীয় গোপাললাল শীল যখন এমারেল্ড থিয়েটার করেন, তখন একবার অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছিলেন,

তবে সে হার অমরবাবুর তুলনায় বড় বেশী ছিল না, আর সে থিয়েটারও স্থায়ী হয় নাই। অমরবাবু এইরূপ উচ্চহারে বেতন তো বাড়াইলেনই, সঙ্গে সঙ্গে বোনাস্ বেনিফিটেরও প্রচলন করিলেন ; হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডের চেহারাও ফিরিল। আগে অতি চোতা কাগজে প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিল বাহির হইত ; অমরবাবু উৎকৃষ্ট কাগজে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফোটো দিয়া সুন্দর সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিল বাহির করিতে লাগিলেন ; হ্যাণ্ডবিল লেখার ভঙ্গীও বদলাইল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সরস ও সংযত ভাষার পরিবর্তে—"হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, নাট্যজগৎ স্তম্ভিত ! নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে মানবজীবন দোদুল্যমান ! সারি সারি সখীর সারি ; নাচে গানে ধূলো পরিমাণ, ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ" ইত্যাদি ঘটোৎকচী ভাষায় বাজার সরগরম হইয়া উঠিল। অমরবাবুর পশার জমিয়া গেল ; তিনি একজন জন-প্রিয় অভিনেতারূপেও খ্যাতি লাভ করিলেন।

বাঙ্গলাদেশে সেকালে কবি, হাফ্-আখড়াই, তরজা প্রভৃতির সমাদর ছিল। ছড়া কাটিয়া, উতর গাহিয়া, সং সাজিয়া, গালাগালি দিয়া আমোদ করিবার রীতি, রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকার পরিবর্ত্তন করিয়া আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনিতাম, কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম আমলে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে ন্যাশানাল থিয়েটারের এইরূপ ছড়া কাটিয়া গালাগালি চলিত। আমরা কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এ সব বড় একটা দেখি নাই ; এই রীতির পুনঃপ্রচলন হইল ক্লাসিকের অভ্যুদয় হইতে ; অমরবাবু থিয়েটার খোলার কিছুদিন পরে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলকে ক্রমশঃ খবরের কাগজে পরিণত করিলেন।

গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভায়, অমরবাবু গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ করিয়া নানারূপ ছড়া কাটিয়া হ্যাণ্ডবিলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন ; উভয় থিয়েটারের তুলনায় ক্লাসিকই যে ভাল, গিরিশবাবুর পরিচালিত মিনার্ভা সে কিছু না, এইরূপ কার্টুনও বাহির হইতে লাগিল। দুই-একটা নমুনা যথা—দাঁড়িপাল্লা আঁকিয়া তাহার একদিকে বসান হইল অমরবাবুকে, অন্যদিকে বসান হইল গিরিশচন্দ্রকে ; অমরবাবুর দিক ভারী হওয়ায় নীচে নামিয়া পড়িল, গিরিশচন্দ্রের দিক হাল্কা হওয়ায় উপরে উঠিয়া গেল। কিংবা কোন চিত্রে হয়তো দড়ি লইয়া টানাটানি হইতেছে, গিরিশচন্দ্রের দল ক্লাসিকের দলকে যেন হটাইতে পারিতেছেন না ! অর্ব্বাচীনের দল এই সমস্ত কার্টুন দেখিয়া এবং ইহার অমার্জ্জনীয় মন্তব্য পড়িয়া বেশ আমোদ উপভোগ করিত সন্দেহ নাই।

[৭]

কিন্তু যাহাই হউক, অমরবাবু দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরবাবু যখন থিয়েটার করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স বোধহয় কুড়ি কিংবা একুশের অধিক নয়। এই অল্প বয়সে, বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন নাট্য-সম্প্রদায়ের নানা কূট চালবাজীর মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া নিজেকে জাহির করা —সাধারণ শক্তির কাজ নহে। বালক অমরেন্দ্রনাথ কোন বাধা-বিঘ্ন ভ্রূক্ষেপ না-করিয়া কেবলমাত্র নিজের সামর্থ্যে ও প্রতিভায় নূতন ও পুরাতনের যুদ্ধে গৌরবের সহিত জয়লাভ করিয়াছিলেন। আর এ জয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তখনকার সময়,—তখনকার সাধারণ দর্শকবৃন্দ। সেই কথাটাই খুলিয়া বলিতেছি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর বাঙ্গলাদেশের থিয়েটার, যাঁহাদের লইয়া প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—তাঁহাদের দ্বারাই নানা রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। এক ন্যাশানাল ও গ্রেট ন্যাশানালের দল ভাঙ্গিয়াই—ষ্টার, এমারেল্ড, সিটী, মিনার্ভা—জন্মগ্রহণ করে। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহাদের পুরাতন চাল মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বদলায় নাই। এ সকল দল ভাঙ্গাভাঙ্গির কথা আমি পরে বলিব। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া থিয়েটারের দর্শকবৃন্দ—সকল নাট্যশালাতেই সেই একই পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিয়া আসিতেছিলেন; নাটক বদলাইতেছিল, কিন্তু নায়ক সেই স্বর্গীয় অমৃতলাল, না-হয় স্বর্গীয় মহেন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে সাজিতেন বটে, কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরের শেষাশেষি কয়েক বৎসর তিনি সাজা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইদানীং প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের চরিত্র ভিন্ন তাঁহাকে মানাইতও না। এমারেল্ড কি ষ্টারে কোন নূতন নাটক বিজ্ঞাপিত হইলেই, লোকে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিত—নায়ক সাজিবেন হয় মহেন্দ্রলাল, না-হয় অমৃতলাল মিত্র। সিটী এবং মিনার্ভায় স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব 'হিরো' সাজিতে শুরু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও পুরাতন দলের সংস্পৃষ্ট ও পুরাতন দলের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া—দর্শক কর্ত্তৃক ঠিক নূতন বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। এই সকল কারণে এবং বাহির হইতে নূতন কোন ক্ষমতাপন্ন অভিনেতাকে মাথা তুলিতে না-দেখিয়া সাধারণ দর্শক একপ্রকার ঠিক করিয়াই লইয়াছিলেন যে, থিয়েটার জিনিষটা যেন একটা বিশেষ দলেরই একচেটিয়া ব্যবসা; বাহির হইতে ইহার দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এদিকে অমৃতলাল ও

মহেন্দ্রলাল—দিন দিন পুরাতন হইয়া আসিতেছিলেন। বয়স তো কাহারও হাত-ধরা নয়! নবীন নায়কের ভূমিকায় ইঁহারা ঠিক আর খাপ খাইতেছিলেন না। সাধারণ দর্শক অপেক্ষা করিতেছিল "নূতনে"র জন্য। ঠিক এই সময়েই অমরবাবু থিয়েটায় খুলিলেন। অমরবাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে। চোর-বাগানের সুবিখ্যাত দত্ত বংশের সহিত আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা নাই, কলিকাতার এমন বড় কায়স্থের ঘর খুব কমই আছে। তারপর, অমরবাবু যখন থিয়েটার করিতে নামিলেন, তখন তাঁহাকে বালক বলিলেও চলে। তিনি সুপুরুষ ছিলেন, সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নূতন থিয়েটারে 'নায়ক' সাজিতে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্বগণ সকলেই একবাক্যে বাহবা দিতে লাগিলেন—যেমন বাহবা ও হাততালি সখের থিয়েটারের অভিনেতারা অনায়াসে পাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রীতি ও স্নেহের আসনে বালক অমরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল। সাধারণ দর্শকদেরও তখন পুরাতনে অরুচি হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারাও মুখ বদলাইতে চাহেন; তাঁহারাও সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সে গ্রহণের অর্থ—"এস নূতন—ন্যাশানাল থিয়েটারের রথী মহারথীগণের পর বহুদিন আর নূতন কাহাকেও দেখি নাই—এস তুমি অভিমন্যু. তোমাকেই আমরা আমাদের রঙ্গ-নায়ক বলিয়া জয়মাল্য পরাইয়া দিই।"

কিন্তু এইটুকু পড়িয়া কেহ যেন মনে না-করেন, অমরবাবুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কেবলমাত্র দর্শকবৃন্দের এই আগ্রহ ও উৎসাহের জন্য। দর্শকবৃন্দের এই আগ্রহ ও উৎসাহ, তাঁহাদের এই প্রীতি ও আদরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্য শক্তিও তাঁহার ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জ্জয় সাহস—উন্নতি করিবার এই সকল সদ্‌গুণ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার অনুসরণ সর্ব্বথা করেন নাই; তখনকার থিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যিনি লিখিবেন তিনি দেখিবেন—বাঙ্গলা নাট্যশালা বাহ্যিক ও আর্থিক সৌষ্ঠব ও উন্নতির জন্য অমরেন্দ্র-নাথের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের নাট্যশালায় যে নূতন জীবন দিয়াছিলেন তাঁহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তিনি যে থিয়েটারী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া যান—তাঁহার জের এখনও চলিতেছে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন বৃদ্ধি, গুণের আদর, রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনে ও হাততালিতে নাম জাহিরের আড়ম্বর—এ সবই

অমরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি। অমরেন্দ্রনাথের নীতিই ছিল—"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।" পুরাতন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উঠিতে হইয়াছিল, এবং সে যুদ্ধে তিনি কখন হারেন নাই। নিজের দলকে পুষ্ট করিবার জন্য তিনি অর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যত টাকা লাগে—"অমুককে"কে চাই-ই চাই। থিয়েটারের বিক্রয় কম হইলে অমরেন্দ্রনাথ অস্থির! যেমন করিয়া হউক বিক্রয় বাড়ান চাই—তা কে জানে চতুঃপ্রহরব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠান—কে জানে উপহার বিতরণ! ইহার জন্য থিয়েটারে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। নূতন নাটক যখন তিনি খুলিয়াছেন, তখন মুক্তহস্তে খরচ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—প্রতিযোগিতায় কেহ তাঁহাকে হটাইতে না-পারে! মুদির হিসাব-নিকাশী বুদ্ধি লইয়া তিনি একদিনও থিয়েটার করেন নাই। তিনি মেজাজী বড়লোকের মত থিয়েটার করিয়াছেন। আর এইজন্যই তাঁহাকে সময় সময় মাসুলও দিতে হইয়াছে—যথেষ্ট! কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? অর্থের অনটন—দলের লোকের শত্রুতা—পুস্তকের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে কোনদিনই বিচলিত করিতে পারে নাই। প্রায় আট-দশ বৎসর খুব জোরের সহিতই তিনি ক্লাসিক থিয়েটার চালাইয়াছিলেন। নিজের শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাঁহার থিয়েটারে তিনি যে নিয়ম চালাইয়াছেন তাহাই চলিয়াছে। বেলা দুইটায় থিয়েটার—তাহাতেও ক্লাসিকে অসম্ভব ভিড়! বেলা বারোটায় থিয়েটার—তাহাতেও অসংখ্য দর্শক! একবার অতি বর্ষায় কলিকাতা ভাসিয়া গিয়াছিল; হাট বাজার, অন্য থিয়েটার সব বন্ধ, কিন্তু ক্লাসিক খোলা; টিনের ছাদ দিয়া জল পড়িতেছে, বসিবার স্থানে এক হাঁটু জল, তখনও দেখি ক্লাসিকের দর্শক ছাতি মাথায় দিয়া বেঞ্চ ও চেয়ারে পা তুলিয়া বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে। সে সময়ের দর্শক যেন অমরেন্দ্রনাথের নামে মাতিয়া উঠিতেন। দর্শকবৃন্দের এই ভালবাসাকে লক্ষ করিয়াই—ক্লাসিক হইতে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে যাইবার সময় অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস, আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি, সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।" সাধারণের সহিত সহানুভূতি স্থাপন ও যোগ রাখিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় কাগজ বাহির করেন। তাঁহার 'রঙ্গালয়', তাঁহার 'নাট্যমন্দির', তাঁহার নাট্যপ্রতিভা ও নাট্যানুরাগের নিদর্শন।

আমার বোধহয় বাঙ্গলায় রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রচার এই প্রথম! আজ যে বঙ্গ ও ইঙ্গ প্রায় সমস্ত কাগজেই থিয়েটারী

আলোচনা ও গালাগালির দুর্গন্ধময় ফোড়নের বাহুল্য হইয়াছে, তাহার প্রথম পথপ্রদর্শকও অমরেন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম 'দলে'র কাগজ বাহির করেন। আজ বাঙ্গলায়ও দলের কাগজের অভাব নাই। অমরেন্দ্রনাথের প্রকাশিত 'রঙ্গালয়ে'র সম্পাদক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নাট্য-মন্দিরে'র সম্পাদক তিনি নিজেই হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই কাগজের নিয়মিত লেখক ছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র, স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল, রসরাজ অমৃতলাল, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যবাণীর একনিষ্ঠ পূজারী ও শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণ। অনধিকারীর কলমের তাড়নায় তখন নাট্যবাণীকে অস্থির হইতে হয় নাই। লোকে এই সকল কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া শিক্ষার সহিত আনন্দ লাভ করিত। তবে দলের কাগজ বলিয়া আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদও যে ইহাতে থাকিত না, তাহাও নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের ব্যবসায়ের দিকটার ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অভিনয় বা নাটকের ধারা বদলাইয়া উহার নব কলেবর কিছু দিতে পারেন নাই। তখনকার প্রচলিত অভিনয়পদ্ধতিকেই তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার থিয়েটারে, এক গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'মনের মতন' নাটক ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয় নাই বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। বরং ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ গীতিনাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার একটা নূতন রূপ তিনি দিয়াছিলেন। নৃত্যে নূতন ভঙ্গীর প্রচলন ও প্রবর্ত্তন তাঁহার থিয়েটারেই হয়; ক্লাসিকের নাচ গান তখনকার দর্শকের খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। অধিকাংশ সময়েই তিনি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সে পুনরভিনয়ে অনেক সময়ে কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়াছেন, কিন্তু সেও ঐ পুরাতন পন্থার অনুসরণে। "একটা নূতন কিছু কর" করিতে গিয়া, আর্টের দোহাই দিয়া পুরুষ চরিত্রের "কটীতটে চন্দ্রহার ও নারীচরিত্রে পুরুষোচিত লম্বা কোঁচা ও কাছা"র প্রচলন তিনি করেন নাই। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর প্রদর্শিত অভিনয়ধারাকেই অবলম্বন করিয়া তিনি অভিনয়ে রস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা অনেক সময়েই ফলবতী হইয়াছে। বহু নাটকের বহু ভূমিকা তিনি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গলা নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস বা অমরবাবুর জীবনী লিখিবেন, তাঁহাদের উপরই ইহার বিস্তৃত আলোচনার ভার দিয়া আমাদের যেটুকু বক্তব্য, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

এমারেল্ড ষ্টেজে ক্লাসিক প্রায় দশ বৎসরকাল বেশ প্রতিপত্তির সহিতই চলিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশচন্দ্র এই সময় কোনও থিয়েটারেই স্থায়ীভাবে টি'কিতে পারেন নাই। অনেকে দোষ দেন,—অন্ততঃ গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি—"গিরিশবাবুর বড় দোষ, তিনি একস্থানে অধিক দিন কাজ করিতে পারেন না।" কিন্তু "কেন পারেন না" সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বিশেষ কিছু বলিতে শুনি নাই। অত বড় একটা প্রতিভা কেন যে একস্থানে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই, আমরা যেভাবে তাহা দেখিয়াছি এবং গিরিশ চন্দ্রের মুখেও সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিব। এই প্রসঙ্গে ইহাও সহজে বুঝা যাইবে যে, গিরিশচন্দ্রের নূতন নূতন থিয়েটার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়কলা কীরূপভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে, এবং তদানীন্তন থিয়েটারগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল। তবে সত্য যদি স্থানে স্থানে অপ্রিয় হইয়া পড়ে—নাচা'র।

[৮]

বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের সৃষ্টি হয় সান্ন্যাল বাড়ীর ন্যাশানালের ভাঙ্গা দল লইয়া। সান্ন্যাল বাড়ীর দল প্রথমে গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে 'নীলদর্পণ' নাটক লইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হন। এই দলের প্রধান উদ্যোগী ও অন্যতম শিক্ষক ছিলেন আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর। এতদ্ভিন্ন রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, কিরণচন্দ্র বন্দ্যো, রাধামাধব কর, রাধাগোবিন্দ কর (সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, কার্মাইকেল মেডিকেল হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা), সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি মহারথীগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সকল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় কি সাত বৎসর বাঙ্গলা থিয়েটারের একটা ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলার দিন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে কী করিয়া থিয়েটার গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহিরে হইলেও প্রত্যক্ষবাদীদের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহারই আভাস দিতেছি মাত্র। ইহাতে পাঠক, বাঙ্গলা থিয়েটারের বর্ত্তমান যুগের সহিত অতীত যুগের থিয়েটারের রূপ ও অ-রূপ দুই-ই মিলাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গির প্রসঙ্গ আমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা বুঝাও সহজ হইয়া পড়িবে। বিষয়টী নীরস হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় কটুরসাত্মক হইবে না!

বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর স্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলা হয়। এই সময়ে থিয়েটারের সহিত গিরিশবাবুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না-থাকিলেও পরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। কারণ এই থিয়েটার খোলার পরেই আমরা দেখি, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'মৃণালিনী' গ্রেট ন্যাশানালে অভিনীত হইয়াছে এবং তাহাতে গিরিশবাবু পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। ইহার কয়েক মাস পরেই আবার গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রেট ন্যাশানালে অভিনীত হয়। এখনও গ্রেট ন্যাশানালে অভিনেত্রী লওয়া হয় নাই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাশানালে প্রথম অভিনেত্রী লওয়া হয় এবং অভিনেত্রী লইয়া প্রথম 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হয়। ভুবনবাবু ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়েটার অপরকে ভাড়া দেন।

ইহার পর হইতেই কয় বৎসর গ্রেট ন্যাশানালে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর অধীনে অধ্যক্ষ কখনও ৺ধর্ম্মদাস সুর, কখনও ৺অবিনাশচন্দ্র কর, কখনও-বা ৺নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺কেদারনাথ চৌধুরীও ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও এই বিশৃঙ্খলার সময়েই একবার ম্যানেজার হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের পরিচালনেও কিছুদিন গ্রেট ন্যাশানাল চলিয়াছিল। এই সময়ে ক্রমাগত লেসীও বদলাইয়াছে, অধ্যক্ষও বদলাইয়াছে। গিরিশবাবুও এ সময়ে ঠিক থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহিরে বাহিরেই ছিলেন, প্রয়োজন হইলে দলের লোকেরা সময় সময় তাঁহাকে ধরিয়া আনিত, তাহার উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিত। তবে এই সময়ের শেষাশেষি তিনি গ্রেট ন্যাশানাল ভাড়া লইয়া নিজে কিছুদিনের জন্য স্বত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়ে গিরিশবাবুর অসাধারণ অভিনয়খ্যাতি ভিন্ন অন্য প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। কাজেই এ সময়ে আমরা গিরিশবাবুকে ঠিক রঙ্গালয়ের কর্ণধাররূপে দেখিতে পাই না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও স্থায়ীভাবে এ সময়ে থিয়েটারে ছিলেন না; মাঝে মাঝে আসিতেন, শিখাইতেন, সাজিতেন, আবার পলাইতেন। নাটকের অভাব, সুপরিচালনের অভাব, অর্থের অভাব, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব —থিয়েটারকে যেন একটা বিভীষিকার স্থল করিয়া তুলিয়াছিল; অথচ পাঠক দেখিবেন, এ সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতার আদৌ অভাব ছিল না।

থিয়েটারের ভিতর ও বাহিরের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় নানা হাত ঘুরিয়া গ্রেট ন্যাশানাল মাড়বারী ব্যবসাদারের হাতে গিয়া পড়িল। ৺প্রতাপচন্দ্র

জহুরী ইহার স্বত্বাধিকারী হইলেন। গিরিশচন্দ্র এ সময়ে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদাগরী আফিসে চাকরী করিতেন। মাড়বারী ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়া থিয়েটার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র আফিসের চাকরী ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমীভাবে যোগ দিলেন। সে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহরীর থিয়েটার হইতেই আরম্ভ হইল। এই থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক বাহির হইল 'রাবণবধ'। ইহার পর হইতেই বাঙ্গলা থিয়েটারের একটা স্থায়ী রূপ আমরা দেখিতে পাই। এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট তাহার ক্ষীণ কায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। আজ দীনবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইয়া, কায়ক্লেশে যেন থিয়েটারের মর্য্যাদা রাখিতেছিল। তারপর, দুর্ভিক্ষের সময় যেমন অন্নের বিচার থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার-তার ছাই-পাঁশ রাবিস, যাহার প্রচলন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তখন লিখিয়াছিলেন "ইহা না-টক, না-মিষ্টি"—এইরূপ নাটক অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র অভিনয়প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল! যে অমৃত পানে বাঙ্গলায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গলা নাট্য-শালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।

কয়েক বৎসর সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত থিয়েটার চালাইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহরীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশানালের সংস্রব ত্যাগ করিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (কাপ্তেন বেল)

এবং বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এবং ৺দাসুচরণ নিয়োগীও গিরিশবাবুর সঙ্গে চলিয়া আসেন।

গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন। থিয়েটার যে লাভজনক ব্যবসায়, মাড়বারী প্রতাপ জহুরী তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই মাড়বারী সম্প্রদায় হইতেই গুর্ম্মুখ রায় নূতন একটী থিয়েটার খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, ফলে, এখন যেখানে মনোমোহন থিয়েটার, ঐ স্থানে গুর্ম্মুখ রায়ের স্বত্বাধিকারিত্বে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় দেখা দিলেন। এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার আচার্য্য গিরিশচন্দ্র এবং উত্তরসাধক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও সুকণ্ঠ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। সে ১৮৮৪ সালের কথা। ষ্টারের প্রথম নাটক গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ'।

কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুর্ম্মুখ রায় ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার অভিভাবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই থিয়েটার কিনিলেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু, ৺দাসুচরণ নিয়োগী ও ৺অমৃতলাল মিত্র। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ইহার অন্যতম অংশী হইতে পারিতেন, কিন্তু একবার নিজে থিয়েটার খুলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, ব্যবসায় করিতে গেলে নাটক লেখার ব্যাঘাত হইবে, তাই তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয়কে স্বত্বাধিকারী করিয়া নিজে তাঁহাদের চাকুরী গ্রহণ করিলেন। ইং ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায় খুব জোরের সহিত ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন।

কলিকাতার শীলবংশীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ৺গোপাললাল শীলের এই সময় থিয়েটার করিবার সখ হয়। ষ্টার থিয়েটারের প্রতিপত্তি এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তিনি স্থির করেন, এই রঙ্গালয় কিনিয়া এই সম্প্রদায়কে ভাঙ্গাইয়া লইয়া তিনি থিয়েটার করিবেন। গোপালবাবুর অগাধ পয়সা, তিনি ইচ্ছা করিলে ষ্টার থিয়েটারের মত চারিটা থিয়েটার বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারিতেন, কিন্তু হইলে কি হয়? তিনি সরাসরি ষ্টার থিয়েটার কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। কাপ্তেনী থিয়েটারের পরিণাম কী, তাহা গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন থিয়েটার যদি একজন খেয়ালী বড়লোকের হাতে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতিত্ব কর্তৃত্ব কিছুই থাকিবে না, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার পরিপুষ্টি বা উন্নতিও ব্যাহত হইবে। কিন্তু গোপালবাবুর মতের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম-ভীতি এবং তাঁহার অর্থের প্রলোভন এই সম্প্রদায়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। গিরিশচন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষে পরামর্শ স্থির হইল, থিয়েটার বাড়ী গোপালবাবুকে বিক্রয় করা হউক; কিন্তু ষ্টারের নাম (গুড্‌উইল)

কখনও হাতছাড়া করা হইবে না। যে অর্থ ষ্টার রঙ্গমঞ্চ বেচিয়া পাওয়া যাইবে, তাহা অবলম্বনে সহরের অন্যত্র নূতন করিয়া ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং সে সম্প্রদায়ের কর্ণধার গিরিশচন্দ্রই থাকিবেন। গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে এবং ভরসায় এই চারিজন অভিনেতা সেদিন যে লোভ সম্বরণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার নাট্যশালার ইতিহাসে তাহা অনন্যসাধারণ; তাঁহারা যদি অর্থের স্রোতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গলার নাটক ও নাট্য-শালার যে কী অবস্থা হইত তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না।

গোপালবাবু ষ্টারের নাম বদলাইয়া এমারেল্ড থিয়েটার নাম রাখিলেন। অমৃত-লাল প্রভৃতি হাতীবাগানে জায়গা কিনিয়া পুনরায় ষ্টারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইঁহাদের সম্প্রদায় এবং গিরিশচন্দ্র তখন নেপথ্যে; যে রাত্রিতে ষ্টার সম্প্রদায় বিডন ষ্ট্রীট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সে রাত্রের দর্শকবৃন্দ ষ্টার সম্প্রদায়ের প্রতি সহানু-ভূতির যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেও মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ষ্টারের সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী একটা গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। অভিনেতৃ সম্প্রদায় কাঁদিয়া আকুল, দর্শকবৃন্দও চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই!

[৯]

পরিচিত প্রিয় বিদায় লইতেছেন, আবার তাঁহাদিগকে একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে কিনা, 'চৈতন্য', 'বুদ্ধ', 'নলদময়ন্তী', 'বিল্বমঙ্গলে'র ন্যায় নাটক আর হইবে কিনা, সহৃদয় দর্শকবৃন্দ সেই চিন্তায় ম্রিয়মান; সম্প্রদায়ও আর ইটের পর ইট গাঁথিয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারিবেন কিনা, অতঃপর কোথায় কেমনভাবে দিন কাটিবে, এতদিনের সাধনার কী পরিণতি কে জানে, জীবনের সাধ আর কখনও পূর্ণ হইবে কিনা—এই চিন্তায় আত্মহারা, শোকাচ্ছন্ন; এদিনের বিদায়দৃশ্যে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এমারেল্ড থিয়েটারের প্রথম নাটক 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন'। এমারেল্ডের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ইহার প্রণেতা। দ্বিধা-বিভক্ত ন্যাশানালের প্রতিপক্ষ দল—অর্দ্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্র বসু, মতি সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতিকে লইয়াই এমারেল্ড থিয়েটারের সৃষ্টি। গোপালবাবু দেখিলেন—থিয়েটার হইল বটে কিন্তু ষ্টারের মত তেমন জমিল না, গিরিশচন্দ্রের অভাবে শিবহীন যজ্ঞের মত যেন কেমন অপূর্ণ রহিয়া গেল; তিনি তখন ষ্টার সম্প্রদায়কে—বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রকে

ভাঙ্গাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই ষ্টার সম্প্রদায় নূতন বাড়ী তৈয়ারীর উদ্যোগ করিতেছিলেন। কথা ছিল গিরিশচন্দ্র তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবেন না ; এখন গিরিশচন্দ্রকে তাঁহারা ত্যাগ করেন কিরূপে আর গিরিশচন্দ্রই বা ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া যান কোন্ হিসাবে ? ষ্টারের সে সময়ে টাকার খুব টানাটানি, এদিকে গোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস্ দিতে চাহিলেন। গিরিশচন্দ্র হিসাব স্থির করিলেন। দেখিলেন, ষ্টারের অর্থসমস্যা পূরণের মহা সুযোগ সম্মুখে। তিনি পরামর্শ করিলেন, গোপালবাবুর থিয়েটারেই যোগদান করিবেন, এবং ঐ বিশ হাজার টাকা হইতে ষোল হাজার টাকা ষ্টারকে বিনা শর্ত্তে দান করিবেন। ষ্টারের স্বত্বাধিকারীগণ ইহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে নাটক লিখিবে কে ? তখনও অমৃতলালের নাট্যকার বলিয়া তেমন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সবে তাঁহার 'বিবাহ বিভ্রাট' ও এক-আধখানি ছোটখাট অপেরা ও প্রহসন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এ সমস্যারও সমাধান করিলেন। স্থির হইল, ষ্টারের প্রথম নাটক গিরিশ-চন্দ্রই লিখিয়া দিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নাম থাকিবে না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার গিরিশচন্দ্রের যে নাটক লইয়া দর্শকবৃন্দকে প্রথম অভিবাদন করেন, তাহার নাম 'নসীরাম'। উহা সেবক প্রণীত এবং অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া তখন বিজ্ঞাপিত হইত।

এই শর্ত্তে এই বন্দোবস্তে ষ্টার ত্যাগ করিয়া গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডের অধ্যক্ষ হইয়া দেখা দিলেন এবং বোনাসের কুড়ি হাজারের ষোল হাজার টাকা ষ্টারকে দিলেন। পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট করিয়া গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে আসেন ; কিন্তু পাঁচ বৎসর তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হয় নাই। খেয়ালী বড়লোকের থিয়েটার, কিছুকাল সখ মিটিবার পরই উহা হস্তান্তরিত হইল ; এমারেল্ড সম্প্রদায়ভুক্ত মহেন্দ্র বসু ও নাট্যকার অতুল মিত্র ঐ থিয়েটার ভাড়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেণ্টও বাতিল হইয়া গেল ; পুনরায় তিনি ষ্টারে আসিয়া যোগদান করিলেন। এবার ষ্টারে আসিয়া তিনি বই দিলেন 'প্রফুল্ল'। এমারেল্ড ত্যাগ করিলে—কী ভাষা ঠিক মনে নাই, এইভাবে কোন সংবাদপত্রে তখন লিখিত হইয়াছিল, "গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে উদয় হইলেন 'পূর্ণচন্দ্র'রূপে ; যখন ত্যাগ করিলেন এমারেল্ড 'বিষাদে' আচ্ছন্ন হইল ; কিন্তু নিজের গঠিত ষ্টার সম্প্রদায়ে আসিয়া তাঁহার এই বিষাদভাব কাটিল, লোকে তাঁহার 'প্রফুল্ল' মূর্ত্তি দেখিল।" বলা বাহুল্য, এমারেল্ডে গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'পূর্ণচন্দ্র', শেষ নাটক 'বিষাদ'।

গিরিশচন্দ্র ষ্টারে ফিরিয়া দেখিলেন, যে ষ্টার তিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন সে ষ্টার আর নাই; ষ্টার এখন স্বাবলম্বন শিখিয়াছে; গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া যে থিয়েটার চলিতে পারে, 'সরলা', 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রভৃতি খুলিয়া ষ্টার তাহা বুঝিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ষ্টারের অধ্যক্ষ ছিলেন অমৃতলাল বসু; গিরিশচন্দ্র আসিয়া পুনরায় অধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্তু নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মত-বিরোধ ঘটিতে লাগিল। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে লেখে, পুত্র বড় হইলে তাহার সঙ্গেই তো মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে হয়; সুতরাং শিষ্য বড় হইলে বা মনিব হইলে চাণক্য-নীতি কীরূপ হওয়া উচিত, গিরিশচন্দ্র তাহা অত্যধিক শিষ্যস্নেহের মোহে বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও তো বদলায়! পূর্ব্বকার মত গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব ষ্টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না; যে গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়া একদিন ষ্টারের জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বৎসরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা ষ্টারকে দিয়াছিলেন, ষ্টার থিয়েটার সেই গিরিশচন্দ্রকেই বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন। গিরিশচন্দ্র এই বরখাস্তপত্র পাইবার পূর্ব্বে ষ্টারের জন্য 'আবু হোসেন' ও 'মুকুল মুঞ্জরা' এই দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণ (গিরিশচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছি) এই দুইখানি বই পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।" অথচ অনেকেই জানেন, ঐ আড়াই ঘণ্টার অপেরা 'আবু হোসেন' খুলিয়া মিনার্ভা এক সময় লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল।

ষ্টারে গিরিশবাবুর চাকরী গেল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের দলও ভাঙ্গিল। থিয়েটারে চাকুরী ঠিক আফিসের চাকুরী নয়। পাটের বা ভূষিমালের হিসাবে থিয়েটার চলে না; এ রসের কারবার; অভিনেতা অভিনেত্রীরা স্বভাবতঃ একটু রসস্থ হইয়াই এ ব্যবসায়ে যোগ দেন। অভিমান কথায় কথায়, টুসকির ভর সয় না; বেয়াড়া কড়া আইন বা মনিবালি অভিনেতৃদের ধাতে সব সময় খাপ খায় না। এই খাপ খায় না বলিয়াই প্রতাপ জহুরীর দল ভাঙ্গিয়াছিল; শুর্ম্মুখ রায়ের মৃত্যুর পর অভিনেতার দল লইয়াই ষ্টারের গঠন। চারিজন অভিনেতা ষ্টারের স্বত্বাধিকারী হইলেন; অভিনেতৃ সম্প্রদায় বুঝিলেন এবারে আর তাঁহাদিগকে ঠিক মনিবের চাকরী করিতে হইবে না। দলে সাম্য মৈত্র এবং কাজে কাজেই ও শান্তি চিরদিনই বিরাজ করিবে। কিন্তু রাম উল্টা বুঝিলেন। থিয়েটার সেই আফিসেরই প্রতিরূপ হইয়া উঠিল। সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অনেকগুলি অভিনেতা অভিনেত্রী গিরিশবাবুর অবর্ত্তমানে ষ্টারে টিঁকিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। ইনি মনে মনে ৺অমৃতলাল মিত্রের উপর একটু ঈর্ষ্যা পোষণ করিতেন। ষ্টারে 'হারানিধি' খোলার সময় হরিশের ভূমিকার জন্ম ইনি গিরিশবাবুকে আবেদন করেন; কিন্তু অমৃত মিত্রকে বাদ দিয়া তো নীলমাধববাবুকে আর পার্ট দেওয়া যায় না! কাজেই নীলমাধববাবু মনের দুঃখ মনে রাখিয়াই ষ্টারে কাজ করিতেছিলেন। গিরিশবাবু ষ্টার থিয়েটার হইতে চলিয়া আসিলে ইনি ভিতরে ভিতরে একটা দল পাকাইলেন। এই দলে প্রায় এগারজন অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ষ্টারে যোগদান করিয়াছিলেন। নীলমাধববাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অঘোর পাঠক, দানীবাবু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হঠাৎ ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। 'সীতার বনবাস' অভিনয় হইবে, যবনিকা তুলিবার আগে দেখা গেল এগারজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাই! শুনিয়াছি এই রাত্রে লোকাভাবে ষ্টারের স্বযোগ্য ষ্টেজ ম্যানেজার ৺দাস্থচরণ নিয়োগীকে শক্রঘ্নের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নীলমাধববাবু যে দল লইয়া বাহির হইলেন তাহার নাম হইল সিটী থিয়েটার। ছোট ষ্টেজ বীণা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ইঁহারা থিয়েটার খুলিলেন; গিরিশবাবু নেপথ্যে থাকিয়াই ইঁহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কাগজে কলমে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইল না। না-হইবার একটা কারণ ছিল। ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত তাহার একটী এগ্রিমেণ্ট হয়। তাহাতে এই শর্ত্ত ছিল, গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়া যদি ষ্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন, তাহাকে ৫০০০৲ টাকা দিতে হইবে; আর ষ্টার থিয়েটার যদি তাঁহাকে ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ষ্টারের পক্ষ হইতে মাসিক এক শত টাকা দিতে হইবে। বীণা ষ্টেজে স্থান সংকুলান হয় না, এদিকে ষ্টারের ব্যবহারে মর্ম্মাহত গিরিশচন্দ্রের মাসে মাত্র এক শত টাকা লইয়া বাড়ী বসিয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল; স্থতরাং তিনি একটী নূতন থিয়েটার গঠনের সংকল্প করিলেন। মিনার্ভার সৃষ্টির ইহাই কারণ।

বহু পূর্ব্বে যেখানে গ্রেট ন্যাশানাল খোলা হয়, সেইখানেই নূতন থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হইল; স্বত্বাধিকারী হইলেন পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের দৌহিত্র ৺নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। সিটী থিয়েটার লইয়াই প্রথম মিনার্ভার উদ্বোধন; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিনার্ভার বাড়ী উঠিতে উঠিতেই অনেকেই মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। একজন স্বত্বাধিকারীর অধীনে চাকুরী করিব না, ইহাই সিটীর দলের কর্ত্তা নীলমাধববাবুর অভিমত, গিরিশচন্দ্রের সহিত সিটী

সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যের অন্যতম কারণও ইহাই। এই সিটী সম্প্রদায়কেও তিনি এক সময় অর্থসাহায্যে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রায় নয় মাস রিহার্স্যাল দিয়া গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় প্রথম নাটক খুলিলেন 'ম্যাকবেথ'। 'ম্যাকবেথে'র অভিনয় বাঙ্গলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই 'ম্যাকবেথ'কে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন; এই ধারা পরিবর্ত্তনে তাঁহার একমাত্র সহযোগী ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। 'ম্যাকবেথ', 'মুকুল মুঞ্জরা', 'আবু হোসেন', 'জনা', 'করমেতি বাঈ' রঙ্গালয়ে এক নবযুগ আনিয়াছিল। ন্যাশানাল ও ষ্টার থিয়েটারের পরে বাঙ্গলা নাট্যশালায় আর নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীর সৃষ্টি হয় নাই; গিরিশচন্দ্র এবার শুধু নূতন থিয়েটার খুলিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্ম্মীদলেরও সৃষ্টি করিলেন। এই যে অভিনেতৃ তৈয়ারীর ক্ষমতা,—ইহা গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর যেমন ছিল, বাঙ্গলায় আর কাহারও তেমনটী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ে যে নূতন দল তৈয়ারী হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব, ৺কুমুদ সরকার, ৺তিনকড়ি দাসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী কুসুমকুমারী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু, ৺রাণুবাবু এই মিনার্ভা হইতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী নবগঠিত সম্প্রদায়ের অপেরা মাষ্টাররূপে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। অভিনেতৃ সৃষ্টি প্রসঙ্গে এখানে আর একজনের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়; তিনি ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺অমৃতলাল মিত্র। দানীবাবু প্রথম নটজীবনে ইঁহারই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; এই অমৃত-লালেরই প্রিয় শিষ্যা, বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরব, প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

নাগেন্দ্রবাবু কিছুকাল থিয়েটার করার পরে জাল গুটাইলেন। তাঁহার থিয়েটার খুব ভালই চলিয়াছিল, কিন্তু থিয়েটারের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি হিসাব ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার তহবিল হইতে দুই মুঠা টাকা লওয়ার গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ত্যাগ করিলেন।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের সাফল্য দেখিয়া ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে পুনরায় মাল্যচন্দন দিয়া লইয়া আসিলেন। এবার ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের প্রথম বই 'কালা-পাহাড়'। ষ্টারের তখনকার নাট্যকার কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের পরলোকগমনে—তাঁহাদের নাট্যকারেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয়বারও তিনি ষ্টারে স্থায়ী হইতে পারিলেন না। মন কাঁচের বাসন, একবার ভাঙ্গিলে আর যোড়া

লাগে না। ষ্টার হইতে প্রথমে তিনি ক্লাসিকে আইসেন। পরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা কিনিয়া তাঁহাকে লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। সে দলও কিছুকাল পরে উঠিয়া গেল, গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা হইতে পুনরায় অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিকে গিয়া যোগদান করিলেন। এই সময়েই তাঁহার 'আয়না', অভিশাপ', 'নাটকাকারে কপালকুণ্ডলা', 'মনের মতন', 'সৎনাম', 'ভ্রান্তি', 'পাণ্ডবগৌরব' বই রচিত হয়।

অমরবাবু ক্লাসিকে এত বড় বড় অভিনেতৃর সমাবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিপত্তি এখন এত অধিক হইয়াছিল যে তিনি থিয়েটারের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার সংকল্প করেন। বহু স্বত্বাধিকারী পরিবর্ত্তনের পর মিনার্ভার তখন গঙ্গাযাত্রার অবস্থা ; অমরবাবু এই সুযোগে মিনার্ভার বাড়ী ভাড়া লইলেন। থিয়েটার করিয়া অমরবাবুর উপার্জ্জনের যেমন সংখ্যা হয় না, ব্যয়েরও তেমনি সংখ্যা হয় না। খুব বিক্রী, নিত্য ফুল হাউস, অথচ টাকার টানাটানি ! তিনি মিনার্ভা লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে অমরবাবুকে কিছু টাকা ধার দেন, অমরবাবু সব টাকা পরিশোধ করিতে না-পারিয়া মিনার্ভার 'লিজ' মনমোহনবাবুর নামে লিখিয়া দেন। এ ১৯০৩ সালের কথা। মনোমোহনবাবু শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার খুলেন। মিনার্ভার এই নবগঠনের মূলে আর একজন নবীন কর্ম্মী ছিলেন, যাঁহার নাম না-করিলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইনি হাইকোর্টের একজন উকীল, পরলোকগত মহেন্দ্রকুমার মিত্র। মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু এবং থিয়েটার করিবার একজন প্রধান সহায়।

[১০]

যেদিন বীণা রঙ্গমঞ্চ হইতে তাড়া খাইয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া পালাই, তাহার পর প্রায় দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর আখড়ার পর আখড়া করিয়া মহলাই দিয়াছি এবং কখনও কখনও সখে কোথাও থিয়েটার করিয়াছি, কিন্তু প্রকাশ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের খাতায় নাম লিখাইবার সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। যখনই দল করিয়াছি, আখড়া বসাইয়াছি, মনোমোহনবাবু পৃষ্ঠপোষক ও সহায় হইয়াছেন ; কিন্তু কার্য্যসূত্রে এই দশ বৎসরের শেষভাগে আমরা বাল্য-সুহৃদ মনোমোহনের সঙ্গ হারাইয়া ফেলি। মনোমোহনবাবু তখন বড় কণ্ট্রাক্টর, আর আমার সেই বকেয়া "ভ্যাগাবণ্ড" ! স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর সিটী উঠিয়া গিয়াছিল পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার থিয়েটারের জের তখনও মিটে নাই ; তিনি পূজা-পার্ব্বণে দল বসাইয়া

মাঝে মাঝে সহর ও মফঃস্বলে অভিনয় করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেন; আমরাও নীলমাধববাবুর সঙ্গে মিশিয়া সময় সময় তাঁহার সেই ভাঙ্গা সিটীর দলে দুই-চারিবার বিদেশে অভিনয় করিয়া ঘোল খাইয়া আসিয়াছি। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্বান্ চরিত্রবান্ সাধুকল্প ৺দেবেন্দ্রনাথ রায় ইলিসিয়াম থিয়েটার নাম দিয়া একটী সখের থিয়েটার করেন। ৺পূজার সময় এই দল নড়াইলে গিয়া অভিনয় করিত। সে সময়ে সখের থিয়েটারের মধ্যে এই ইলিসিয়াম থিয়েটারের সুনাম ছিল। প্রধানতঃ পাবলিক থিয়েটারের নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়াই এই দলের সৃষ্টি ও পুষ্টি। এই ইলিসিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। থিয়েটার উপলক্ষ্যে বহুবারই আমরা নড়াইলে গিয়াছি, এবং বাঙ্গলার এই প্রাচীন বনিয়াদি জমিদার বংশের অমায়িক ও উদার ব্যবহার এখনও গল্প-কথার মত আমাদের সন্তপ্ত চিত্তে যে সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দেয় তাহা নিতান্তই সু-দুর্লভ। থিয়েটার করিতে গিয়া নানা বেয়াড়া বদ্ সঙ্গে মিশিয়া যদি কখনও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, তাহা এই নড়াইলের ইলিসিয়াম থিয়েটারে করিয়াছি। নাট্যানুরাগ এই জমিদার বংশের যেন একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কেবল প্রভূত অর্থ নয়—বিত্ত ও চিত্ত দিয়া এই অবৈতনিক থিয়েটারটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর আবার নাটক লিখিবার সখ ও ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত দুই-তিনখানি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছি। অল্প বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি নাটক লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সু-যশ অর্জ্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার সেই অল্প বয়সের লিখিত নাটক—এখনকার অনেক 'বিশেষজ্ঞে'র লিখিত নাটক অপেক্ষা অনেক ভাল। স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পুত্র সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু এই ইলিসিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং শিক্ষক ছিলেন আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর। নীলমাধববাবুও এই সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া কোন কোন বার অভিনয় করতেন। মনোমোহনবাবু যখন মিনার্ভায় যোগ দেন, তখন আমি ইলিসিয়াম থিয়েটারে। এই ইলিসিয়াম সম্পর্কেই আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগ লাভ করি; বোধহয় ১৯০৫ সাল, শ্রাবণ মাসে, নড়াইলে 'চন্দ্রশেখর' হইবে; চন্দ্রশেখরের ভূমিকা রিহার্সাল দিই। বহুদিনের পোষিত আশা—অর্দ্ধেন্দুশেখরের যত্নে ও শিক্ষকতায় এক নূতন উত্তেজনা আনিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন ষ্টারে। সমস্ত দিন ইলিসিয়ামে শিক্ষা দিয়া রাত্রে তিনি ষ্টারে যাইতেন, আমরাও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া সারাদিন তাঁহার

নিকট পড়িয়া থাকিতাম ; তিনি সমান যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলকে নানা ভূমিকা শিখাইতেন। ইলিসিয়ামে সেবার 'কপালকুণ্ডলা'রও রিহার্স্যাল চলিতেছে, আমি নবকুমার। বহুকাল পরে এমনি সময়ে একদিন সকালবেলায় মনোমোহনবাবু আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথম স্বাগত আলাপ আপ্যায়নের পরে মনোমোহনবাবু বলিলেন, "এতদিনের আশা ও চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে ; তোমাদের জন্যই আমি থিয়েটার লইয়াছি ; মিনার্ভা এখন আমার কর্তৃত্বাধীনে, চল তোমাদের সব দেখিতে শুনিতে হইবে।"

ইতিপূর্ব্বে কানাঘুষায় এইরকমই কিছু শুনিয়াছিলাম, মনোমোহনবাবু কণ্ট্রাক্টারী করিতে করিতে থিয়েটারের সহিত মিশিয়াছেন। ইতিহাসটী এইরূপ।

অমরবাবু ক্লাসিক থিয়েটার বাঁধা দিয়া মনোমোহনবাবুর নিকট হইতে বার হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন। কথা ছিল প্রতি সপ্তাহে আড়াই শত টাকা করিয়া দেনা উসুল হইবে ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে অমরবাবু থিয়েটারে জুড়ি চালাইতে আরম্ভ করেন ; অর্থাৎ তাঁহার ক্লাসিক তো চলিতেছিল, 'অধিকন্তু ন দোষায়' হিসাবে তিনি মিনার্ভাও ভাড়া লইয়া—উহারও স্বত্বাধিকারী হইয়া বসিলেন ; কিন্তু 'সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং' এই সাধু নীতির প্রকোপে তাঁহার এই দুই নৌকায় পা সহিল না। ক্ষীরোদবাবুর 'রঘুবীর' নাটক লইয়া তিনি মিনার্ভা খুলেন, কিন্তু তিনি তাল সামলাইতে পারিলেন না ; মিনার্ভায় তাঁহার লোকসান হইল, ভাড়া বাকী পড়িতে লাগিল। এ সময়ে মিনার্ভার বাড়ীর মালিক ছিলেন খুলনার তদানীন্তন বড় উকীল স্বর্গীয় বেণীভূষণ রায়, এবং ঐ জেলারই একজন জমিদার ৺প্রিয়নাথ দাস। কিছুদিন লোকসানের পর এই মিনার্ভার দল লইয়া অমরবাবু একেবারে পদ্মা পার হইয়া ঢাকায় অভিনয় করিতে যান। কিন্তু সেখানেও সুবিধার অপেক্ষা অসুবিধাই হইয়াছিল বেশী। টানাটানির অজুহাতে এবং নানা কারণে সেখানে দল ভাঙ্গিয়া যায়। অমরবাবু বিরক্ত হইয়া দলের সকলকেই পদ্মাপারেই বরখাস্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। শুনিয়াছি, অভিনেত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও গহনা বাঁধা দিয়া রাহা খরচ চালাইয়া দেশের দলকে দেশে ফিরিতে হয়! এই সময়েই অমরবাবুর ক্লাসিক থিয়েটার 'রিসিভারে'র হাতে যায়, এবং সে 'রিসিভার' হয়েন খুলনা জেলারই একজন ভদ্রলোক, তাঁহার নাম ৺অতুলচন্দ্র রায়। ইনি, মিনার্ভায় বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার যখন স্বত্বাধিকারী, তখন দিনকতক থিয়েটারী কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র ও এই অতুলবাবু তখন নরেনবাবুর ষ্টেটের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। এই মহেন্দ্রবাবুর

সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের থিয়েটারের একটা সময়ের ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ; কিন্তু সে কথা আমরা পরে বলিব, এখন মনোমোহনবাবুর পালাই চলুক। অমরবাবু মনোমোহনবাবুরও টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেন না ; তিনি টাকার পরিবর্ত্তে মিনার্ভার 'লিজ' মনোমোহনবাবুকে হস্তান্তর করিয়া দিলেন। মনোমোহনবাবুর থিয়েটার করিবার বীজ উপ্ত হইল।

কিন্তু এখনও মনোমোহনবাবু স্বত্বাধিকারী নহেন, মাত্র 'লেসী'। স্বত্বাধিকারী হইলেন—বাবু চুনীলাল দেব। মনোমোহনবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল—তিনি থিয়েটারের কাজকর্ম্ম সবই দেখিবেন, এবং তজ্জন্য ভাড়া বাদে তিনি (gross sale) মবলক বিক্রয়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিশন পাইবেন, লাভ-লোকসানের দায়ী তিনি নহেন। আর মহেন্দ্রবাবু হইলেন—এই নব-গঠিত দলের (legal adviser) আইন আদালত সম্বন্ধে পরামর্শদাতা। তখনকার থিয়েটারের সহিত আদালত, আইন ও মোকদ্দামার যে কীরূপ নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, পাঠক এই বন্দোবস্ত হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

চুনীবাবুই অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী। তাঁহার দলের অভিনেতৃবর্গ অধিকাংশই নূতন। নাটক লিখিতেছেন স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামী বি. এ.। এই সময় গিরিশবাবু ক্লাসিকে, অর্দ্ধেন্দুশেখর ষ্টারে। তখন ষ্টারে 'প্রতাপাদিত্যে'র হুজুক চলিতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের খুব নাম। মনোমোহবাবুর সঙ্গে থিয়েটারে আসিলাম। চুনীবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, নবীন কর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকে পরিচিত। নূতন দল গড়া হইতেছে—চুনীবাবুর উৎসাহ খুব ; দলের লোকেরও উৎসাহ কম নহে। থিয়েটার যেন সকলেরই ঘর-বাড়ী। অনেকের আহারাদির ব্যবস্থাও সেই-খানেই ; দিনরাত রিহার্স্যাল চলে। দৃশ্য-পটাদি আঁকা হইতেছে। থিয়েটারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত পূর্ণ উদ্যমেই চলিতেছে। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া ; আমিও সহজেই এই দলে ভিড়িয়া গেলাম। প্রায় বার বৎসর যে আশা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতাম, দেখিলাম সে আশা ফলবতী হইবার সুযোগ সম্মুখে। দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়ই থিয়েটারে থাকি, যখন যে কাজের প্রয়োজন হয়, করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময় স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামীর নাটক অভিনয় হইত। গোস্বামী মহাশয়ের নাটক লিখার এই প্রথম উদ্যম। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'ও মাঝে মাঝে প্রোগ্রামের মধ্যে থাকিত। থিয়েটার চলিতেছে, কিন্তু বিক্রয় সুবিধার নয়। সকলেরই চিন্তা, কী করিলে বিক্রয় বাড়ে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পরলোকগত মহেন্দ্রকুমার মিত্র এই সম্প্রদায়ের একজন কর্ম্মকর্ত্তা ;

তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় যাইত থিয়েটারের কার্য্যে। থিয়েটারের কার্য্যে ইঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ইতিপূর্ব্বে এই মহেন্দ্রবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে স্থাপিত ইউনিক নামে একটী থিয়েটারে যোগ দেন। তাহাতে দানীবাবু ও চুনীবাবু অংশীদার ছিলেন।

স্বর্গীয় ডি. এল. রায় মহাশয়ের 'তারাবাই' ইউনিকে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। 'তারাবাই' নাটকে 'পার্ট' নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এইরূপ,—পৃথ্বীরাজ দানীবাবু, সংগ্রামসিংহ চুনীবাবু, ৺তারক পালিত রায়মল, শ্রীমতী তারাসুন্দরী তারাবাই, তমসা প্রকাশমণি, ইত্যাদি। এই নাটক প্রধানতঃ ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লেখা; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সুললিত ছন্দের পর, ডি. এল. রায়ের এই ভাঙ্গা ছন্দ দর্শকের কানে বড় বেখাপ লাগিত। প্রথম দুই-চারি রাত্রির অভিনয়ে আমরা দর্শক ছিলাম। এই অভিনব ভাঙ্গা ছন্দে অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিত। যবনিকা পড়িলে দর্শকরাও তাহার অনুকরণে নিজেদের মধ্যে কথা কহিত। যথা,—

একজন বলিল, "কোথা যাইতেছ?"
দ্বিতীয় উত্তর দিল, "খাইবারে জল; তুমি যাবে?"
১ম। "নহে বন্ধু।"
২য়। "উত্তম; আমি তবে আসি।"

দর্শকদের মধ্যে ইহা লইয়া খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য ডি. এল. রায় মহাশয় ভাঙ্গা ছন্দে আর বড় বেশী নাটক লেখেন নাই। স্বর্গীয় রায় মহাশয় বাঙ্গলা নাটকে একটা নূতন ধারা আনয়ন করেন। তাঁহার ভাষায়, কী গদ্যে, কী পদ্যে, একটা নূতনত্বের ছাপ ছিল। তাঁহার দুই-তিনখানি নাটক বাহির হইবার পরই তিনি রঙ্গমঞ্চে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাটকীয় ঘটনার সাজানর গুণে এবং অভিনয় মনোজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার 'তারাবাই' জমিয়াছিল ভাল।

মিনার্ভার যখন এই অবস্থা, সেই সময় ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' এক রাত্রি অভিনয়ের পর বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমান সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করিতে দিলেন না। শনিবার 'সৎনামে'র দ্বিতীয় অভিনয় রজনী। সন্ধ্যার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই দলবদ্ধ হইয়া অমরবাবুকে জানাইলেন, 'সৎনাম' যদি অভিনীত হয় তবে ক্লাসিকের ইটের পর আর ইট থাকিবে না। রঙ্গমঞ্চে দর্শক জুটিয়াছে অসংখ্য। অমরবাবু 'সৎনাম' বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। টিকিটের দাম ফেরৎ দিলেন। মনঃক্ষুণ্ণ দর্শক মিনার্ভার দিকে ঝুঁকিলেন। মিনার্ভায় তখন স্বর্গীয়

মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' নাটকের অভিনয় চলিতেছে। 'সংসারে'র প্রথম দুই-তিন রাত্রি কিছুই লোক হয় নাই। কিন্তু এই রাত্রিতে ক্লাসিকের ফেরৎ যাত্রীতে প্রায় অর্দ্ধেকের উপর পূরিয়া গেল। অভিনয় হিসাবে মিনার্ভা সম্প্রদায় 'সংসার' অভিনয় করিতেন ভাল। বইখানিও পাঁচ ফুলে সাজান একটী দিব্য তোড়া। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র নবীনমাধব ও তোরাপ কর্ত্তৃক ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের অবিকল অনুকরণ এই 'সংসারে' আছে। তারকনাথ গঙ্গো[পাধ্যায়ে]র 'সরলা'র ('স্বর্ণলতা') ভাব ও ভাষা, চরিত্রের ছায়াও ইহার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রামলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'কালপরিণয়' এবং অমৃতবাবুর 'তরুবালা'র চরিত্রের অনুকরণও মাঝে মাঝে উঁকি মারে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি'ও আকার বদলাইয়া বাদ যায় নাই। এক কথায়, এই নাটকে বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত তখনকার ভাল ভাল নাটকের একত্র সমাহার ঘটিয়াছিল। আকস্মিক এই দর্শক সমাগমে দুঃখের 'সংসার' জমিয়া গেল—কথঞ্চিৎ সচ্ছল হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিনার্ভার ভাগ্য-প্রসন্নতারও সূত্রপাত হইল; এবং যে সকল নবীন অভিনেতা 'সংসারে' অভিনয় করিতেন, তাঁহারাও বাজারে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। এই কর্ম্মীদলে, যাঁহারা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম—বাবু ক্ষেত্র-মোহন মিত্র, বাবু মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), পরলোকগত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টু-বাবু) ও নৃত্যশিক্ষক বাবু সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু); স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত—যিনি মিঃ পালিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন—তাঁহাকেও এই দলেরই একজন ধরা যাইতে পারে।

শনিবারে 'সংসারে'র দৌলতে একরকম বিক্রয় হয়; কিন্তু অন্যান্য বারে বিক্রয় কিছুই হয় না। থিয়েটার জমাইতে হইলে যেমন ভাল নাটক চাই, তেমনি ভাল দলেরও দরকার। মিনার্ভা দল পুষ্ট করিবার জন্য অন্য থিয়েটার হইতে লোক ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিলেন। ইউনিক হইতে আসিলেন শ্রীমতী তারাসুন্দরী, আর ষ্টার হইতে ভাঙ্গান হইল অর্দ্ধেন্দুশেখরকে।

'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রবাবু, মনোমোহনবাবু ও চুনীবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অনেক সময় মিনার্ভা থিয়েটারের পরামর্শসভায় তিনি যোগ দিতেন। বিক্রয় কী করিলে বাড়ে তাহার একটা সুমীমাংসা তিনি করিলেন। বহুকাল পরে থিয়েটারে আবার উপহার বৃষ্টির সৃষ্টি হইল। এই উপহারের কথাটা একটু বলিয়া রাখি।

উপহার প্রথাটী নূতন নহে। বহু পূর্ব্বে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারেও থিয়ে-

টারের ভাঙ্গা অবস্থায় এই উপহারের প্রলোভনে দর্শককে আকৃষ্ট করা হইত। ইহার অনুকরণে এমারেল্ড থিয়েটারেরও ভাঙ্গা অবস্থায়, যখন মহেন্দ্রবাবু লেসী, তখন দর্শকবৃন্দকে আংটী ইয়ারীং প্রভৃতি উপহার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ন্যাশানাল থিয়েটারে লটারীর হিসাবে উপহার দেওয়া হইত। দ্রব্যগুলি ফুটলাইটের সামনে সাজান থাকিত ; টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকিত, দ্রব্যগুলিতেও নম্বর দেওয়া হইত। যে দর্শকের ভাগ্যে যে নম্বরের টিকিট আসিত, সেই নম্বরের জিনিষ তিনি পাইতেন। কেহ হয়তো এক বস্তা কয়লা পাইলেন, কেহ হয়তো একটী ছাতা, কেহ হয়তো বড় দুইটী বিলাতী কুমড়া, কেহ-বা এক কাঁদি কলা ! পাকা কি কাঁচা তাহা জানি না। দর্শকগণের মধ্যে এই উপহার লইয়া খুব হাসিতামাসা চলিত। এমারেল্ড থিয়েটার নাকছাবি ইত্যাদি দিয়াও যখন দর্শক যোগাড় করিতে পারিতেন না, তখন এক টিকিটে দুই দিন অভিনয়ও করিতেন। কিন্তু এত দুঃখেও তখনকার থিয়েটারে সন্ধ্যা হইতে জুড়িয়া প্রত্যুষ (?) বেলা আটটা পর্য্যন্ত কখনও অভিনয় হইত না। এ দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী অভিনয় আয়োজনের প্রবর্ত্তক অমরবাবু। এই উপহার কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিলেন আবার মিনার্ভা। 'বসুমতী'র গ্রাহক বাড়াইবার জন্য উপেনবাবু গ্রাহকবর্গকে নানা গ্রন্থ উপহার দিতেন। বস্তাবন্দী অনেক পুস্তক তাঁহার উদ্বৃত্তও থাকিত। মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকিটের মূল্য অনুসারে পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক রজনীতে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। মিনার্ভায় ফুল ফুটিল। প্রতি অভিনয় রজনীতে অসম্ভাবিত দর্শকের ভীড়। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গ্রন্থাবলী উপহারের পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সামনে ক্লাসিক—তাহাতে আর লোক হয় না। দূরে হাতীবাগানের ষ্টার, তাহার অবস্থাও ক্রমশঃ তথৈবচ। কারণ তখন 'প্রতাপাদিত্যে'র ভীড় কমিতেছে। কাতারে কাতারে মিনার্ভায় দর্শক ফিরে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় ও অভিনয়ে অভিনয়ও হয় সুন্দর। মিনার্ভার দেখাদেখি অমরবাবুও উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন ; 'মাইকেল গ্রন্থাবলী' এমন-কি 'শব্দকল্পদ্রুম' পর্য্যন্ত দর্শকগণকে দেওয়া হইল। কিন্তু বাজী জিতিলেন মিনার্ভা। আমি মিনার্ভার সংস্রবে আছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন পার্ট লই নাই। নড়াইলের ইলিসিয়াম থিয়েটারেই পূজার সময় প্লে করিব বলিয়া সেখানে গিয়াও রিহার্স্যাল দিই, শিক্ষক—সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর। বৃহস্পতিবারেই শনিবার রবিবারের প্রোগ্রাম বাহির হইয়া গিয়াছে। শনিবারে 'কপালকুণ্ডলা', রবিবারে 'সংসার'। স্বর্গীয় মনোমোহনবাবু নবকুমার ও প্রিয়নাথ সাজিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে তিনি

হঠাৎ নোটিশ দিয়াছেন—তিনি আর অভিনয় করিবেন না। আমি দলে আছি; মনোমোহনবাবু, চুনীবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আমিই নবকুমার ও প্রিয়নাথ সাজিব। দলের অনেকে কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'হিরো'র পার্ট—আমি বাহিরের এ্যামেচার থিয়েটারের একজন রবাহুত আসিয়া অভিনয় করিব, ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা-হানি হইবে বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করিলেন। দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে দু-চারিজন অধ্যক্ষ চুনীবাবুকে জানাইলেন যে, এই অবিচার ও অনিয়মের যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে তাঁহারা একযোগে মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিবেন। এই সময় চুনীবাবু যে সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। যদি চুনীবাবু বিপক্ষ দলের কথায় বিচলিত হইতেন তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় যে, আমাকে সে সময় মিনার্ভার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইত। চুনীবাবু স্পষ্টাক্ষরে সকলকে বলিলেন, আমিই ঐ পার্ট করিব, যাঁহাদের আপত্তি আছে তাঁহারা মিনার্ভা ত্যাগ করিতে পারেন। চুনীবাবুর এই দৃঢ়তা দেখিয়া বিপক্ষ দল নিরস্ত হইলেন। আমি সেই শনিবারেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দকে প্রথম অভিবাদন করিলাম—'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার বেশে। অর্দ্ধেন্দুশেখর শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দ ধরে না; মনোমোহনবাবুর আনন্দ ধরে না, কেননা আমি তাঁহার বাল্যবন্ধু। চুনীবাবুও প্রফুল্ল, কেননা তাঁহার রায় বজায় আছে, তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইতে হয় নাই। এই ব্যাপার হইতেই পাঠক বুঝিবেন নূতনের পক্ষে তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বড় পার্ট লইয়া অভিনয় করা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অভিনেতৃবর্গও সহ্য করিতে পারিতেন না যে, বাহিরের লোক আসিয়া তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ায়। ইহার পর আর একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিলে এই ব্যাপারের দুরূহত্ব পাঠক আরও উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একদিন রবিবার 'জনা'র অভিনয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। জনা—পরলোকগতা তিনকড়ি। পূর্ব্বে চুনীবাবুই প্রবীর সাজিতেন; আমার বয়স অল্প দেখিয়া চুনীবাবু আমায় বলিলেন, "তুমি প্রবীর সাজ, আমি অর্জ্জুন সাজিব।" জানি না কেন প্রথম হইতেই চুনীবাবু আমায় কেমন সুনজরে দেখিয়াছিলেন। আমি রাজী হইলাম। দ্বিতীয় কনসার্ট বাজিতেছে, আমি প্রবীর সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আছি। তিনকড়ি জনা সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াই—বোধহয় চুনীবাবুকে দেখিতে না-পাইয়াই—আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" আমি বলিলাম, "প্রবীর।" তিনকড়ি তখন মাঝে মাঝে আসিয়া অভিনয় করিত, এইজন্য আমাকে

সে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তিনকড়ি বলিল, "কেন? চুনীবাবুর কী হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "চুনীবাবু অর্জ্জুন সাজিবেন।" "তা তো কথা ছিল না" বলিয়াই তিনকড়ি দ্রুতপদে চুনীবাবুর সন্ধানে গেল। যে সকল অভিনেতা আমার বিরুদ্ধে দল বাঁধিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের চাল কিনা জানি না, কিন্তু দেখিলাম এই ব্যাপারে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত। যদি আমার পোষাক খুলিয়া লইয়া আমাকে ঐ রাত্রের অভিনয় হইতে বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রতিশোধ লওয়াটা খুব "ড্রামাটিক" হইত নিশ্চয়! এদিকে কনসার্ট কিন্তু বাজিতেছে, বাহিরে দর্শকও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, এবং এই অসম্ভাবিত বিলম্বের জন্য তাঁহারা মাঝে মাঝে হাততালিও দিতেছেন। আমি সেইভাবেই দাঁড়াইয়া আছি। একে নূতন পার্ট, ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় মন অস্থির, তাহার উপরে যাহার সঙ্গে অভিনয় করিব তাহার এই বিরোধীভাব! যাহাই হউক তিনকড়ি ফিরিয়া আসিল এবং অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে বেশ সু-উচ্চারিত ও সুস্পষ্ট স্বগতভাবে বলিল—"নূতন লোকের সহিত প্লে করা ঝকমারী"; অর্থাৎ—এতদিনের প্রতিষ্ঠা বুঝি গেল! অভিনয় শেষ হইল, বড় অভিনেত্রীর প্রতিষ্ঠা গেল কিনা জানি না—কিন্তু আমার যৎকিঞ্চিৎ যে প্রতিষ্ঠা হইল তাহা দর্শকগণের ঘন ঘন করতালিধ্বনি জানাইয়া দিল।

[১১]

উপহারের হুজুক ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১১—তিন মাস উপহার দিয়া থিয়েটারের আসর কোনরকমে সরগরম রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বন্যার জল সরিয়া গেলে মিনার্ভার আবার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে ভাদ্র মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ষ্টার হইতে ভাঙ্গান হইয়াছে। দল ক্রমশঃই জাঁকিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু অভাব—নাটকের। এই সময় বাবু মনোমোহন রায় একখানি নাটক অভিনয়ার্থ দেন। নাটকখানির নাম 'ঐন্দ্রিলা'। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রাসুরে'র কায়া ও ছায়া পরিবর্ত্তিত আকারে ইহাতে ছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে 'রিজিয়া' নাটক লিখিয়া থিয়েটার মহলে তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই 'রিজিয়া' নাটক সম্বন্ধে দু-এক কথা এইখানেই বলিয়া রাখি। যদিও পুস্তকে উল্লিখিত নাই, তথাপি এ কথা সত্য যে, স্কটের প্রসিদ্ধ নভেল 'কেনিলওয়ার্থ' (*Kenilworth*) অবলম্বনে ইহা রচিত। 'অরোরা' থিয়েটারে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এই অরোরা ভাদুরে দলের মত দিনকতক বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজ ভাড়া লইয়া থিয়েটার করিয়াছিল।

ইহার 'লেসী' ছিলেন স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ মৈত্র। তখনকার নূতন, পরে সুপ্রসিদ্ধ, নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'দক্ষিণা' লইয়াই, আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে, বোধহয় এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র 'রিজিয়া'ই উল্লেখযোগ্য। আর বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয়-সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়। এ ভূমিকায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই। বহুকাল পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারের কোন এক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই 'রিজিয়া'র উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন, যে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে তারার রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই।

যে সময়ে আরোরায় 'রিজিয়া' খোলা হয়, সে সময়ে নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর এই সম্প্রদায়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে এই নাটকে একটী সামান্য অংশ (ঘাতুক) অভিনয় করেন। 'রিজিয়া' যখনই যে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, সেখানেই ইহা দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। 'রিজিয়া'য় মনোমোহন-বাবুর এই প্রতিষ্ঠা দেখিয়াই মিনার্ভা সম্প্রদায় তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'ঐন্দ্রিলা' খুব আগ্রহ সহকারে অভিনয়ার্থ লইয়াছিলেন এবং সে সময়ে যতদূর সম্ভব অর্থব্যয় করিয়া সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐন্দ্রিলার ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল তারাসুন্দরীকে। নূতন ব্রতীদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু, স্বর্গীয় তারক পালিত, হাঁদুবাবু, মণ্টুবাবু প্রভৃতি সকলেই এই নাটকে সাজিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনে আমিও বাদ পড়ি নাই। পাবলিক থিয়েটারে নূতন নাটকে এই আমার প্রথম পার্ট। চুনীবাবু বৃত্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষক—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত যত্নেও 'ঐন্দ্রিলা' আর 'রিজিয়া' হইল না। ইহার প্রথম রাত্রির বিক্রয় মাত্র দুই শত আশী টাকা।

আমার নটজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়া আসিতেছি যে, অধিকাংশ নাট্য-কারেরই প্রথম নাটকখানি যেমন জমে, পরবর্ত্তী নাটকগুলি তেমন জমে না বা প্রথমখানির কাছাকাছিও যায় না। অপ্রিয় হইবে বলিয়া আমি উদাহরণস্বরূপ এই সকল প্রথম-নাটকবিজয়ী নাট্যকারগণের নামের তালিকা দিলাম না; পাঠক যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু পরিশ্রম করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রঙ্গমঞ্চের নিকষে কসিয়া দেখিতেছি, উপর্য্যুপরি

দুই-চারিখানি নাটক যাঁহার জমে, তিনিই ভবিষ্যতে যোগে টিঁকিয়া থাকেন; নচেৎ ১৮৭৪ সালের গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার হইতে এ পর্য্যন্ত যত নাট্যকারের নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম আজ কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়াই কালগর্ভে আত্মগোপন করিত না। এ সম্বন্ধে একবার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত আলোচনা হয়। তাঁহাকেও আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "মহাশয়, প্রায় নূতন লোকের একখানা ক'রে নাটক জমে কেন? অন্তগুলিই বা না-জমার কারণ কি?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; আমার মনে হয়, নূতন লেখক, নবীন উদ্যমে প্রথম নাটকখানি লিখিবার সময় তাঁহার যাহা কিছু পুঁজীপাটা আছে তাহা খরচ করিয়া দেউলিয়া হন, ভবিষ্যতে দিবার মত তাঁহার কিছু থাকে না। কাজেই বইও ভাল হয় না, প্রায়ই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে।"

'ঐন্দ্রিলা' জমিল না। থিয়েটারে একখানি বই না-জমার অর্থ,—থিয়েটার কোম্পানীর দেউলিয়া আদালতের ফটকে পা বাড়াইয়া দেওয়া! বাইশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় চারি-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া এই 'ঐন্দ্রিলা' নাটকের গঠন করা হইয়াছিল। নাটক শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ও শুইবার উপক্রম করিল। সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং এ কথা অতি সত্য—যে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা বাহিরের নাট্যকারকে সহজে রঙ্গমঞ্চের গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেন না। এ কলঙ্কের হাত হইতে গিরিশচন্দ্রও এড়ান নাই, অমৃতলাল বসুও এড়ান নাই; এবং এখনও যাঁহারা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ হইয়া নাটক লেখার ন্যায় মহাপাপ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এই দুরপনেয় কালি মাখিয়াই ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহ ভাবিয়া দেখেন না যে, নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষদের অবস্থা কী? রঙ্গজীবী জীবনধারণ করেন সংসারের আর পাঁচজনের মতই। ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মানলাভের অধিকারী হইবার স্পর্দ্ধা তাঁহাদের না-থাকিলেও, জীবনধারণ করিতে গেলে, অভদ্রোচিত অন্নবস্ত্রেরও অপরিহার্য্য আবশ্যক হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশের থিয়েটারে রাজকীয় সাহায্য নাই। দেবতার পরেই ভূস্বামীগণের পূজার ব্যবস্থা। দেবতা রাজা বাঙ্গলা থিয়েটারে বিরূপ। পরবর্ত্তী দেবতা ভূস্বামীগণেরও এ দেশের থিয়েটারের প্রতি কত সহানুভূতি, তাহা থিয়েটারে টিকিট বেচিয়া এবং 'পাশ' বহিতে সহি করিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। অথচ থিয়েটার যে সমাজের একটা আবশ্যকীয় সামগ্রী, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। এই আবশ্যকীয় পদার্থটীকে যৎকিঞ্চিৎ আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন—বাঙ্গলার দৃষ্টিহর ছাত্রকুল এবং লক্ষীবন্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। যাঁহারা সাহিত্যের দোহাই

দিয়া থিয়েটার সম্প্রদায়কে উঠিতে বসিতে, আলাপে বিলাপে, স্থানে ও অস্থানে স্থবিধা পাইলেই, কিংবা তদভাবে, স্থযোগ প্রস্তুত করিয়া কলমের খোঁচা দেন এবং নাট্যশালায় সংশ্লিষ্ট হতভাগ্যগণকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত করিয়া থাকেন—বিনা আবাহনে তাঁহাদের মধ্যে কয়জনকে যে থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে দেখিয়াছি, তাহা যদি হলপ করিয়া বলি—তাহা হইলে তাঁহাদের নামের তালিকায় একটা প্রকাণ্ড 'শূন্য' বসাইতে হয়। অবস্থা এইরূপ শোচনীয়—কিন্তু অভিযোগ প্রকাণ্ড। সত্যিই তো—'আর্টে'র জন্যই যদি থিয়েটার, সুকুমার শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্যই যদি থিয়েটার, সাহিত্যের চর্চ্চার জন্যই যদি রঙ্গক্ষেত্র—তবে নাট্যমন্দিরের দরজা এরূপ আগড় দিয়া আটকান হয় কেন? এ 'কেন'র এক কথায় উত্তর—সহানুভূতির অভাব নহে—অর্থাভাব। যেমন-তেমন একখানি নাটক খুলিতে সম্প্রদায়স্থ সকলের বেতন ও সরঞ্জামাদির মূল্য লইয়া আজিকালকার দিনে খুব কম বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কমে হয় না। অপরিচিত, অখ্যাতনামা নাট্যকারের নাটক যাচাই করিয়া অভিনয় করিবার এই যে 'ঝুঁকি'—ব্যবসা করিতে বসিয়া এ বিষম ভার ঘাড়ে লওয়া যে কতখানি দুঃসাধ্য ও অসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে কোন একখানি মাসিক পত্রিকায় সামান্য একটী প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যে কোন সম্পাদকের দরজায়—শুধু দাঁড়াইয়া নয়—"হত্যা" দিয়া—কত যে অজ্ঞাত-নামা লেখককে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা বাঙ্গলাদেশের সম্পাদক মাত্রেই জানেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অদ্যাবধি এ পর্য্যন্ত থিয়েটারের 'ভ্যাগাবণ্ডগণে'র মত কোন সম্পাদককে কোন খ্যাত ও অখ্যাতনামা লেখকের নিকট এমন গালা-গালি খাইতে হয় নাই—যেমন গালাগালি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই থিয়েটারের 'ভ্যাগাবণ্ডগণ'কে খাইতে হইয়াছে এবং আশা করি ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাঁহাদিগকে বাহাল তবিয়তেই এই গালি হজম করিতে হইবে! প্রথম ঝুঁকি এই, দ্বিতীয়—শুধু ঝুঁকি নয়—সর্ব্বনাশ,—যদি বই না জমিল! দেশের থিয়েটার যদি Benevolent Society হইত কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীরা যদি শুধু গালিভুক্ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে অনুযোগ করিবার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, দেশে এমন উদার-হৃদয় মুক্তহস্ত ধনী শ্বশুরও খুব কম আছেন যিনি তাঁহার জামাতা বাবাজীবনের জন্যও বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা অনায়াসে বাজে খরচ করিতে পারেন। ইহার পরে নাটকের গুণাগুণের কথা। যাক্, এখন আমাদের যে কথা হইতেছিল।

থিয়েটারের অবস্থা খারাপ। অর্দ্ধেন্দুশেখর ষ্টার ছাড়িয়া আসিয়াছেন বটে,

কিন্তু সেখানে তিনি 'প্রতাপাদিত্য' 'জ্বালাইয়া' দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিক্রমাদিত্য ও রডার সুখ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিত। 'প্রতাপাদিত্যে'র নেশা তখনও তাঁহার কাটে নাই। তিনি এই দুর্দ্দিনে মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খুলিবার পরামর্শ দিলেন। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক থিয়েটারের বই অন্ত থিয়েটারে খুলিবার একটা প্রবল ঝোঁক বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারের ছিল। আমার জ্ঞানে ষ্টারকে একবার মাত্র এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

খুব ধুমধামের সহিত 'প্রতাপাদিত্যে'র রিহার্স্যাল চলিল। তখন Dramatic আইনের বালাই হয় নাই, সুতরাং এক থিয়েটারের বই অন্য থিয়েটারে অভিনয় করার কোন বাধা ও বিপত্তি ছিল না; এবং থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে নাট্যকারগণকে royalty হিসাবে নগদ মূল্যও কিছু ধরিয়া দিতে হইত না। মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খোলা হয় ১৩১১ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ। এই প্রথম রাত্রির অভিনয়ে, আমার যতদূর স্মরণ আছে, ভূমিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এইরূপ :

বিক্রমাদিত্য ও রডা	...	৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
প্রতাপ	...	শ্রীচুনীলাল দেব
বসন্তরায়	...	স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত
গোবিন্দরায়	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
গোবিন্দদাস	...	৺মোহিতমোহন গোস্বামী
ভবানন্দ	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
সুন্দর	...	৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
শঙ্কর	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কল্যাণী	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
বিজয়া	...	৺কিরণময়ী, পরে পরলোকগতা সুশীলাসুন্দরী
ছোট রাণী	...	৺সরোজিনী—ইত্যাদি

প্রতিযোগিতায় অভিনয় কিরূপ হইয়াছিল, যখন মিনার্ভায় দলে নিজে ছিলাম, তখন কিছু না-বলাই উচিত। তবে অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর ষ্টারের ধারা এখানে কিছু কিছু বদলাইয়া দিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যে দৃশ্যে কল্যাণীকে নবাবের লোক অপহরণ করিয়া লইতে আসে, সেই দৃশ্যে প্রতাপ কল্যাণীকে দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে উদ্ধার করিলে, ষ্টারের কল্যাণী দৃশ্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সজ্ঞানে দাঁড়াইয়া থাকিত। মিনার্ভায় কল্যাণীকে সাহেব শিখাইয়াছিলেন, উদ্ধারের পর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যাইতে; সেই অজ্ঞান অবস্থায় শঙ্কর তাহাকে ধরিয়া

ফেলিত। অনভ্যস্ত দর্শকবৃন্দ প্রথম দুই-এক রাত্রি ইহাতে হাসিয়া উঠিত। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর তারাসুন্দরী সাহেবকে বলিয়াছিল, "সাহেব, এ তো নিলে না, লোকে যে হেসে উঠল?" সাহেব পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "কোন ভয় নেই, ক্রমশঃ নিতে শিখবে।" সাহেবের কথাই সত্য হইয়াছিল। দর্শক ক্রমশঃ ইহা লইয়াছিলেন এবং 'প্রতাপাদিত্যে'র এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাত্রির বিক্রয় মাত্র ২২৭৲ টাকা হইলেও ক্রমশঃ হাজারের উপর উঠিয়াছিল। মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খুলিবার কিছু পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছাড়িয়া মিনার্ভায় যোগ দেন।

[১২]

মিনার্ভায় এই যে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর মিলন, উত্তরকালে ইহাই মিনার্ভার সমৃদ্ধির নানা কারণের মধ্যে একটা বিশেষ কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইত পারে! এই দুই প্রতিভার একত্র মিলন বহুবার হইয়াছে, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া ইহাদের একস্থানে অবস্থান বাঙ্গলা নাট্যশালায় আর কোনদিন হয় নাই। অগ্রহায়ণ মাসে 'প্রতাপাদিত্য' খোলা হয়; পৌষ মাসে (বোধহয় বড়দিনের সময়) চুনীবাবুর একখানি অপেরা খোলা হয়—তাহার নাম 'নসীব'। এই 'নসীবে' কয়েকখানি গান গিরিশবাবু বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মাঘ মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখরের একখানি নূতন প্রহসন খোলা হয়—'ভগবান ভূত'। সাহেবের বই লেখা, অনেকে জানেন—এই বোধহয় প্রথম, এই বোধহয় শেষ; কিন্তু আমরা জানি, ইহার পূর্ব্বেও তিনি একখানি বই লিখিয়াছেন—'দুর্গাপূজার পঙ্করং'; উহা এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'ভগবান ভূত' মাত্র এক রাত্রি অভিনয় হইয়াছিল। এক রাত্রি অভিনয় হইবার কারণ, যে অভিনেতা ভূতরূপী ভগবান সাজিয়াছেন, প্রথম রাত্রেই তাঁহাকে ভূতে ফেলিয়া দেয়; কাজেই ভূত লইয়া রঙ্গরহস্য রঙ্গমঞ্চে সহিল না। ভূতের ওঝাকে ভূতে মারে, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ভূত বড় বালাই—ভূত সাজিলেও ভূত ছাড়ে না—তা কী নাট্যমঞ্চে কী সংসার মঞ্চে! আর এইজন্যই বোধহয় অনেক ভূতকেই রঙ্গমঞ্চে হাত-পা নাড়িতে দেখিয়াছি এবং পরে তাঁহারা ভূতগ্রস্ত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। এই সময়ে মিনার্ভা বহু স্থানে বিদেশে বায়নায় যায়। থিয়েটারের বিদেশ যেমন আমোদের, তেমনই অনেকটা ভয়ের সংস্রবও তাহাতে আছে। কারণ প্রায়ই দেখা গিয়াছে, যখন কোন থিয়েটারের দল ভাঙ্গিয়াছে, তখন বিদেশেই তাহা ভাঙ্গিয়াছে কিংবা তাহার বজ্রপাত হইয়াছে। বহুবিদেশ মিনার্ভার ভাগ্যেও সহিল না। মালদহে গিয়া দল

ভাঙ্গিল। পাঠকের বোধহয় মনে আছে এখনও মিনার্ভার চুনীবাবু স্বত্বাধিকারী; মনোমোহনবাবু কেবল কার্য্যনির্ব্বাহক মাত্র। মালদহে গিয়া চুনীবাবুর সহিত মনোমোহনবাবুর মনোমালিন্ত ঘটে। দল বাঁধে বহু দিনে ও বহু চেষ্টায়; কিন্তু যখন ভাঙ্গে—তখন ভাঙ্গে এক দিনে—এক কথায়। এই ভাঙ্গনের উপলক্ষ্যও যে সব-সময়ে গুরুতর হয়, তাহাও নহে। বড় বড় সংসার ভাঙ্গে একখানা মাছ লইয়া, এক পলা তেল লইয়া, এক ঘটী জল লইয়া। মালদহে এই নবগঠিত মিনার্ভার দলও ভাঙ্গিল, সামান্ত পান লইয়া। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই ভাঙ্গন দৃশ্যতঃ ও বাহ্যতঃ সামান্ত ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও, সত্যকার আগুন ধরিয়াছিল অতি গোপনে এবং বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই। মালদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুনীবাবুর সহিত মনোমোহনবাবুর ফারখৎ হইল। এই ফারখতের বিস্তৃত বিবরণ আমি দিব না, কারণ তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

চুনীবাবু মিনার্ভার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলে, মনোমোহনবাবু ইহার এক-মাত্র স্বত্বাধিকারী হইলেন; কেবল মহেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার মৌখিক বন্দোবস্ত এই হইল যে, তিনি working partner হিসাবে ইহার লাভের এক-তৃতীয়াংশ হিস্সা পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা থিয়েটারের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর কায়েমী সম্বন্ধ এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে বি. এ., এম্. এ. অভিনেতা ও নাট্যকার দুই-চারিজন বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এম্. এ., বি. এল্. হাইকোর্টের উকীল, থিয়েটার ব্যবসায়ী ও থিয়েটার উপজীবীর মধ্যে এই মহেন্দ্রবাবুই প্রথম University-র hall-mark-প্রাপ্ত থিয়েটারওয়ালা।

চুনীবাবু চলিয়া গেলেন। কথা উঠিল 'ম্যানেজার' হইবে কে? মনোমোহন-বাবুর একান্ত ইচ্ছায় এবং সম্প্রদায়স্থ অনেকের সম্মতিক্রমে স্থির হইল আমাকেই ম্যানেজার করা হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৩১১ সালের ৩রা ফাল্গুন আমার নাম ম্যানেজার বলিয়া প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। থিয়েটারের ম্যানেজার হওয়া তখনকার এবং এখনকার দিনেও যে একটা বড় সৌভাগ্যের কথা এমন নহে; কারণ, এই ঘটনার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক ভুঁইফোঁড় থিয়েটারে অনেক 'রাম-শ্যাম'ও ম্যানেজাররূপে দেখা দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাহা হইলেও, হঠাৎ এমেচার থিয়েটার হইতে আসিয়া পাবলিক থিয়েটারে এই দায়িত্বপূর্ণ পদ পাওয়া আমার পক্ষে আবু হোসেনের হঠাৎ-বাদশাহী পাওয়ার মতই হইয়াছিল। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ছিলেন আমাদের Dramatic

Director। গিরিশচন্দ্রের অধীনে কাজ শিখিবার এই যে সুযোগ, ইহা আমার পক্ষে সাধারণ সৌভাগ্যের হয় নাই। ইহা আমার নটজীবনের গর্ব্ব এবং আনন্দের বিষয়; কিন্তু এ সকল ব্যক্তিগত কথার প্রয়োজন নাই। থিয়েটারের কথাই বলি।

এবারে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশবাবুর প্রথম বই হইল—'হর-গৌরী'। ১৩১১ সালের ২০শে ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন 'হর-গৌরী' প্রথম খোলা হয়। এই গীতিনাট্যে কয়েক রাত্রি গিরিশচন্দ্র মহাদেবের ভূমিকা অভিনয় করেন; এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর সাজেন নন্দী; গৌরী শ্রীমতী তারাসুন্দরী। কিন্তু এত করিয়াও 'হর-গৌরী' জমে নাই। ইহার প্রায় মাসখানেক পরে 'বলিদান' খোলা হইল। এই 'বলিদান' নাটক হইতেই মিনার্ভার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

'বলিদান' খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইল, কিন্তু স্বত্বাধিকারীর তহবিলে অর্থ তেমন আসিল না। ইহার কয়েক রাত্রির বিক্রয়ের তালিকা দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, এখনকার 'বলিদানে' যেমন "বাদুড় ঝোলে", তখনকার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও তখনকার public ইহাকে তেমন গ্রহণ করে নাই।

'বলিদানে'র প্রথম রাত্রির বিক্রয় ২৮৬৲ টাকা। দ্বিতীয় রাত্রি—২৬০৲। তৃতীয় রাত্রি—৩৭০৲। চতুর্থ রাত্রি—৩৫০৲। পঞ্চম রাত্রি—৩০৩৲। ষষ্ঠ রাত্রি—৫৪৪৲।

তালিকার কলেবর আর বাড়াইলাম না। কিন্তু টাকায় কম হউক, এবারের মিনার্ভার নূতন আমলে যে নূতন কর্ম্মীর দল যোগ দিয়াছিলেন, এই 'বলিদান' নাটক উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিন থিয়েটারটা যেন একটা বিশৃঙ্খলার আওতায় মাথা তুলিতে পারে নাই, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় এবং মনোমোহনবাবুর কর্ম্মদক্ষতায় এই 'বলিদান' নাটকের অভিনয়ের পর হইতেই থিয়েটার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। 'বলিদানে'র যখন খুব জমজমাট অভিনয় চলিতেছে, তখন শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু একদিন ইহার অভিনয় দেখিয়া গিরিশবাবুকে বলেন, সেকালের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর এরূপ নিখুঁত অভিনয় তিনি আর দেখেন নাই। অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের যে আলোচনা হয় তাহা আমার মনে আছে। অমৃতবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "মশায়, এমন powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব। Marriage problem নিয়ে আমি একটা farce করেছি, আপনি তা নিয়ে এত বড় একটা tragedy ক'রলেন!" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, "এ সব নাটক তো আমার লেখবার কথা নয়। মনে করেছিলেম, শেষ বয়সে দু-চারখানা ভাল নাটক

লিখে রেখে যাব, তা বুড় বয়েসেও এই নর্দামা ঘাঁটতে হ'চ্ছে। এ সব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।"

প্রথম রাত্রি 'বলিদানে'র অভিনয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর তালিকা নিয়ে দিলাম।

করুণাময়	...	৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ
রূপচাঁদ	...	৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
দুলালচাঁদ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
কিশোর	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মোহিত	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
ঘনশ্যাম	...	৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
রমানাথ	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
কালীঘটক	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল
সরস্বতী	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
জোবী	...	৺সুশীলাসুন্দরী
যশোমতী	...	৺সরোজিনী
রাজলক্ষ্মী	...	৺নগেন্দ্রবালা
কিরণময়ী	...	৺কিরণবালা
হিরণ্ময়ী	...	শ্রীযুক্তা চারুবালা
ঝি	...	শ্রীযুক্তা চপলাসুন্দরী

'বলিদানে'র মুষ্টিমেয় অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে অনেকে এখন পরলোকে। কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী বোধহয় এখনও অনেকে আছেন, তাঁহারা যদি সত্য সাক্ষ্য দেন তাহা হইলে বলিবেন যে, ভাবাভিনয়ে, গার্হস্থ্য জীবনের সরল সহজ ও স্বচ্ছন্দ ঘাত-প্রতিঘাত সমন্বিত নাটকের অভিব্যক্তিতে এই প্রবীণ ও অধিকাংশ নবীন কর্ম্মীর দল যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অনন্যসাধারণ; এবং প্রথমবারের 'বলিদানে'র সে অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সত্যই একটা স্মরণীয় ব্যাপার। বড় বড় ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য একটা পান-বিড়িওয়ালার ভূমিকায় একটা ছোট অভিনেতা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাও আজিকার দিনে বড় বড় থিয়েটারেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! 'বলিদানে'র একটা ঝি, একজন মুদী, একটা সামান্য শালওয়ালা, কি ছুটো বওয়াটে ছেলের সে নিখুঁত অভিনয়ের অনুকরণ করিতে কয়জন পারেন তাহা জানি

না। সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে (details) ও অতি ছোটখাটো ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু-শেখরের দৃষ্টি ছিল সর্ব্বদা সজাগ ও তীক্ষ্ণ। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাদান বাঙ্গলা নাট্যশালার এক অপূর্ব্ব গৌরবের অধ্যায়। কী করিয়া নাটক গড়িতে হয়, যাঁহারা ইঁহাদের গঠন-প্রণালী না-দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অভিনয়কে কলে পুরিয়া রাখা যায় না; সুতরাং পূর্ব্বের সহিত তুলনায়, এখনকার দিনের বাহ্বাস্ফোটও যেমন নিষ্ফল, তখনকার দিনের গৌরব-কাহিনীর প্রচারও তেমনি নিরর্থক। নিরর্থক, কেননা সে সবের সাক্ষী কেবলমাত্র তৎকালের দর্শক—এখনকার যাঁহারা সমালোচক, তাঁহারা নহেন। কারণ, দেখিতে পাই সাধারণতঃ আজকাল যাঁহারা রঙ্গসমালোচকের আসনে উপবিষ্ট, তাঁহাদের অধিকাংশই তখন হয় মাতৃঅঙ্কে, না-হয় পাততাড়ি বগলে পাঠশালায়। কাজেই অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক সমালোচনার বাহুল্য না-করিয়া, আমরা যাহা জানি, যাহা দেখিয়াছি, তাহারই কথা বলি।

'বলিদান' অভিনয়ের দুই-চারি রাত্রি পরে এক শনিবারে করুণাময়ের ভূমিকা অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। নূতন নাটকের প্রথম ধারাবাহিক অভিনয়—গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ, সম্প্রদায়স্থ সকলেই চিন্তিত, করুণাময় সাজিবেন কে? অথচ নূতন বই, বন্ধ দিলেও সমূহ ক্ষতি। সোমবার দুপুরবেলায় আমরা গিরিশবাবুকে দেখিতে গেলাম; তখনও তাঁহার হাঁপানির টান রহিয়াছে এবং আশু প্রতীকারেরও কোন সম্ভাবনা নাই।

বই বন্ধ করিতে গিরিশবাবু সম্মত হইলেন না। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, করুণাময় সাজিবেন কে? তিনি বলিলেন, "দু-রাত্রি যদি চালিয়ে দিতে পার, বোধহয় পরে আমি সাজতে পারব।" কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন উঠিল, দুই রাত্রিই বা চালাইয়া দিবে কে? গিরিশবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "পারে এক অর্দ্ধেন্দু। তবে তাকে যদি এ ক'দিন নজরবন্দী রাখতে পার, আর কোন-রকমে পার্টটা মুখস্থ করিয়ে দিতে পার।" ইদানীং সাহেবের বড় সুখ্যাতি ছিল, তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না। অনেক তর্ক বিতর্কের পর গিরিশবাবুর রায়ই বাহাল রহিল। সাব্যস্ত হইল যে অর্দ্ধেন্দুবাবুই সামনের সপ্তাহে করুণাময় সাজিবেন। থিয়েটারে ফিরিয়া আসিয়া আমরা সাহেবকে এই সুখবর দিলাম। (অর্দ্ধেন্দুশেখরকে সকলে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিত।) সাহেব বলিলেন, "বলিস কি? ও পার্ট যে গিরিশ জালিয়ে দিয়েছে! ও পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।" আমরা বলিলাম, "উপায় কি? বই বন্ধ দিলে যে বইখানা একেবারে যায়! আর সবচেয়ে বড় কথা,

বিপক্ষ দল যে হাসবে। ব'লবে, ওদের দলে এমন একটা লোক নেই যে করুণাময় সাজে?" সাহেব বলিলেন, "বলুকগে···রা! এ কি ছেলের হাতে মোয়া? যারা ব'লবে তারা এর বোঝে কি?"

কিন্তু আমাদের তখন "গরজ বড় বালাই।" সাহেবকে আমরা দলশুদ্ধ সকলে ধরিয়া বসিলাম, সাহেবও সম্মত হইলেন। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত অর্দ্ধেন্দু-শেখর আর বাড়ী যান নাই। চোখে ভাল দেখিতে পাইতেন না, বই পড়িয়া পার্ট মুখস্থ করা তাঁ[হা]র পক্ষে অসম্ভব ছিল। ক্ষেত্রবাবু তাঁহাকে পার্ট বলাইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্রি করুণাময়ের ভূমিকা সাহেবের জপমালা হইল। যখনই থিয়েটারে যাই, দেখি সাহেব পার্ট বলিতেছেন; আহার নিদ্রা নাই, অন্য কোন কথা নাই। গিরিশবাবু যে তাঁহাকে নজরবন্দী রাখিতে বলিয়াছিলেন, সে কথাও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম! আর গিরিশবাবুর সে কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিতের মর্য্যাদা তিনি রাখিয়াছিলেন; এ কয়দিন তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই—অথচ এই মদই ছিল তাঁহার অহোরাত্রের সঙ্গী।

সে শনিবার অর্দ্ধেন্দুশেখর করুণাময় সাজিলেন। তাঁহার অপবাদ ছিল তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না, কিন্তু সে কলঙ্ক এবার আর রহিল না। তিনি করুণাময়ের ভূমিকা যে শুধু মুখস্থ করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, অভিনয় তাঁহার এতই সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রের পর এ পর্য্যন্ত যত করুণাময় দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু-করুণাময়ের মত করুণাময় আর দেখি নাই।

অর্দ্ধেন্দুশেখর সে রাত্রি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিলেও, গিরিশচন্দ্রের সহিত এই চরিত্রের conception লইয়া পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য কী, যেমন দেখিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তেমনই বলিবার চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিব সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালি-কলমে অভিনয়কে তো আর ফুটাইয়া তোলা যায় না!

গিরিশচন্দ্রের করুণাময় যাহা বলে, যাহা করে, তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণীর মত হইলেও সাধারণ কেরাণী বা সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মত নহে। সে করুণাময়ের বাক্যে ও কার্য্যে যেন অন্তর্নিহিত এমন একটা গভীর ভাব আছে, যাহা বাহিরে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু মর্ম্মে অনুভব করা যায়। একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ, একটা প্রচ্ছন্ন মহত্ব, একটা প্রচ্ছন্ন উদার হৃদয়, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা, একটা প্রচ্ছন্ন সত্যনিষ্ঠা, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান!—এই অভিমানকে, এই বিষাদক্লিষ্ট ভাবকে চাপা দিয়া করুণাময় আফিসে যায়, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরের

বাপের ধারস্থ হয়, পণের টাকা সংগ্রহ করিতে বাড়ী বাঁধা দেয়, পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করে; কিন্তু Insolvent Court-এ যায় না, আর মেয়েগুলোকে অনিচ্ছায় অপাত্রে দিয়া মর্ম্মের আগুনে গুমরিয়া পোড়ে! এ করুণাময়ের অন্তরে যৌবনের প্রথম দিনে যেন উচ্চাভিলাষের বহ্নি জলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অভাবের উত্তাপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষ-রক্তকে শুকাইয়া দিতেছে। সাহেবের করুণাময় হইত ঠিক সাধারণ গৃহস্থ বাপ। মমতাকাতর, দারিদ্র্যে ম্রিয়মাণ, কন্যাদায়ে উদ্ভ্রান্ত এবং সংসারচক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ মানব। সাহেবের এ ভাবীর অভিনয় দেখিয়াও দর্শক কাঁদিত এবং গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দেখিয়াও দর্শকের চক্ষে জল ঝরিত। কিন্তু এই দুই চোখের জলেরও প্রভেদ ছিল। সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে, বুকের মধ্যে সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না—পরিচিত কণ্ঠে কে যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনরোল কানের কাছে তুলিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি করিয়া খুলিয়া লইতেছে। যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্দ্ধেন্দু-শেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইতো বলি, আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না" ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁ[হা]র চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলকনেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গম্ভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন্ অপরিজ্ঞাত শোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল—দমকা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমিষে, সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল! গিরিশ-চন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত। অভিনয়ান্তে—পথে, গৃহদ্বারে, অন্ধকার শয়নকক্ষে, আহারে নিদ্রায় স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু-তিনদিন পরেও এ করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সাহেবের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের প্রভাব দর্শককে আকুল করিয়া তুলিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে নাটকের সকল ঘটনা চাপা দিয়া মানসচক্ষে কেবল দেখা দিত—করুণাময়—বজ্রাহত তরুর ন্যায়, পত্রপুষ্পহীন, বিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত! গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই করুণাময় আলোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, "করুণাময় যদি ও দৃশ্যে কাঁদে, তাহ'লে সে আর গলায় দড়ি দিতে পারে না।"

[১৩]

গিরিশবাবুর নূতন নাটক খুলিয়াও যখন সুবিধা হইল না, তখন সম্প্রদায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মনোমোহনবাবু ব্যবসা করিতে নামিয়াছিলেন, কাপ্তেনী করিতে আসেন নাই। তিনি চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে লোকসান হইয়াছে, তাহা মফঃস্বলে অভিনয় করিয়া পূরণ করা যায় কিনা। স্থান নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল—কোথায় গিয়া থিয়েটার খুলিলে বিক্রয় হওয়া সম্ভব। সেবার এ সময়ে পুরীধামে ৺জগন্নাথদেবের নবকলেবর। পুরীতে লোক সমাগমের সম্ভাবনা অধিক; বিশেষতঃ বেঙ্গল-নাগপুরের রেল খোলায় যাত্রীর ভীড় যে অসম্ভব হইবে, ইহা সকলেই অনুমান করিয়া লইলেন; এবং এই অজুহাতে আমাদের থিয়েটার লইয়া পুরী যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। আর শুধু অর্থের দিক দিয়া নহে, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত এ আশাও ছিল যে, এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথধামে "রথদেখা ও কলাবেচা" দু-এরই সুবিধা হইবে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে 'রথদেখা'টাই হইয়াছিল, কলা বড় বেচিতে পারি নাই। কারণ, উড়িষ্যার বাসিন্দা যাঁহারা, তাঁহারা 'কলা'র মর্ম্ম তখনও পর্য্যন্ত কিছু বোঝেন নাই। আজিকালিকার দিনের মত 'কলা'র সর্ব্বসৌষ্ঠবের যুগে কী হইত বলা যায় না। আর যাত্রী যাঁহারা, তাঁহারা জগন্নাথ দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আমাদের প্রদর্শিত 'কলা'র দিকে কেহ ঘেঁষিতেন না। কাজেই পুরীতে পারমার্থিক ছাড়া আর কোন অর্থই লাভ হইল না। পুরী হইতে আমরা কটকে ফিরিলাম। কটকে আট-নয়দিন অভিনয় চলিয়াছিল; এবং এই পুরী অভিযানের লোকসান কতকটা পূরণ হইয়াছিল কটকে। পুরী এবং কটকে অভিনয় চলিলেও কলিকাতার অভিনয় একদিনও বন্ধ হয় নাই। দ্বিধাবিভক্ত সম্প্রদায়ের একাংশ উড়িষ্যা-বিজয়ে এবং অপরাংশ কলিকাতার বাজারে স্ব স্ব বিক্রম দেখাইত। কাহাকে কাহাকেও বা উভচরের ন্যায় দুই ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইতে হইত; অর্থাৎ শনি রবিবার এখানে অভিনয় করিয়া আমরা দুই-চারিজন কটকে যাইতাম; আবার শনিবারে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার অভিনয়ে যোগ দিতাম।

এই বৎসরে শ্রাবণের গোড়ায় ষ্টারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক 'রাণা প্রতাপ' খোলা হয়। 'তারাবাই'য়ের ব্ল্যাক ভার্সে সুবিধা হইল না দেখিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বোধহয় অতঃপর তাঁহার কোন ঐতিহাসিক নাটকে ব্ল্যাক ভার্স ব্যবহার করেন নাই। 'রাণা প্রতাপ' খুব ধুমধামের সহিত ষ্টারে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রধান প্রধান চরিত্রে কে কী সাজিয়াছিলেন, যতদূর মনে আছে, উল্লেখ করিতেছি।

রাণা প্রতাপ	...	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র
শক্তসিংহ	...	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
পৃথ্বীরাজ	...	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
মানসিংহ	...	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার
মেহেরউন্নিসা	...	শ্রীযুক্তা নরীসুন্দরী
দৌলত	...	৺বসন্তকুমারী

ইতিপূর্ব্বে রায় মহাশয়ের 'বিরহ' নাটিকা ষ্টারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। বোধহয় তাঁহার 'ত্র্যহস্পর্শ'ও ষ্টারে অভিনীত হয়। কিন্তু এই দুইখানি পুস্তক তাঁহাকে নাট্যকার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করে নাই। হাসির গানেই তখন রায় মহাশয়ের নাম; এবং এই হাসির গানেরই মালা গাঁথিয়া তিনি এই 'বিরহে'র গলায় পরাইয়া দেন। কমেডি হিসাবে 'বিরহ' তখনকার বাজারে মাঝামাঝি জমিয়াছিল। কাজেই সুখ্যাত নাট্যকার বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের তখন তাঁহার সুযোগ হয় নাই। দ্বিজুবাবু কমিক গান বাঁধেন ভাল; সাহিত্যের আসরে, শিক্ষিতের বৈঠকখানায় এই কথাটাই তখন অল্পবিস্তর আলোচনার মধ্যে মাথা চাগাড় দিতেছে। ইউনিকে যে 'তারাবাই' অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ নাম না-হইলেও, নাম খারাপ হয় নাই। একটা কথা এই রটিয়াছিল মাত্র—"এ আবার কে আসিলেন গো?" ষ্টারের তখন খুব জমজমাট নাম—বিশেষ, 'প্রতাপাদিত্যে'র পর ষ্টার যেন তা[হা]র পূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া মাথা উঁচু করিয়া বলিতেছে—"ওগো দেখ, আমরা এখনও মরি নাই, আমরা সেই ষ্টার-ই আছি।" এই অবস্থায় ষ্টারের বিজ্ঞাপনীতে যখন প্রথম প্রচারিত হইল—"ডি. এল্. রায়ের রাণা প্রতাপ", তখন ষ্টারের প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের আলোকচ্ছটায় 'রাণা প্রতাপ' ও তাহার প্রণেতার নাম লোকচক্ষে জল্‌জল্ করিয়া উঠিল। সকলেই মনে করিলেন ষ্টার যখন এই নাটক বাছিয়া লইয়া মহলা দিয়া খুলিতেছেন, তখন না-জানি ইহাতে "কতেক মধু আছে গো!" একদিন ষ্টারের এইরূপ প্রতিষ্ঠাই ছিল বটে। ষ্টার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, মরিয়াছে—কিন্তু সে যাহাই করিয়াছে তাহারই মধ্যে তাহার একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য বরাবরই রক্ষা করিয়া গিয়াছে। তাই, অতি দুর্দ্দশায়ও ষ্টার ঐ 'রাণা প্রতাপে'রই মত না-খাইয়া শুকাইয়াছে, তবু মোগলকে আত্মসমর্পণ করে নাই;—অর্থাৎ বিডন ষ্ট্রীট থিয়েটারের মত সমস্ত রাত্রি অভিনয় করিয়া কিংবা উপহার দিয়া কখনও থিয়েটারের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। আর্টের জন্ত এই যে ত্যাগ, এই যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা,

এই যে আভিজাত্যের অভিমান, ইহা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ষ্টারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

খুব ধুমধামের সহিতই 'রাণা প্রতাপ' ষ্টারে প্রথম অভিনীত হইল। তারিখটা বোধহয় ৬ই শ্রাবণ ১৩১২ সাল। 'প্রতাপাদিত্যে'র গরম আসরে, সুর তাহার অপেক্ষা নরম হইলেও, 'রাণা প্রতাপ' একেবারে বেসুরা হইল না। ইহা একরকম জমিল, কিন্তু ইহার অভিনয়কে উপলক্ষ্য করিয়াই দ্বিজুবাবুর সহিত ষ্টারের মনোমালিন্য ঘটিল। সকলেই বোধহয় জানেন, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের "হলদীঘাটের যুদ্ধ" নামে একটী কবিতা আছে। এমনও একদিন ছিল যখন এই কবিতাটী অনেকের মুখে মুখে ফিরিত। ষ্টারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য্য অমৃতবাবু, নাটকীয় রাণা প্রতাপের হলদীঘাটে গিরিশবাবুর এই কবিতাটী তিনটী কি চারিটী বিভিন্ন দূতের মুখে যুদ্ধবর্ণনাচ্ছলে জুড়িয়া দেন। ইহাতেই আগুন জ্বলে। কারণ, এই জোড়াটা রায় মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। শুনিয়াছি, অমৃতবাবু নাকি বলিয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুর কবিতা দিয়া নাটকের মর্য্যাদা তিনি বাড়াইয়াছেন, কমান নাই। কথাটা যাহাই হউক এবং যেভাবেই হউক, প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পরেই রায় মহাশয় ষ্টারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। মিনার্ভার স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত 'তারাবাই' উপলক্ষ্যে দ্বিজুবাবুর পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। দ্বিজুবাবু রবিবারেই মহেন্দ্রবাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'রাণা প্রতাপ' মিনার্ভায় অভিনয় করিতে হইবে; এবং অভিনয় করিতে হইবে ষ্টারের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতেই। মহেন্দ্রবাবু শনিবারে 'রাণা প্রতাপ' দেখিয়াছিলেন। তিনি সম্মত হইলেন। আমরা রাত্রে অভিনয় করিতেছি,—দেখি মহেন্দ্রবাবু খানকুড়ি 'রাণা প্রতাপ' বই লইয়া উপস্থিত—সঙ্গে রায় মহাশয়। অনেক আলোচনা আন্দোলনের পর স্থির হইল সামনের শনিবারেই আমরা 'রাণা প্রতাপ' খুলিব। মিনার্ভার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যোগসূত্রের নাটকীয় অঙ্কুর ইহাই।

আমাদের এখানে 'রাণা প্রতাপে'র প্রথম অভিনয়ে ভূমিকা নির্ব্বাচন হইয়াছিল এইরূপ :

রাণা প্রতাপ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
শক্তসিংহ	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পৃথীরাজ	...	৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
মানসিংহ	...	৺মহীন্দ্রনাথ মণ্ডল
আকবর	...	৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খাঁদুবাবু)

সেলিম	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
পুরোহিত	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
যোশীবাই	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
মেহের	...	৺সুশীলাবালা
দৌলৎ	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
ইরা	...	শ্রীযুক্তা ভূষণকুমারী
লক্ষ্মী	...	শ্রীযুক্তা সুধীরাবালা (পটল)

আমাদের এখানে "হলদীঘাটের যুদ্ধ" আর দূতমুখে দেওয়া হয় নাই। অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা হিসাবে মহাকবি গিরিশচন্দ্র নিজেই দুই-চারি রাত্রি "হলদীঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। 'রাণা প্রতাপে'র বিশেষ আকর্ষণ হইবে বলিয়াই আমরা এই "ঠেক্‌নো" দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কারণ, ষ্টারের সহিত পাল্লা দিয়া অভিনয় করা সে সময়ে একটা দুঃসাহসিক কাজ বলিয়াই গণ্য হইত। এ প্রতিযোগিতার সমরে আমরা ঠিক জিতিতে পারি নাই, হারিয়াছিলাম; তবে যে ক্ষেত্রে অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসু তরবারি ধরিয়াছিলেন সেখানে আমাদের হারিলে লজ্জা নাই—গৌরব; এবং গৌরব মনে করিয়াই দানীবাবু রাণা প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করেন, ও আমরা—নূতন কর্ম্মীর দল—ইহাতে সাজিতে কোমর বাঁধি। প্রথম অভিনয় রাত্রে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নাম দুইটী ভূমিকাতে দেখিবেন; তাহার কারণ কী, বলিয়া রাখি; দৌলতউন্নিসার ভূমিকা দেওয়া হয় স্বর্গীয়া কিরণবালাকে। প্রথম অভিনয়ের দিনই বৈকালে খবর পাই তাহার অসুখ; কিন্তু তখন আমরা মনে করিতে পারি নাই সে আসিবে না। তাহার নিকট গাড়ী গিয়াছে, ফেরে নাই; আমরা প্রস্তুত হইতেছি, কনসার্ট বাজিতেছে, এমন সময় খবর আসিল সে একেবারেই উঠিতে পারিতেছে না, তাহার আসা অসম্ভব। ভিতরে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে; এদিকে যথাক্রমে দুইবার কনসার্ট বাজিয়া ড্রপ উঠিয়াছে। প্রতিযোগিতায় অভিনয়,—মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—এত বড় একটা দুরূহ ভূমিকা—হঠাৎ কে দাঁড়াইবে? তখন রঙ্গমঞ্চের উপর পৃথ্বীরাজ ও যোশীবাইয়ের অভিনয় চলিতেছে। ভিতরে মনোমোহনবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং আরও দুই-চারিজন আমরা পরামর্শ করিতেছি, কী করা হইবে, কী করা উচিত। কথা উঠিল,—এক পারে তারা; সে যদি সম্মত হয়, তাহা হইলেই আজিকার ফাঁড়া কাটে। প্রোগ্রাম দেখা হইল; দেখা গেল, যোশীবাই ও দৌলতে দেখা সাক্ষাৎ নাই। তারা যোশী অভিনয় করিয়া যেমন ভিতরে আসিয়াছে, মনোমোহনবাবু কি

মহেন্দ্রবাবু (ঠিক মনে নাই) তারাকে বলিলেন, "ভাই, শীঘ্র এ পোষাকটা ছেড়ে দৌলতের পোশাকটা পরতে হবে।"

তারা বলিল, "ব্যাপার কি ?" ব্যাপার যে কী, তাহা তাহাকে বুঝাইবারও তখন সময় নাই। কিরণের অসুখের কথা সে শুনিয়াছিল, ব্যাপার বুঝিতেও তাহার বাকী রহিল না ; কারণ রঙ্গালয়ে কাজ করিতে হইলে মাঝে মাঝে যে এরূপ ঘটনার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, এ কথাটা তাহার অজানা ছিল না। তারাসুন্দরী এ রাত্রে যোশী ও দৌলৎ এই দুই ভূমিকাই অভিনয় করিল, এবং তাহার এই দুই চরিত্রের অভিব্যক্তিই অপূর্ব্ব। একেবারে আনকোরা নূতন ভূমিকা লইয়া যে তারা অভিনয় করিয়াছে, এ কথা দর্শক বুঝিতেই পারিলেন না, অধিকন্তু সকলের ধারণা হইল, প্রতিযোগিতায় বাজী জিতিবার জন্যই আমরা এই আয়োজন করিয়াছি।

'রাণা প্রতাপে'র রিহার্স্যাল সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা এখানে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পাঁচ দিনে এত বড় একখানা নাটক অভিনয় করা, বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—তখনকার দিনে এবং এখনকার দিনেও একটা অসম্ভব ব্যাপার। ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া পড়ে, যদি অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হয়। কিন্তু আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, আর সে অভিনয় অ-সুন্দরও হয় নাই। এই পাঁচ দিন আমরা, কি অভিনেতা কি অভিনেত্রী, অধিকাংশই বাড়ী যাই নাই। নূতনে পুরাতনে দ্বন্দ্ব—সে কী উৎসাহ! সোমবারেই বই পড়া হইয়াছে, সোমবারেই বই কিছু কিছু কাটাছাঁটা হইয়াছে ; কিন্তু ভাল করিয়া ছাঁটিতে পারা যায় নাই, কী জানি রায় মহাশয় যদি এখানেও ষ্টারের মত মর্ম্মপীড়া পান। সোমবারে রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল ; গিরিশচন্দ্র স্বয়ং রিহার্স্যালে বসিলেন। রায় মহাশয়ও উপস্থিত। অভিনেতা অভিনেত্রীরা এক একখানি 'রাণা প্রতাপ' হাতে বসিয়া। রিহার্স্যাল আরম্ভের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়কে বলিলেন—"রিহার্স্যাল তবে আপনিই আরম্ভ করুন। আপনার লেখা আপনি পড়িয়া দিন।" দ্বিজুবাবু বলিলেন—"সে কি কথা ? যেখানে আপনি ও অর্দ্ধেন্দুশেখর উপস্থিত, সেখানে আমি কি রিহার্স্যাল দিব ? আপনিই রিহার্স্যাল দিন, আমি বরং শুনি।"

রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল। তখনকার সে রিহার্স্যাল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সম্মুখের চেয়ারে গিরিশচন্দ্র,—পুরুষ-সিংহ ; পার্শ্বে দ্বিজেন্দ্রলাল, শান্ত—সৌম্য—সুন্দর ; তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই দুই-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ; একপার্শ্বে একটা কাঠগড়ার মত উঁচু ষ্ট্যাণ্ড, তাহাতে ভর দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর দাঁড়াইয়া ; মনোমোহনবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার দুই-একজন ব্যবহারজীবী বন্ধু—সকলে বসিয়া ; জমজমাট আসর,

—দক্ষিণে বামে আমরা অভিনেতারা সুবোধ ছাত্রের মত বসিয়া—কিছু দূরে সম্মুখের বরাসে অভিনেত্রীদল। সূচীপতনেরও শব্দ হয়, স্থান এমনই নিস্তব্ধ। গিরিশচন্দ্র রিহার্স্যালে বসিলে রিহার্স্যালের আসর এমনি জমিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র যে রিহার্স্যালের আসরে, সেখানে তদানীন্তন কত মহা মহা রথী, কত সাহিত্যিক, কত নাট্যকার এবং কত সমালোচককে কতদিন এমনি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। হায়! বাঙ্গলা থিয়েটার সে গৌরবের আসর আর কখনও দেখিবে কিনা কে জানে!

ঘণ্টা দুই রিহার্স্যাল শোনার পর রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন। প্রথম দিনের রিহার্স্যাল দেখিয়াই বলিলেন, "চমৎকার হবে!" দ্বিতীয় দিনের রিহার্স্যালেও যথা-সময়ে সকলে আসিলেন; রায় মহাশয়ও উপস্থিত। তৃতীয় অঙ্কের একটা দৃশ্যে সেলিম শক্তসিংহকে লাথি মারিত। এই লাথি মারা লইয়া সেদিন একটু আলোচনা হইয়াছিল। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়মশায়, এ লাথির জের মেটালেন কোথায়?" দ্বিজুবাবু বলিলেন, "এ লাথির আমি শোধ লইয়াছি, পঞ্চম অঙ্কে শক্তসিংহকে দিয়া সেলিমকে পদাঘাত করাইয়া।" গিরিশবাবু বলিলেন, "আপনার খুব সাহস; ঐ দুই লাথিতেই আমার কলম কিন্তু বন্ধ হইয়া যাইত।"

গিরিশচন্দ্রের লেখনী কিভাবে বন্ধ হইত জানি না, কিন্তু প্রথম অভিনয় রাত্রের পর আমরা একটা লাথি মারা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; সে ঐ তৃতীয় অঙ্কের লাথির প্রতিঘাতের পদাঘাত,—যাহা একদিন মাত্র অভিনয় করিয়াছিলাম পঞ্চম অঙ্কের একটা দৃশ্যে।

দৃশ্যটা এই,—সেলিম বিবাহ করিতে যাইতেছে, মহা উৎসব; পথে নাগরিক-গণ দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মাঝখান হইতে শক্তসিংহ ধূমকেতুর মত বাহির হইয়া সেলিমকে একটা লাথি মারিল। রিহার্স্যালের সময় এই দৃশ্যটা 'ম্যানেজ' করা বড় শক্ত হইয়াছিল। সেলিম বিবাহ করিতে যাইবে কী চড়িয়া—হাতী, ঘোড়া, উট, তাঞ্জাম, না হাঁটিয়া? যদি ঘোড়া কিংবা হাতীতে যায়, শক্তকে লাথি ছুঁড়িয়া মারিতে হয়, নচেৎ শক্তের পা সে পর্য্যন্ত পৌছায় না! যদি তাঞ্জামে যায়, সেও বিভ্রাট! সেলিমের তাঞ্জাম, লোক লস্কর তো আছেই, অন্ততঃ উহা ষোল বেহা-রার তাঞ্জাম হওয়া উচিত, তা[হা]র উপর দুই-দশজন পাহারাদার থাকাও সম্ভব এবং তাহাদের হাতে তলোয়ার থাকাটাও অশোভন নয়। আমি শক্তসিংহ—মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। শেষকালে স্থির হইল, "একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া কোন রকমে লাথি তো মার, না-হয় সেলিম লাথির খাতিরে হাঁটিয়াই আসিবে।" প্রথম রাত্রে সেলিম হাঁটিয়াই আসিয়াছিল—আমিও লাথি মারিয়াছিলাম। আহা—

সেদিনের সেলিমের যে কী দুর্দ্দশা ! বেচারী ভারতসম্রাটের পুত্র, অভিভাবক শূন্য, লাথি খাইয়া মুখটী তো চুণ !

শক্তসিংহ পথের মাঝে সেলিমকে লাথি মারিতেই প্রথম রাত্রেই দর্শক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; দ্বিতীয় রাত্রে কিন্তু সে প্রহসনের পুনরভিনয়ে আমরা সাহস করি নাই। এবং রায় মহাশয়ও তাহাতে মর্ম্মপীড়া পান নাই, বরং বলিয়াছিলেন, "আমি ওটা বুঝতে পারি নি, আপনারা বেশ করেছেন।"

ষ্টার প্রথম হইতেই দৃশ্যটী বাদ দিয়াছিলেন।

প্রথম সংস্করণের 'রাণা প্রতাপ' পুস্তকের এই লাথি মারার ব্যাপারটা, যাহা প্রকাশ্যভাবে ষ্টেজের উপরেই ঘটিবে লিখিত ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে দেখিতেছি সে ঘটনাটীকে নেপথ্যজাত করা হইয়াছে।

ইহা রায় মহাশয়ের মহত্ত্বের নিদর্শন। এমন কত মহত্ত্বই তাঁ[হা]র দেখিয়াছি। কোন যুক্তিপূর্ণ কথা তিনি অগ্রাহ্য করিতেন না নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য। শুনিয়াছি তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, ক্ষীরোদবাবুর 'প্রতাপাদিত্য' দেখিয়াই তাঁহার 'রাণা প্রতাপ' লিখিবার ইচ্ছা হয়।

আর একটা দৃশ্যের কথা কহিয়া আমরা 'রাণা প্রতাপে'র রিহার্স্যাল কাহিনী শেষ করিব। 'রাণা প্রতাপে'র শেষাংশের একটা দৃশ্যে আকবর-কন্যা মেহেরউন্নিসা রাণা প্রতাপের কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লয় এবং ইরার সঙ্গে সখিত্ববশতঃ ইরার এক বিছানায় উঠে বসে, যেন এক পরিবারভুক্ত। রিহার্স্যাল দিতে দিতে গিরিশ-বাবু বলেন, "আজিকালিকার এই রাজনৈতিক সমস্যার দিনে হিন্দু মুসলমানের মিলন ব্যাপারে এ দৃশ্যটা চমকপ্রদ হইতে পারে এবং দর্শকও হাততালি দিতে পারেন, কিন্তু আমি প্রতাপসিংহ হইলে তালগাছে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিয়া মরিতাম। এ এখনকার দিনে কোন 'বাঙ্গালী' রাণা প্রতাপে হয়তো সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু 'রাজপুতনা'র রাণা প্রতাপে যে ইহা সম্ভব তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।"

এইরূপ বিপদে পড়িয়া গিরিশবাবু বহু পূর্ব্বে যে কাণ্ড করিয়াছিলেন, এই-খানে সেই ঘটনার উল্লেখ না-করিয়া পারিলাম না। বহু পূর্ব্বে 'অশ্রুমতী' নাটকে ঘটনাক্রমে তাঁহাকে একদিন রাণা প্রতাপ সাজিতে হইয়াছিল। দুই অঙ্ক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নেপথ্য হইতে হঠাৎ গিরিশবাবু শুনিলেন রাণা প্রতাপের কন্যা সেলিমকে ভালবাসিয়াছে এবং তাহার জন্য হা-হুতাশ করিতেছে। গিরিশবাবু তাহাই শুনিয়া, কাহাকেও কিছু না-বলিয়া, প্রতাপ-সাজা অবস্থাতেই বাড়ি চলিয়া যান। এদিকে খোঁজ খোঁজ রব,—কোথায় গিরিশচন্দ্র। পরদিন থিয়েটারের কর্ত্তৃ-

পক্ষগণ গিরিশচন্দ্রের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কী ?" গিরিশবাবু বলিলেন, "ব্যাপার—আগে তো জানতাম না যে, প্রতাপসিংহের মেয়ে সেলিমের জন্ত পাগল, তা হ'লে কি সাজতে যাই, কাজেই পালিয়ে এসেছি ! ব'লে এলে তো আসতে দিতে না।"

এত করিয়াও কিন্তু 'রাণা প্রতাপ' আমরা বিক্রয়ের দিক দিয়া জমাইতে পারি নাই। ইহার উপর্যুপরি তিন রাত্রির বিক্রয় দেখিয়া পাঠক বুঝিবেন যে, তখনকার মিনার্ভা ও 'রাণা প্রতাপে'র অবস্থা কী ; অথচ তখন স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ। 'রাণা প্রতাপে'র প্রথম অভিনয় রজনীর বিক্রয় ৩৭৪৲ টাকা। দ্বিতীয় রাত্রি ৩৬৭৲, তৃতীয় রাত্রি ৩৩৫৲ এবং ইহার অঙ্কপাত ক্রমশঃ আরও কম।

'রাণা প্রতাপ' টেঁক খাইল না, গিরিশচন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। ষ্টারে 'রাণা প্রতাপ' বিজ্ঞাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপ অবলম্বনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নাটকের দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত লেখাও হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু আমরা শুনিয়াওছি ; কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন যে, ষ্টার একখানি 'রাণা প্রতাপ লইয়া অগ্রসর হইয়াছে তখন তিনি তাঁহার সেই লিখিত অংশ ফেলিয়া দেন ; বলেন, "বই লিখে আর প্রতিযোগিতা ক'রব না।" এরূপ ঘটনা রঙ্গমঞ্চে বিরল নয়। ইহার বহু পুর্ব্বে অমৃতবাবু ষ্টারের জন্ত 'সীতারাম' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতেছিলেন ; কিন্তু তিনি যেই শুনিলেন, মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' খুলিবার আয়োজন করিয়াছেন, অমনি তাঁহার 'সীতারাম' লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইহার পরেই গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিতে আরম্ভ করেন। মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে 'রাণা প্রতাপ' নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় মরিল দেখিয়া তিনি মুরশিদাবাদের ভগ্ন কবর হইতে বাঙ্গলার নবাব সিরাজকে খুঁড়িয়া বাহির করিলেন।

এই 'সিরাজদ্দৌলা' হইতেই মিনার্ভার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌভাগ্যের সূত্রপাত। এই 'সিরাজদ্দৌলা' হইতেই বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি পূর্ব্বাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া এক অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল ; এবং তাহার খরস্রোত বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গলার নাট্যশালাকে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। অবশ্য এখানে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ভিন্নমুখী স্রোত, এই যে প্লাবন, ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্যে'। 'প্রতাপাদিত্যে'র পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গলার নাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটক স্থান পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের অমন যে ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড', যাহার অভিনয় হইয়াছিল অতুলনীয়,

তাহাও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইতে পারে নাই। বহু পূর্ব্বে—বাঙ্গলার নাট্যশালা সৃষ্টির আদি দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম সৃষ্টি করেন। তাঁহার 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী', 'পুরু-বিক্রম'—যাহা এক সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে খুব সমারোহের সহিত অভিনীত হইত—বাঙ্গলায় একটা নূতন সাড়া আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার রচিত গান "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ",

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান!"

প্রভৃতি একদিন বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত। এই যুগেই গ্রেট ন্যাশানালেও দুই-একখানি ঐতিহাসিক নাটকের সহিত দর্শকের দেখাশুনা হইয়াছিল। এই যুগে ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ঐতিহাসিক নাটক 'হাম্মীর' অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার পর প্রায় পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর বাঙ্গলার কোন নাট্যশালায় এক 'চণ্ড' ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কোন ঐতিহাসিক নাটক আমরা দেখি নাই। বহুকাল পরে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে এই যে ঐতিহাসিক নাটকের অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা, ইহার কারণ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে এখন হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বকার সেই অতীত যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বাঙ্গলাদেশের এক মহাস্মরণীয় যুগ। এই যুগের সর্ব্ববিবর্ত্তনের মধ্যে বাঙ্গলা নাট্যশালা তাহার যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু এই বিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিবার আগে, আমরা সংক্ষেপে তাহার পূর্ব্বযুগের বাঙ্গলা নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কথা কিছু বলিব। কারণ সে কথা না-বলিলে, পাঠক বুঝিতে পারিবেন না যে, তদানীন্তন নাট্যশালায় অবস্থা কী ছিল, এবং কীভাবে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই নাট্যসাহিত্যের পরিবর্ত্তন ও গঠনে মহাকবি গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণের হাত ছিল কতটা,—এবং ইহাতে কৃতিত্ব কাহার কতখানি প্রাপ্য। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, এদেশের নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্য প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বাবয়ব-পুষ্ট হইয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই গিরিশ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠককে নাট্যশালার ইতিহাসের একটা মোটামুটী চিত্র দিবার চেষ্টা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি।

ইহাতে বিস্তৃত বিশ্লেষণ না-থাকিলেও, ভবিষ্যতে যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগের সূত্র ধরিবার পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে—এ কথাটা বিনা সঙ্কোচেই মনে করিতে পারি। এই সঙ্গে আশা করি এখনকার পাঠক, তখনকার সময়েরও একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

এদেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, তখন দেশে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী ভাব, ইংরাজী চিন্তা, ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী আচার ব্যবহার নিষ্ঠা, বাঙ্গলার অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শত দিক হইতে নড়াইয়া দিয়াছে; বাঙ্গালী জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকল দিকেই বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সাহিত্যও এই সময়েই নব কলেবর ধারণ করে। বহুবিবাহে বিতৃষ্ণা, বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি নব নব আচার এই সময়েই ইহার বহুদিনের অন্ধ সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। অখাদ্য ভোজন, বিলাত গমন, অস্পৃশ্যতা নিবারণের দুঃসাহস এই সময়েই আমরা লক্ষ্য করি। তাহার ধর্ম্মজীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী এই সময়েই বুঝিতে আরম্ভ করে যে, পৌত্তলিকতা মহাপাপ। ইংরাজী শিক্ষায় ধনুর্দ্ধর যাহারা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার পূর্ব্বাপর হইতেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জন্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন; তাই কৃষ্ণ বন্দ্যো, মাইকেল, কালীবন্দ্যো, বাঙ্গালী হইয়াও খ্রীষ্টান। রাজনৈতিক জগতে বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে সাহিত্যে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই সুর ধরিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে।" তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে বলিলেন, "পৌত্তলিক বলিয়া মাথা হেঁট করিও না, তোমার মাটীর দশভূজা দুর্গা তোমার মা, তোমার জন্মভূমি।" এই যুগেই রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের স্কন্ধে লইয়া 'নববিধানে'র সৃষ্টি করিলেন আচার্য কেশবচন্দ্র। খ্রীষ্টান হইবার যে স্রোত বহিতেছিল—তাহাতে ভাঁটা ধরিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের এ ধর্ম্মও হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ঠিক খাপ খাইল না। ইহা না ইংরাজী না হিন্দু, এইরূপ একটা উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল মাত্র। যে সকল শিক্ষিতের দল পুরাপুরি সাহেবিয়ানা বজায় রাখিয়া হিন্দু হইবার বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেশবকে ত্যাগ করিয়া 'সাধারণে'র পতাকা উড়াইলেন। এই সর্ব্ববিধ খণ্ড-বিপ্লবের ঘোর আবর্ত্তনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে এক কৌপীনমাত্র-সার পূজারী ব্রাহ্মণ সমন্বয়ের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবনে যে বিপ্লব বহিতেছিল, তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। **Salvation**

Army-র মৃদঙ্গ ও করতালের মধ্যে নববিধানের মৃদঙ্গ সুর মিশাইল। এই যে বিপ্লবের যুগ, ইহাতে বাঙ্গলা নাট্যশালায় প্রকাশভঙ্গী কীভাবে হইয়াছিল—সেই কথাই বলিতেছি।

প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় (Public Theatre) খোলা হয় দীনবন্ধুবাবুর 'নীল-দর্পণ' লইয়া। স্রোত মন্দ, নদী ক্ষীণতোয়া। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', 'কৃষ্ণ-কুমারী', দীনবন্ধুর কয়েকখানি নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কয়েকখানি উপন্যাস, ইহাই তখনকার রঙ্গালয়ে পুনঃপুনঃ অভিনীত হইত। খাদ্য সুমিষ্ট—উপাদেয়, কিন্তু পৌনঃপুনিক অভিনয়-হেতু ক্রমশঃ তাহা দর্শকের অরুচিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। দর্শক নূতনের প্রয়াসী ; কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র অনুর্ব্বর, রসের হাটে দুর্ভিক্ষ ! শেষে এমন হইল—খাদ্যের বিচার রহিল না। রঙ্গমঞ্চে অনেক নূতন নাট্যকার দেখা দিলেন ; বাঙ্গলা ভাষার লেখকগণের নামের তালিকা খুঁজিলে তাঁহাদের অনেকেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কাল সেই সব গ্রন্থকারের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। সান্যালবাড়ীর থিয়েটার খোলার দুই-চারি সপ্তাহ পরেই গিরিশচন্দ্র দিনকয়েকের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়া ছিলেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে তখন তিনি ইহাতে যোগ দেন নাই। ইহার ছয়-সাত বৎসর পরে তিনি থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন ; এই কয়টা বৎসরই বাঙ্গলা থিয়েটারের একপ্রকার অন্ধকারের যুগ ; পাঠক পূর্ব্বে ইহার কিছু পরিচয়ও পাইয়াছেন। এখনকার গিরিশচন্দ্র কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নহেন, অভিনেতা গিরিশচন্দ্র মাত্র,—শুধু অভিনেতা নহেন, শিক্ষক গিরিশচন্দ্র, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র। বয়সে, আকারে, বিদ্যায়, প্রতিভায় গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার আদি নাট্যশালার—ন্যাশা-নালের—সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী ! অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে জানাইয়া দিল যে, এই বিকাশোন্মুখ আলোকরেখা আপনার প্রদীপ্ত তেজে একদিন বাঙ্গলার নাট্যগগনকে সমুদ্ভাসিত করিবে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের পুস্তক ফুরাইল, অপ্রথিতযশা যে সকল নব অভিযানকারী নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গালয় দখল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়োপযোগী চরিত্র কিছুই থাকিত না। এদিকে দর্শকের নাটক উপভোগের ক্ষুধা নাট্যশালার বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে ; 'সধবার একাদশী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'নীলদর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা' পুরাতনের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। দর্শক বলিতেছেন, নূতন কী আছে দেখাও, নূতন কী আছে দাও !

অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বিভ্রান্ত। সহকর্মী এক একজন দিগ্বিজয়ী অভিনেতা ; আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর ভরতের ন্যায় অভিনয়কলা-কুশল। সুকণ্ঠ অমৃতলাল মিত্র, প্রিয়দর্শন মহেন্দ্রলাল, তীক্ষ্ণধী সুরসিক ভূনীবাবু (নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু), বিবিধ রসাভিনয়-পটু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কাপ্তেন বেল (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়), সহ-সহোদর কলাবিদ্ নগেন্দ্র বন্দ্যো, সুগায়ক রাধামাধব কর, শক্তিধর মতি সুর প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ এক একজন এক এক বিভাগে দিক্পাল! ইঁহাদের অভিনয়োপযোগী নাটক না-পাইলে অভিনয় করিয়া তৃপ্তি কোথায়? একদিকে দর্শকবৃন্দের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে এই অভিনেতৃবৃন্দের অতুলনীয় প্রতিভা ;—পূজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বাণীর চরণে নিবেদন করিবার নৈবেদ্যের অভাব ; পুরোহিত গিরিশচন্দ্র অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রতিভা তো কখনও অভাবের আবেষ্টনে অবরুদ্ধ থাকে না,—সে আপনার পথ আবিষ্কার করিয়া লইল। এই শুভ অবসরে, নিতান্ত প্রয়োজনে, নাট্যভারতীর চরণে প্রণাম করিয়া ভয়-ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে গিরিশচন্দ্র লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গলায় নাট্যশালার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের এই লেখনীধারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্মরণীয় ঘটনা।

প্রায় বত্রিশ কি তেত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের জন্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন ; এবং আটষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের সঙ্গে এই লেখনী বিরাম লাভ করে। এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় শতাধিক নাটক, গীতিনাটক, প্রহসন প্রণয়ন করিয়াছেন। এইদিন হইতে তাঁহার জীবদ্দশায় বাঙ্গলার দর্শকবৃন্দকে কখনও নূতন নাটকের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'আনন্দ রহো', প্রথম গীতিনাটক 'আগমনী'। তিনি মুখে মুখে এমন অনেক প্রহসন ও ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছিলেন যাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলেও ছাপাখানার ছাপ লইয়া কখনও পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ গিরিশচন্দ্রের নিকট কী পরিমাণে ঋণী, তাহা গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আভাস দিবার চেষ্টা করিব মাত্র। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে, ধর্ম্মজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব, রঙ্গমঞ্চ হইতে আমি যেভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, আপনাদিগকে সেই পুরাতন কথা কিছু শুনাইব।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যখন এই ধারাবাহিক অভিনয়প্রথা প্রচলিত হয়, তখন যাত্রা ও কীর্ত্তন এবং পাঁচালী প্রভৃতিরই প্রচলন ছিল। কথকতা, রামায়ণ

গান, ধর্ম্মের গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি তখন একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। ইংরাজী ভাষা ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া যেমন আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অনুসারে এদেশের ভাবকে যদি নাটকের ছাঁচে মূর্ত্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তাহা বাঙ্গালীর প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে—এই যে জাতীয় হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিবার শক্তি, ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে বাঙ্গালীর প্রাণের ভাব-বৈশিষ্ট্য কখনও হারাইয়া ফেলেন নাই। তিনি বাঙ্গলার প্রচলিত গান, গাথা, গল্প অবলম্বন করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। বাঙ্গালীর প্রাণের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়াই নাট্যসাহিত্যে তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই! তাঁহার পৌরাণিক নাটকের প্রথম পুস্তক 'রাবণবধ'। তাঁহার এই প্রথম নাটক অভিনয়ের পর হইতেই লোকে তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত। এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকের অভাব ঘটিয়াছে এ ঘটনা বোধহয় কষ্টে স্মরণ করিয়া বলিতে হয়। এইরূপ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গলাদেশে নাট্যমঞ্চের জন্মদাতারূপে তিনি চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া রহিবেন। এই অধিকারবলেই তিনি—কলিকাতা সহরের একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান গিরিশচন্দ্র—চারি-পাঁচটী নাট্যশালার সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। অতীতকালে নাট্য-পূজারীর পূজার আসন যদি গিরিশচন্দ্র এইরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়া না-যাইতেন, তবে আজ নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের যে কী অবস্থা হইত, তাহা কল্পনায় ধরিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, 'ভক্তমাল', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিত্য-পাঠ্য, নিত্য-পূজ্য গ্রন্থমালার অবদান-পরম্পরা হইতে একখানির পর একখানি করিয়া মণির পর মণি গাঁথিয়া—নাট্য-ভারতীর গলে তিনি যে অপরূপ মালা পরাইয়া দিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য—যতদিন বাঙ্গলার নাট্যশালা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠক-বৃন্দকে বিমোহিত এবং চমৎকৃত করিবে।

দেশের হৃদয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া যখনই প্রয়োজন হইয়াছে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে ভাবের স্রোতোমুখ তখনই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকাবলী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইতেছে—রামায়ণ প্রায় শেষ হয়-হয়, দর্শক চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছেন, রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীও চিন্তিত ; রামায়ণ, মহাভারতের স্রোত ফিরাইতে না-পারিলে দর্শকের সংখ্যা বাড়ে না, গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' লিখিলেন। সে কী সমারোহ, সে কী ভাববন্যার দু-কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস ! ইংরাজী শিক্ষার বিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর বিস্মৃত হৃদয়ে সে কী নবজাগরণের অরুণোদয় ! বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয়, ইংরাজী রুচিবাগীশ ভাবের প্রেরণায় সে কথা ভুলিয়া গেলেন। সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী আচারনিষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভক্তির পুণ্যস্পর্শে বারাঙ্গনা-স্পর্শ হীন বলিয়া মনে করিলেন না, —যে অভিনেত্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন —বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণস্পর্শে বাঙ্গলার নাট্যশালা তীর্থে পরিণত হইল ! অলক্ষ্যে—পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীকে মহাকাল জানাইয়া দিলেন, পরভাবানুকারী হইলেও বাঙ্গালী—বাঙ্গালী! তাহার অন্তরের অন্তর তাহার অজ্ঞাতে পাশ্চাত্য কলাবিদ্যার মোহকরী বসন দূরে ফেলিয়া—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রসমাধুর্য্যে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা সে নিজেই জানে না! নাট্যশালাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর এই নবজাগরণের পুরোহিত গিরিশচন্দ্র।

'চৈতন্যলীলা'র পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যেন পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। ইহার পরেই তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধ' দেখিয়া অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীতে বলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদপত্র যে কাজ করিয়াছে, —গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ্ঞ সুধীমাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাঙ্গলার এই যে দেশাত্মবোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের মোহাপসারণের চেষ্টা, ইহাতে অপাংক্তেয় বাঙ্গলার নাট্যশালার যে কতখানি দাবী আছে, বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্ব্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার প্রথম নাট্যশালার নাম ন্যাশানাল থিয়েটার ! ন্যাশানাল কংগ্রেস, ন্যাশানাল থিয়েটারের পরে সৃষ্ট। এদেশে নাট্যশালাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন বা ভবিষ্যতে করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। হেম[চন্দ্র] বন্দ্যো[পাধ্যায়ে]র "ভারত বিলাপ", "ভারতমাতা" এই ন্যাশানাল থিয়েটারের মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষিত অভিনেতৃমুখে উচ্চারিত হইয়া দর্শকহৃদয়ের যে লুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগাইয়া তুলিত, কে বলিতে পারে তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তরপুরুষগণ আজ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণের

অধিকারী হইয়াছেন কিনা ? যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি সন্তান-সম্প্রদায় উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত, যদি গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না-করিত, তাহা হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র এত সহজে, এত অনায়াসে আজ কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যান্ত আলোড়িত করিতে পারিত কিনা কে বলিবে ?

যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে, ভক্তি বিষয়ে, দেশাত্মবোধ বিষয়ে—তেমনই সামাজিক, গার্হস্থ্য, রূপক ও কাল্পনিক চিত্রেও গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'প্রফুল্ল', তাঁহার 'বলিদান', তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি', তাঁহার 'মুকুল মুঞ্জরা', তাঁহার 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবল' দর্শকের দৃষ্টি ও রুচি বদলাইয়া দিয়া গিয়াছে। নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য হইতেই গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের জীবনীশক্তিকে এইরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসিম', গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি [শিবাজী]' জাতীয় জীবন গঠনে কতটা সাহায্য করিয়াছে, আমরা এক এক করিয়া সেই কথা বলিব।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের উপর গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য—এ কথা বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বরং এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—ইহা অবিসম্বাদী সত্য। গিরিশচন্দ্রের পরেই বাঙ্গলার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল। তাঁহার লেখনী দেশে লোকশিক্ষার, সমাজশিক্ষার যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব ! অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' একখানি যুগপরিবর্ত্তনকারী প্রহসন ! প্রথম সাহেবীয়ানা অনুকরণ-প্রিয় বানরের মূর্ত্তি তিনি এই 'বিবাহ-বিভ্রাটে' গড়িয়াছেন ; কুলবধূহত্যাকারী বাঙ্গালী সমাজের অপূর্ব্ব চিত্র, বিচিত্র হইয়া ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ! তাঁহার ব্যঙ্গসাহিত্য রঙ্গমঞ্চের পরিপুষ্টনে গিরিশচন্দ্রের যোগ্য শিষ্যেরই পরিচয় দিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য় যখন মৃদঙ্গের ঘা পড়িল, বাঙ্গলার আর একজন নাট্যকার সেই সুরে সুর মিলাইয়া নাটক লিখিলেন। সে নাটক কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। সাহিত্য হিসাবে ইহার কোন মূল্য আছে কিনা জানি না ;—কিন্তু রঙ্গালয়ে দর্শক সৃষ্টি করিবার যা অসীম ক্ষমতা এই নাটকের দেখিয়াছি তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙ্গলার নাট্যশালার গঠনে রাজকৃষ্ণ রায় একজন একনিষ্ঠ সাধক। এই কীর্ত্তন-প্লাবনের যুগে স্বর্গীয় অতুল মিত্রের 'নন্দবিদায়' বাঙ্গালী দর্শককে কম মুগ্ধ করে নাই। ১৯০৪ সালের পর বাঙ্গলার নাট্যমঞ্চে গিরিশ-

চন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ ও অতুল মিত্রের প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই সময়েই আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় পাই।

খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-০৫। বাঙ্গলা জাগিয়াছে! কোনদিন এই অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাঙ্গালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী' —বাঙ্গলায় একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতামহ যে, একদিন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কুস্তীর আখড়ায় মাটী মাখিতে মাখিতে এখন সেই কথারই আলোচনা করে; বাঙ্গলার বারো ভুঁইয়া যে এই আমাদেরই মত বাঙ্গালীর জ্ঞাতভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহার পৈতৃক বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়স্বরূপ লাঠী খেলায় মাতিয়া উঠে; পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে সংঘবদ্ধ বাঙ্গলার যুবকের দল! এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সুদূর মার্হাট্টায়, মার্হাট্টা যুবক, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে; বাঙ্গালী বাঙ্গলার শ্যাম বনানীর অন্তরালে উৎসুক নেত্রে খুঁজিয়া দেখে—কোথায় বাঙ্গলার শিবাজী, কোথায় বাঙ্গলার তানোজী! ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, যশোহরের শার্দ্দূল-নিষেবিত বনপ্রান্তে, যশোরে-শ্বরীর ভগ্ন-মন্দির-প্রাঙ্গণে ছায়ামূর্ত্তি লইয়া এমনি দিনে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল, বঙ্গজ-কায়স্থ-কুল-তিলক, মোগল-গর্ব্ব-বিধ্বংসী-বীর প্রতাপাদিত্য রায়—যাঁহার সঙ্গে ফিরে বায়ান্ন হাজার বাঙ্গালী ঢালী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যাঁ[হা]র কালী, যাঁ[হা]র মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীর শঙ্কর—আর যাঁ[হা]র উগ্র তপস্যার ঐকান্তিকী কামনার ফল—বাঙ্গলার স্বাধীনতা! বাঙ্গলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য অত্যাচারী? কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু? বিষব্রণের মত সে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র পঙ্কিল গ্লানি সুন্দরবন হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া বঙ্গোপসাগরে ভাসাইয়া দিল! তাহার চক্ষে বাঙ্গলার নায়ক প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গলার বলবীর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ প্রতাপাদিত্য! বাঙ্গলা তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিল। কলিকাতায় পান্তীর মাঠে শিবাজী উৎসবের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের উৎসব হইল। এই শুভ অবসরে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' বীরকণ্ঠে—সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে উদাত্ত স্বরে গাহিল—'হয় যশোর—নয় মৃত্যু'! 'প্রতাপাদিত্য' নাটক

দেশের কী করিয়াছে, বাঙ্গলার উত্তরপুরুষগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসের যুগ আসিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। জাতীয় কংগ্রেস, নামে জাতীয় হইলেও, ইহা ভারতের অভিজাতবর্গের অনুষ্ঠান বলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজীনবীশ, ইংরাজী ভাবের ভাবুক, ইংরাজী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, ইংরাজী পার্লামেন্টের অনুচিকীর্ষু ভারতের গণ্যমান্য বরেণ্য বিত্তশালী বিদ্বান্-মণ্ডলী কংগ্রেসকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন দেশের পাণ্ডাল হইতে যে রাষ্ট্রিক স্বর যখন উঠিত, সংবাদপত্র মারফতে তাহা সুদূর পল্লীগ্রামে সঞ্চারিত হইলেও, পল্লীর প্রাণকে কখনও তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বাঙ্গলার প্রাণে এমন একটা আঘাত দিল, যে আঘাতে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, আইনজীবী ও হলধারী কৃষক এক সঙ্গেই যেন একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সহরে সে কী উন্মাদনা! অন্ধ, খঞ্জ, জীর্ণ, গলিতবাস ভিখারী তাহার সমস্ত দিনের অর্জ্জিত ভিক্ষার মুষ্টি উত্তেজনার আতিশয্যে সানন্দে জাতীয় তহবীলে দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল! গঙ্গাতীরে রাখীবন্ধন! কবীন্দ্র রবীন্দ্র গাহিলেন—"ভাই ভাই এক ঠাঁই!" দলে দলে স্বেচ্ছা-সেবক পাড়ায় পাড়ায় কান্তকবি রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে না ভাই" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরনারীরা হাতের স্বর্ণ শাঁখা ও রুলী দান করিয়া শাঁখ বাজাইলেন। ১৯০৫—বাঙ্গলা ইতিহাসের এই স্মরণীয় বর্ষ—বাঙ্গালীকে যাহা দান করিল, বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ সে দানের মহিমা কখনও ভুলিবে না। এই বৎসরেই বাঙ্গলার নায়ক সুরেন্দ্র বন্দ্যো[পাধ্যায়]—বাঙ্গলার অমুকুট রাজা বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। সে হ্যাটকোট নাই, সে বিলাতী বুটের মস্‌মস্ শব্দ নাই, উত্তরীয়মাত্র সম্বল, শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণসন্তানের কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র যেন তাঁহার বহু বর্ষের স্বেচ্ছাচারকে প্রায়শ্চিত্তপূত করিয়া তাঁহাকে জাতিতে তুলিয়া লইল! এই সময়েই নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির কথা, তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী, তাহার অতীত গৌরব ও অগৌরবের উজ্জ্বল ও মলিন চিত্র দর্শকের সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভৈরব-ভেরীর নির্ঘোষে বাঙ্গলার নাট্যশালা স্তম্ভিত হইল।

এইরূপে বাঙ্গলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙ্গালী জাতিকে, তাহার প্রাণের তারে যে স্বর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে স্বরে স্বর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন, মাতাইয়াছেন, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই, যেমন

বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র—দুই যুগাবতার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক না-হইলেও নাটকাকারে রঙ্গমঞ্চে দেশাত্মবোধ জাগরণে যে কাজ করিয়াছে, তাহারই বা তুলনা কোথায়? আমরা বঙ্কিম-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের কথা কহিব বলিয়া এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। নাটকের কথাই কহিতেছি, সেই কথাই বলি।

কিন্তু সিরাজ-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপনের পূর্ব্বে, থিয়েটারের ভিতরের কথা, আরও কিছু এইখানে বলিয়া রাখিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি। কাজেই নাট্যালোচনা ছাড়িয়া আপাততঃ আমাদিগকে থিয়েটারের পূর্ব্ব-কথা কিছু বলিতে হইতেছে।

ভাল দল হইলেই যে সব সময়ে থিয়েটার ভাল চলে তাহা নহে; ভাল নাটকই থিয়েটারের প্রাণ; ভাল দল তাহার অবয়ব। আবার ক্ষেত্র ভাল না-হইলে যেমন ভাল পরিপুষ্ট বীজেও ভাল গাছ হয় না, তেমনি আবার ভাল দল না-হইলে ভাল নাটকও জমে না। ভাল দল, ও ভাল নাটকের যখন একত্র যোগ হয় থিয়েটার তখনই উন্নতির চরম সীমায় উঠে। এবং এই সীমার স্থায়িত্বের উপরই থিয়েটারের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। হাতে কলমে বহুবার এ পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া, নিঃসঙ্কোচে এ কথা লিখিতে সাহস করিতেছি। পূর্বে বলিয়াছি 'বলিদান' নাটকে মিনার্ভার প্রতিষ্ঠা হয়; বাজারে মিনার্ভার একটা সুনাম বাহির হয় এই বলিয়া, যে, এ দল অভিনয় করিতে পারে ভাল। কিন্তু অর্থের দিক দিয়া মিনার্ভা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। অর্থের দিক দিয়া সুবিধা হইল, এই 'সিরাজদ্দৌলা' খুলিবার পর। যে সব নাটকে 'সিরাজদ্দৌলা' খুলিবার পূর্ব্বে দেড় শত দুই শত টাকা মাত্র বিক্রয় হইত, সেই সব নাটকের অভিনয়েই আবার এক হাজার, দেড় হাজার টাকা বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই একই নাটক অভিনীত হইয়াছে একই দল কর্তৃক। উদাহরণস্বরূপ একখানি নাটকের বিক্রয়ের তারতম্য কত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি।

গিরিশচন্দ্র এবারে মিনার্ভায় যোগদান করিবার কিছুদিন পরে আমরা মহাসমারোহে 'প্রফুল্ল' নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করি। বাছা বাছা অভিনেতা অভিনেত্রী তখন মিনার্ভার দলে; স্বয়ং গিরিশচন্দ্র—যোগেশ, জ্ঞানদা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী; দানীবাবু, স্বর্গীয়া সুশীলা, অর্দ্ধেন্দুশেখর, এবং নবীন কর্ম্মীর দল—কেহ বাদ নাই। কিন্তু সে মহা ধুমধামের আয়োজনেও বিক্রয় হইল—প্রথম রাত্রির 'প্রফুল্লে' মাত্র আড়াই শত টাকা। আবার থিয়েটার জমিয়া উঠার পর মিনার্ভার প্রতিষ্ঠা যখন চরম সীমায়, তখন এই 'প্রফুল্লে' বাদুড় ঝুলিতে দেখিয়াছি। গিরিশচন্দ্র

যোগেশ, রবিবার সন্ধ্যায় অভিনয়, বেলা দুইটা হইতে থিয়েটারে দর্শকের ভীড়—যেন রথযাত্রার লোকসমাগম!

গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' একটী অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু ছিল। প্রথম যখন 'প্রফুল্ল' খোলা হয়, তখন গিরিশচন্দ্র ইহাতে কোন পার্ট লয়েন নাই; তখন যোগেশ সাজিতেন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। কি উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র প্রথম যোগেশ সাজেন, সেই কথাটা এইখানে বলিয়া রাখিতেছি। এই প্রসঙ্গে পাঠক বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটক অভিনয়ের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

১২৯৬ সালে 'প্রফুল্ল' প্রথম ষ্টারে অভিনীত হয়। এ অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ষ্টারে সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'কে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করা হয়, এবং সে নাটকের নাম দেওয়া হয় 'সরলা'; কারণ 'সরলা'র মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনা লইয়া অমৃতবাবু 'স্বর্ণলতাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। এই 'সরলা' নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ধরনের সামাজিক নাটক বাঙ্গলার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। 'সরলা'র অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমানভাবেই চলিয়াছিল, এবং ষ্টার সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সামাজিক নাটকের এই আদর দেখিয়া ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণ গিরিশবাবুকে একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন; এই অনুরোধের ফল—'প্রফুল্ল'। বহু বিভিন্ন রসাত্মক চরিত্র লইয়া 'প্রফুল্ল' নাটকের গঠন। 'সরলা' অভিনয়ের সাফল্য দেখিয়া সাধারণের ও রঙ্গমঞ্চ সংশ্লিষ্ট অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল এমন করুণরসাত্মক নাটকের পর এরূপ ধরনের সামাজিক নাটক লিখিয়া আসর জমান সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু গিরিশবাবুর 'প্রফুল্ল' সত্যই আসর জমাইয়াছিল। 'সরলা'র তুলনায় 'প্রফুল্ল'র বিক্রী কম হইলেও সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্র ভিন্ন কাহারও সাধ্য ছিল না এমন নাটক লিখেন। ইহার অভিনয়ও হইয়াছিল অপূর্ব্ব।

ষ্টারে যোগেশ সাজিতেন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। অমৃতলালের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। করুণ ও বীর রসের অভিনয়ে তাঁহার সমান পটুতা ছিল; তিনি কথা কহিলে লোকের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত। "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" —করুণ মর্ম্মভেদী কণ্ঠে যখন অমৃতলাল ইহা বলিতেন তখন দর্শক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িত। অমৃতলালের যোগেশের অভিনয় দেখিয়া লোকে মনে করিত এমন যোগেশ অমৃতবাবু ভিন্ন আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় ষ্টারে 'প্রফুল্ল' গঠিত হয়। এই শিক্ষার ফলে ছোটখাট পার্ট হইতে বড় পার্ট

পর্য্যন্ত সমস্ত পার্টগুলি নির্খুঁতভাবে অভিনীত হইয়াছিল। ষ্টারের সকল অভিনয়ই তখন এমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইত যে, সাধারণের একটা ধারণাই ছিল প্রতিযোগিতায় আর কোন সম্প্রদায় তাহার কাছাকাছি অভিনয় করিতে সমর্থ হইবে না। এই 'প্রফুল্ল' খোলার প্রায় ছয় বৎসর পরে মিনার্ভা থিয়েটার সম্প্রদায় 'প্রফুল্ল' খুলিবার আয়োজন করেন। তখন ড্রামাটিক এ্যাক্টের বালাই ছিল না। ষ্টার সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া সিটী থিয়েটার মেছুয়াবাজারে বীণা রঙ্গমঞ্চে যখন 'সরলা' অভিনয় করেন, সেই সময় ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষেরা 'সরলা'র অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। সে বিচারে ষ্টার হারিয়া যান। কাজেই কোন নাটকের অভিনয় করিবার স্বত্ব কোন সম্প্রদায়বিশেষে আর আবদ্ধ থাকে না। মিনার্ভা বিপুল উদ্যমে অভিনয়ের প্রতিযোগিতায় আসরে নামিল। যোগেশের ভূমিকা দেওয়া হইল স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুকে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রলালও সুকণ্ঠ ছিলেন এবং করুণ রসের অভিনয়ে তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি ছিল অপরিসীম। এই কারণে তাঁহাকে তখন "ট্রেজিডিয়ান মহেন্দ্র বোস" বলা হইত। ষ্টারও তাঁহার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া উপেক্ষার ভাবেই এই সময়ে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। জোর কলমেই গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টারের হ্যাণ্ডবিলে লেখা হইল, "তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।" মিনার্ভার অধ্যক্ষ তখন গিরিশচন্দ্র। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় 'প্রফুল্ল'র রিহার্স্যাল চলিতেছিল। শিক্ষাকালে মহেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের মুখে যোগেশের ভূমিকার আবৃত্তি শুনিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "দেখুন, এই যোগেশের পার্টে সব দৃশ্যেই বোধহয় আপনি যেমন দেখাইতেছেন তেমনই অভিনয় করিতে পারি, কিন্তু 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' আপনার মুখে যেমন শুনছি, তেমনটী বা তার কাছাকাছিও আমি চেষ্টা ক'রেও পেরে উঠব না। প্রতিযোগিতায় শেষকালে বুড় বয়সে কি অমৃতের কাছে হেরে যাব। এ পার্টে তার খুব সুনাম।"

মিনার্ভায় তখন 'প্রফুল্ল' বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; মহেন্দ্রলালের যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তরে বলিবারও কিছুই নাই। কাজেই সম্প্রদায়স্থ সকলের অনুরোধে এবং নিতান্ত নিরুপায়ে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকেই যোগেশের ভূমিকা লইতে হইল। অমৃতলালও বলিলেন, "যদি হারি গুরুর কাছেই তো হারব, তাতে গৌরবই অধিক।"

এই দুই সম্প্রদায়ের অভিনয় লইয়া সহরে, বিশেষতঃ নাট্যামোদিগণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ কে হারে, কে জিনে? দুই থিয়েটারেই পূর্ব্ব হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইল। পুনরভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে

দুই থিয়েটারেই জনসমুদ্র। আবার দ্বিতীয় রজনীতে যাঁহারা ষ্টারের দর্শক তাঁহারা আসিলেন মিনার্ভায়; মিনার্ভার দর্শক গেলেন ষ্টারে। আমরাও দল বাঁধিয়া প্রথম রাত্রিতে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া দ্বিতীয় রজনীতে ষ্টারে গিয়েছিলাম, এবং তাহার জন্য চারি-পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতেই টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অভিনয়ে প্রত্যেক ভূমিকার তুলনায় সমালোচনা করিব না। শুধু যোগেশের কথাই বলিব, দর্শক হিসাবেই বলিব।

প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছিল যে, অমৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্ব্বে আমাদের খুব ভাল লাগিলেও তাঁহার এবারের যোগেশ সেখানে স্থান পাইল না। অমৃত-লালের ছবি গিরিশবাবু একেবারে বদলাইয়া দিলেন। অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুরের মাধুর্য্য ছিল—যাহা তাঁহার কণ্ঠেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটী তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদই ছিল। তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোন সুরের সংস্পর্শ তো ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গীতে, চাল-চলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে, আকারে, গাম্ভীর্য্যে গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যেন যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছেন; লিখিয়া আলোচনা করিয়া দুই অভিনেতার অভিনয়ের পার্থক্য কী তাহা ঠিক বোঝান যায় না। কণ্ঠস্বর তো বর্ণনায় ফোটে না। "একটা পয়সা দাও না"—ভিখারী যোগেশের এ উক্তি, এই হাত পাতিবার সময় তাঁহার মুখভঙ্গী, এই তো আর কালি কলমের সাহায্যে আঁকিয়া দেখান যায় না। গিরিশচন্দ্র যোগেশ সাজিয়া যে দৃশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন, মনে হইত যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া খেলিয়া চলিয়া গেল! সে অভিনয়ের অপূর্ব্বত্ব ও বিশেষত্ব বিচার করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য তখন ছিল না। সে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাহবা দিবার অবসরও তখন থাকিত না। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বিচার করিবার স্পৃহা তখন কোথায় আত্ম-গোপন করিত, তাহা দর্শক বুঝিতেও পারিতেন না। শুধু মনে হইত রঙ্গমঞ্চের উপর কী যেন কী একটা হইয়া গেল,—যাহা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের স্পন্দন আপনি দ্রুততর তালে নাচিয়াছে, সহজ নিঃশ্বাস মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, কণ্ঠ কখন রুদ্ধ হইয়াছে, চক্ষে অবিরল জলধারা, জ্ঞান ও চৈতন্য যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে! যেন যোগেশ, সকল দর্শকেরই অতি প্রিয় যোগেশ—

সকলের প্রাণে একটা হাহাকার তুলিয়া দুর্দশার নিম্নতম স্তরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছে। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে "মরচো মরো, আমিই তোমায় লাথি মেরে, মেরে ফেলেছি", সমস্ত বিয়োগান্ত নাটক যেন এই কয়টা অক্ষরের ছাঁদে মূর্ত্তি লইয়া দর্শকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তারপর "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" এই কথার মধ্যে শোকের সে প্রবাহ কোথায় লুকাইয়া ছিল ! শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না ! হৃদয় অকরুণার মাঝে করুণার ফল্গু এমনভাবে কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারে, তাহা যিনি গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখেন নাই, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার সাধ্যও নাই যে তাহার কণামাত্র আভাস পাঠককে দিই। গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, কর্ম্মবীর, স্নেহপরায়ণ, ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজী সভ্যতায় গঠিত মদ্যপের চূড়ান্ত পরিণামের সে ভয়োদ্দীপনকারী মূর্ত্তি, সহানুভূতির কোমল প্রলেপে মমত্বপূর্ণ যে জটিল চিত্র অভিনয়ে জীবন্ত দেখিয়াছি, তাহা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে। এ বিচিত্র অভিনয়প্রবাহে অমৃতলাল ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা অমৃতলালের গৌরব ; কারণ গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলে এপর্য্যন্ত অমৃতলালের মত যোগেশ আর দ্বিতীয় দেখি নাই।

অমৃতলালের অভিনয়ে বুঝা যাইত যে, যোগেশ তাহার এই শোচনীয় অবস্থা বিপর্য্যয় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া অভিনয় করিতেছে। গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া মনে হইত, কল্পনাতীত অবস্থান্তরের মধ্যে উপর্য্যুপরি আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রহারে হতচেতন হইয়া অবসাদে মোহে যেন সে তাহার সব ডুবাইয়া দিয়াছে ; অনুভব করিবার শক্তি বা হৃদয় তাহার নাই। বিস্মৃতির আবরণে তাহার কুয়াসাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে তাহার অতীত জীবন মাঝে মাঝে স্বপ্নচিত্রের মত তাহাকে দেখা দেয় মাত্র ; কিন্তু সে চিত্র সে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই যে অসহায়, এই যে আত্মবিস্মৃত, এই যে শোকাপহত যোগেশ, গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে আমরা এই যোগেশকেই দেখিতাম। সে যোগেশের অন্তরের রুদ্ধ বেগ উথলিয়া উঠিত "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" এই কথায় !

শুনিয়াছি পাশ্চাত্য দেশের রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির ভাষ্য ও বিশ্লেষণ দেখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সেক্সপীয়র পাঠার্থী উভয় সম্প্রদায়ই রঙ্গমঞ্চে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় দেখিয়া থাকেন। আমাদের দেশের সে অবস্থা এখনও হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যে কবে

যে সে শুভদিন আসিবে তাহা কল্পনা করিতেও সাহসে কুলায় না। যদি 'প্রফুল্ল' নাটক তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশেও তখনকার অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী, গিরিশচন্দ্রের অভিনীত যোগেশ দেখিয়া যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন। গিরিশচন্দ্রের যোগেশ—যোগেশ চরিত্রের একটী ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বলিয়া মনে হইত। ঈশ্বর-প্রত্যয় অপেক্ষা আত্ম-প্রত্যয় যোগেশ চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বলিয়াই আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যোগেশকে এক স্থলে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বলিয়াছি। কিন্তু 'প্রফুল্লে'র একস্থানে যোগেশ বলিতেছেন, "ভগবান মানুষকে একটী রত্ন দেন—সে সুনাম।" এই কথা এবং যোগেশের মুখে আরও দু-এক স্থানে ভগবানের নামোল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যোগেশ একেবারে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন নহেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় যোগেশের চরিত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া স্বর্গীয় পাঁচকড়িবাবুও যোগেশকে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বলিয়াছেন। আমার নিজের ধারণাও তাই। কারণ এত বড় নাটকখানার মধ্যে বহু অবস্থা বিপর্য্যয়ে যোগেশের মুখে অতি সাধারণভাবে—প্রায় কথার মাত্রা হিসাবে দু-এক স্থানে ভিন্ন আর কোথাও ঈশ্বরের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না। যোগেশ বলিতেছেন, "এই দুঃখের সংসারে ভগবান মানুষকে একটী রত্ন দেন—সে সুনাম।" এখানকার এ ভগবান ঠিক হিন্দুর সংস্কারগত ভগবান বলিয়া মনে হয় না। কারণ হিন্দুর ভগবান মানুষকে শুধু ঐ একটী রত্ন দেন না। তিনি তাহাকে অনেক রত্নই দিয়া থাকেন। তিনি বিপদে মানুষকে ধৈর্য্য দেন, আত্মজয়ের সু-প্রবৃত্তি দেন, তাহাকে নির্ভরতা দেন, তাহাকে তাঁহার সান্নিধ্য দেন, তাঁ[হা]র পবিত্রতায় অতি পাপাচারীকেও পবিত্র করিয়া তুলেন। ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস যাহার আছে, সে আর্থিক ঘা খাইয়া কিংবা চরিত্রগত একটা দুর্ব্বলতার জন্য যোগেশের মত অধঃপতনের অন্ধকূপে ক্রমশঃ নামিয়া যায় না। সে ভগবানকে দয়াময় জানিয়া অতি দুরবস্থায় তাঁহার সদাপ্রসারিত করুণ হস্তকে ধরিবার চেষ্টা করে। সে ঘা সামলাইতে গিয়া প্রতিপদে মদ খায় না। আমার মনে হয় যোগেশের এই ভগবান ইহা মাত্র কথার কথা। এখানে ভগবান অপেক্ষা সুনামের প্রতি যোগেশের লক্ষ্যই অধিক। সামর্থ্য, চরিত্র ও সুনাম এই তিনটীই যোগেশের চরিত্রের ভিত্তি। যোগেশ অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করিয়াছে, সে কার্য্যকেই দেবতা বলিয়া জানে; আমাদের মনে হয় এ যোগেশ গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত জড়বাদী, অধ্যাত্মবাদী নয়। মনে হয় এ যোগেশ একজন পাকা positivist, পরকালবাদী নহে। সুনাম, সত্য কথা, সচ্চরিত্র, যোগেশ কথায় কথায় এই সকলেরই দোহাই দেয়, কখনও ভগবানকে

করুণাময় বলিয়া ডাকে না। আর এইজন্যই অপ্রতিহত গতিতেই যোগেশের অধঃপতন যেন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটকের পরিকল্পনা করেন। তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার হাওয়া খুব জোরে বহিতেছে। মাইকেলের যুগ হইতে তখনও পর্য্যন্ত দেশে এই হাওয়াই বহিতেছে, যে মদ খায় না সে যেন পণ্ডিত নহে। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতের ঈশ্বর যোগেশের এই ঈশ্বর, একটা প্রচলিত প্রবাদবাক্যের ঈশ্বর। তখনকার দিনে এই যোগেশের মতই কর্ম্মবীর ইংরাজী সভ্যতার অনুকরণে মদ্যপায়ী অনেক কৃতবিদ্য মানুষকে আমরা দেখিয়াছি। সংসারের গুরুতর আঘাতে তাঁহাদের নিয়মিত মদের মাত্রা কেমন করিয়া সংযমের বাঁধকে মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া চরিত্র সুনাম ও আত্মনির্ভরতাকে রসাতলে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহারই পরিচয় দিবার জন্য যেন 'প্রফুল্ল' নাটক লিখিত। গিরিশবাবুর অন্যান্য সামাজিক নাটকের সহিত 'প্রফুল্ল' নাটকের পার্থক্য এখানেই। 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' সাময়িক সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে লিখিত। তাহার স্থায়িত্ব সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ, কিন্তু 'প্রফুল্ল' চিরন্তন।

৩৭ বৎসর পরে এদেশে হাওয়া উঠিয়াছে ইংরাজী শিক্ষার, ধর্ম্মহীন শিক্ষার পরিণাম কি? আর তাহা বুঝিয়াই যেন নবীন ভারত অসহযোগের বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজী শিক্ষার স্রোতকে বাঁধিতে অগ্রসর। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদালত এবং মদ এই ত্রিদোষে যোগেশের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া সেই সর্ব্বনাশী হাহাকার। 'প্রফুল্ল' যেন এই ত্রিদোষের প্রতীক। ভারতবর্ষের সাজান বাগান শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে সেইদিন, যেদিন এদেশের আদালতে "উকীল কি চিজ" জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর ইংরাজী শিক্ষিতের মদিরোন্মত্ত আদর্শ ভারতবাসী (?) যোগেশের মত ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া অর্থকে, আত্মসামর্থ্যকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছে!

বহুবার গিরিশচন্দ্রের যোগেশের অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমাদের মনে এই প্রশ্নই উঠিয়াছে, যোগেশের এই যে দুর্দ্দশা, এটা শুধু মদের প্রভাব নয়, তাহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার প্রতিক্রিয়া। এই প্রশ্ন মনে উঠিবার কারণ, গিরিশবাবু ভিন্ন অন্যের যোগেশে, মদ্যপের পরিণামের যে বিভীষিকা তাহাই সমধিক পরিমাণে ফুটিতে দেখিয়াছি; গিরিশবাবুর যোগেশ, মনে হইত, ইহা হইতে যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মনে হইত, মাদকতা অপেক্ষা দুর্ব্বলতার আক্রমণে যোগেশ ক্রমশঃ হতবুদ্ধি। কথাটা একটু খুলিয়া বলি।

যোগেশের সুখের সংসারে, একটানা স্রোতে প্রথম তরঙ্গ উঠিল, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে, এই সংবাদে। সুখনিদ্রার মধ্যে প্রথম দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যোগেশ বিস্ময়-উদ্বেলিত-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কোন্ ব্যাঙ্ক ?"

পীতাম্বর বলিল, "রি-ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক।"

যোগেশ বলিল, "অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা!...আজ বড় আমোদের দিন...।" ইত্যাদি। মদ চলিল।

ইহার পূর্ব্বেও যোগেশ মদ খাইত; কিন্তু সে, রাত্রে, গুরুতর খাটুনীর পর, বিশ্রামের অবসরে। তারপর সব দিক গুছাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সে সম্প্রতি দিনের বেলাও দুই এক পাত্র এই আরক খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম তাহার এই হঠাৎ মদ খাওয়ার আতিশয্য হইতে জ্ঞানদাকে লাথি মারিয়া বাক্স কাড়িয়া লইবার দৃশ্যের ঘটনার মধ্যে যে সময়, সেটা তিন মাসের বেশী নয়; কিংবা যদি খুব বেশী করিয়া ধরা যায় তাহা হইলেও ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া হইতে ইহাকে চার মাসের বেশী সময় দেওয়া যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে, কোন লোকই যোগেশের মত এরূপ দুর্দ্দান্ত মাতাল হইয়া উঠিতে পারে না, যে "ছেলেটার হাতমুচড়ে পয়সা কেড়ে নেয়, কিংবা স্ত্রীকে লাথি মেরে বাক্স কেড়ে আনে।" যোগেশ মদের উপর মদ খাইয়াছে ক্রমাগত মনোভঙ্গে—আঘাতের পর আঘাত খাইয়া। তাহার প্রথম আঘাত ব্যাঙ্ক ফেল; দ্বিতীয় আঘাত সুরেশের চোর হওয়া; তৃতীয় আঘাত নেশার ঝোঁকে বেনাম মর্টগেজে সই করা। এই সকল ঘটনার গতি খুব দ্রুত। দু-পাঁচ দিনের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি; কিন্তু দু-পাঁচ দিনের মধ্যে তাহার অধঃপতন এত দ্রুততরভাবে চলিয়াছে যে, সে চলাটাকে আমরা ঠিক মদের কার্য্যও বলিতে পারি না এবং স্বাভাবিকও বলিতে পারি না। তবে যোগেশ এমন করে কেন? কোন অপ্রত্যাশিত গুরুতর ঘা খাইয়া দুর্ব্বলচিত্তের লোকে আত্মহত্যা করিতে পারে এবং এইরূপ আত্মহত্যা করিবার কারণকে ডাক্তারেরা (temporary insanity) সাময়িক উন্মত্ততা বলিয়া থাকেন। এই সাময়িক উন্মত্ততা মস্তিষ্কের বিকৃতি মাত্র। যোগেশ আত্মহত্যা করে নাই; সে মদ খাইয়াছিল এবং মদ খাইবার যে দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি, তাহাকে সে কখন রোধ করিতে পারে নাই। রমেশ তাহার এই দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই তাহাকে ক্রমাগত মদ যোগাইয়াছিল।

যোগেশের এই যে মদ খাইবার লালসা, মনে হয়, ইহাও ঐ সাময়িক উন্মত্ততার একটা অঙ্গ। তাহার মস্তিষ্কে সম্বিতের যে আধার তাহা অপরিপক্ক অবস্থায় এতদিন আত্মগোপন করিয়া ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া হইতে উপর্য্যুপরি ঘা খাইয়া তাহার

সেই অপরিপক্ক বা অসুস্থ মস্তিষ্ক আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল ; এবং এইজন্যই সে কোন অবস্থাতেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। নেশার ঝোঁকে মর্টগেজ সই করার পর, যোগেশ মিথ্যাকে সমর্থন করিবার জন্য যখন রেজেষ্টারী আফিসে যায় তখন সে আদৌ মাতাল নহে। যদি কিছুমাত্র তাহার আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে সে রমেশকে "জোচ্চোর" অপবাদ হইতে বাঁচাইবার অপেক্ষা unregistered মর্টগেজের কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিত। কারণ ঐ দৃশ্যের প্রারম্ভেই যোগেশ বলিতেছে, "মা আবার বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেন, সুরেশের জেল হয়, স্ত্রী রাঁধুনী হন, ছেলে অনাহারে মরে, তবু সে পাওনাদারকে ফাঁকি দিতে পারিবে না।" যার সুনামের মমতা ও নীতিজ্ঞান এত প্রবল সে সুড়সুড় করিয়া রেজেষ্টারী আফিসে যায় কেন ? বিশেষতঃ ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক recover করিয়াছে ; এবং সে খবরও সে জানে ; সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সত্য সত্যই আর জুয়াচোর হইতে হইত না। কিন্তু যোগেশ রেজেষ্টারী আফিসে যাইবার পথে জুয়াচোর গালি খাইয়া হাড়ি ডোমের সহিত মদ খাইতে লাগিল। অসুস্থ মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকৃতি ইহাতে বিদ্যমান। মদের আকর্ষণ বা লালসা এখানে নিতান্তই secondary—গৌণ কারণ। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্য হইতে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যেখানে জ্ঞানদা মরিতেছে, এই পর্য্যন্ত যোগেশের চরিত্রে ধারাবাহিকরূপে আমরা দেখি মদ অপেক্ষা তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় মদ তাহার ইন্ধন মাত্র। ঘা খাইয়া প্রথম হইতেই তাহার মস্তিষ্ক তরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে কার্য্যকারণের পরম্পরাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। স্মৃতিভ্রংশ, মদের হাত ধরিয়া যেন তাহাকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে মদ খায় ভুলিবার জন্য ; কিন্তু সে বুঝিতে পারে না এই ভ্রম, এই আত্মবিস্মৃতিই মদ খাইবার জন্য অলক্ষ্যে ক্রমাগত তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে। এই মদ খাওয়া, ছেলের হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নেওয়া, স্ত্রীকে লাথি মারা, এই সবই তাহার দুর্ব্বল, পরাজিত বিকৃত বুদ্ধি বা সম্বিতের কার্য্য। ইহা (softening of the brain) স্মৃতি বিভ্রমের পরিচায়ক। জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্বে এই স্মৃতিভ্রংশের চিত্র নাটকের শেষভাগে অতি বিচিত্রভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগেশ বলিতেছে—"একজন যোগেশ ছিল সে তোমাদের ছুঁত না···কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ— ?"

জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে যোগেশ বলিতেছে—"আমিই তোমায় লাথি মেরে, মেরে ফেলেছি কেমন ?···আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে আছে,···।" যোগেশের জ্ঞান ফিরিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে—যে শয়তান তাহাকে মদ খাইবার জন্য

প্রলুব্ধ করে—তাহার কুয়াসাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের সৃষ্ট সেটা সেই ভূত—এখন দূরে সরিয়া আছে, যদি ঘাড়ে চাপে, সে নাচার ! তাই যোগেশ বলিতেছে, "যদি ঘাড়ে চাপে, উপায় নেই, কি করব ?" এই ভূতের সঙ্গে যুদ্ধে সে জর্জ্জরিত, সে চেষ্টা করে প্রাণপণে—এই ভূতকে তাড়াইয়া আবার তাহার মনুষ্যত্বকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ; কিন্তু হায় ! ভূত তাহার দুর্ব্বল চিত্তে মদ খাইবার পিপাসা জাগাইয়া তুলে মাত্র, সে তাহাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আর এই ভূত ঘাড়ে চাপিলেই তাহার "softening of the brain"-এর কার্য্য আরম্ভ হয় ; সে সব ভুলিতে আরম্ভ করে,—সে ভূতগ্রস্তের মতই কিছু খুঁজিয়া না-পাইয়া কেবল মদ খায়, মদের জন্য ভিক্ষা করে।

এই দৃশ্যের পর, পঞ্চমাঙ্কে যোগেশের পরিণতি অতি ভয়ঙ্কর ! ইহার পর হইতেই আমরা দেখি, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব—যাহার অঙ্কুর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, তাহা ফলে ফুলে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখি, বায়স্কোপের পর্দ্দার উপরে চিত্রের পর যেমন চিত্র আসে, যোগেশের ক্ষীণ মস্তিষ্কের পর ঐ চলচ্চিত্রের মতই ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহার পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের জীবন—আলোক ও অন্ধকারের ক্রমিক বিবর্ত্তন ! কিন্তু সে, সে দুইয়ের কোনটিকেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই ভীষণ দ্বন্দ্বের যে শোচনীয় পরিণাম, অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্রের চক্ষে তাহা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মনে হইত যোগেশ-গিরিশচন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন বুঝিবার জন্য, কোন্ যোগেশ তিনি ? কিন্তু ক্ষমতাহীন অসহায় দুর্ব্বল যোগেশ বুঝিতে পারিতেছে না সত্যই সে কে ? গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অন্য যোগেশের এই উক্তিতে আমরা যেন একটা দুঃখের কাহিনীর করুণ আবৃত্তি শুনি। আর গিরিশচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিতে শুনিতে, কথা মর্ম্মের কোন নিভৃত প্রদেশে হারাইয়া যাইত ; চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত যোগেশ, নিতান্ত নিরুপায়—উন্মত্ততার শিখরে দাঁড়াইয়া হাহাকার না-করিয়াও, দর্শকের ভিতরে হাহাকার তুলিয়াছে !

গিরিশচন্দ্রের যোগেশ এবং অন্যের যোগেশের প্রভেদ প্রসঙ্গে, গ্যারীক ও ব্যারীর 'লিয়র' অভিনয়ের তুলনায়, একজন ইংরাজ কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"The town had found out different ways
To praise its different Lears,

For Barry we had loud huzzas,
And Garrick only tears."

এইবার 'সিরাজদ্দৌলা'র কথা বলি। ইংরাজ লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাস আকার বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন বাঙ্গলার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যদি সময় পাই, শেষ জীবনে আর কিছু লিখিব না, বাঙ্গালার ইতিহাসই লিখিব। যে জাতির ইতিহাস নাই জগতে তাহার কোন পরিচয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের নানা প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই তিনি ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলার ইতিহাসকে যেমন অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তেমনি মুসলমান লিখিত ইতিহাসের প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার অভিমত ছিল, এই দুই সম্প্রদায়ের লিখিত ইতিবৃত্ত সত্য ও মিথ্যা, প্রকৃত ও অতিরঞ্জিত—ঐতিহাসিক গবেষণার মহাসমুদ্র নিরপেক্ষতার মন্দার দ্বারা মন্থন করিয়া যাহা সত্য, যাহা চিরন্তন, তপস্যাবলে তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত বাঙ্গলার কয়েকজন শিক্ষিত মনীষী বহু সম্মানে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে আমরা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক মৌলিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ইতিহাস রচনার প্রথম পরিচয় পাই। বহু বহু বর্ষ পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলা অবলম্বনে যখন কাব্য লেখেন, তখন ইংরাজের লিখিত ইতিহাস পড়িয়া আমাদের ধারণা ছিল, সিরাজের ন্যায় অত্যাচারী বুঝি জগতের আর কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী ইংরাজের এ মসী-প্রলেপকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অজাতশ্মশ্রু বালক সিরাজউদ্দৌলা যে কতটা অত্যাচারী এবং ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের লেখনীচাতুর্য্যে কতখানি রোমান্সের সংস্রব তাহার চরিত্রে আছে, তাহা বাঙ্গালী ধরিয়া ফেলিয়াছে। ইতিহাস যে কোন জাতিবিশেষের ওকালতি করিবার উপাদানস্বরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্ররূপে (both offensive and defensive) ব্যবহৃত হইবার নহে, তাহা আর বাঙ্গালীর নিকট অপরিজ্ঞাত নাই। বাঙ্গালী মেকলের উত্তর-পুরুষকে মুখের মত উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালীর নাট্যশালায় 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের উৎপত্তি। বাঙ্গালী যাহা দেখিতে চাহিয়াছিল, দ্রষ্টা গিরিশচন্দ্র যেন তাহার আভাস বুঝিয়াই শুভক্ষণে 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক পড়িয়া কবিবর নবীনচন্দ্র আত্মত্রুটী স্বীকার করিয়া গিরিশচন্দ্রকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি এই :

"ভাই গিরিশ,

২০ বৎসর বয়সে, 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান্ তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন!

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোকসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেন, তখন তিনি সে বিষয়ে যাহা কিছু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য সমস্তই পাঠ করিতেন। 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিবার পূর্ব্বে তিনি মুরশিদাবাদ ও সিরাজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে নাটকের উপাদান বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বসিবার ঘরটী দেখিলে মনে হইত সেটা যেন একটা ছোটখাট লাইব্রেরী। এই সময়ে হঠাৎ কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইত—স্তূপীকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্টের ন্যায় গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে মগ্ন। তাঁহার লিখিবার একটা পদ্ধতি ছিল এই যে তিনি যে বিষয় লিখিতেন, সে বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না-জানিয়া "শ্রীদুর্গা" কাঁদিতেন না। অনেক সময়ে নূতন নাটক লেখা প্রসঙ্গে কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, "লিখব কি, পড়বারই সময় পাচ্ছি না।" গিরিশচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়াছি; আবার এমন নাট্যকারও দেখিয়াছি, যিনি স্বচ্ছন্দে বলিয়াছেন, "আমি বড় পড়ার ধার ধারি না, তাতে originality নষ্ট হয়।" কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু প্রমাণ পাইয়াছি—এই সকল নাট্যকারের মৌলিকত্বে অলৌকিকত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহাদের স্থায়িত্ব বড় দেখি নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটক লিখিতে বড় বিলম্ব হইত না. কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনে ও তাহার তথ্য সংগ্রহে তাঁহার সময় লাগিত অনেক। এই 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিবার সময় প্রথমে তিনি ইংরাজ ও বিদেশীয় লেখকগণের পুঁথির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন; বাঙ্গলায় লিখিত ইতিহাসগ্রন্থের প্রতি তখন তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার একটা ধারণাই

ছিল যে, বাঙ্গলায় কেহ বড় বিশেষ পরিশ্রম বা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লেখেন না। ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজউদ্দৌলা' বাহির হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে এই বইখানির কথা উঠায় তিনি পূর্ব্ব ধারণামতে বলিয়াছিলেন, "ও আর কি দেখব?" পরে কিন্তু তাঁহাকে এ মত বদলাইতে হইয়াছিল। তিনি অক্ষয়কুমারের 'সিরাজউদ্দৌলা' পড়িয়া খুবই প্রীত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"বইখানা বাস্তবিকই মত বদলাইয়া দিয়াছে।" অক্ষয়কুমারের এই 'সিরাজউদ্দৌলা'র একস্থানে আছে, সিরাজ জগৎশেঠের গালে চড় মারিতেছে। গিরিশবাবু নাটকেও এই ঘটনাটী রাখিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাটী সিরাজ এবং তাহার ধ্বংসকারী কুচক্রীদের চরিত্র চিত্রণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ভূমিকায় অক্ষয়বাবুর ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে আছে—সিরাজ, হোসেনকুলিকে হত্যা করিয়াছিল। এই হোসেনকুলির স্ত্রী গিরিশবাবুর নাটকের জহরা। সমস্ত নাটকখানিতে এই প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী একটা ধারাবাহিক উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এ চরিত্রটী গিরিশচন্দ্রের কাল্পনিক। আমার বেশ মনে আছে, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক লেখা শেষ হইলে উহা একদিন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়কে উহা শুনান হয়। আগাগোড়া নাটকখানি পাঠ করি আমি। উভয়েই নাটকখানি শুনিয়া মসগুল; সন্ধ্যা হইতে ২টা বাজিয়াছে কাহারও হুঁস নাই। গিরিশবাবুর কল্পিত চরিত্র করিম চাচা ও জহরা নাটকখানির সহিত এমনই খাপ খাইয়াছিল যে, ঐ দুই চরিত্রকে নাটক হইতে কোনমতেই বাদ দেওয়া যায় না—এ কথা উভয়েই স্বীকার করিয়াছিলেন। নিখিলবাবু বলেন—"মহাশয়, জহরাকে এনেছেন খুবই ভাল হয়েছে; ইতিহাসেও আছে ঘেসিটী বেগম ক্লাইবকে গোপনে টাকা দিয়া সাহায্য করিত। জহরার দ্বারা গোপনে গুপ্ত ভাণ্ডারের চাবি, ও সংবাদ দান, কল্পিত চরিত্রকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মতই জীবন্ত করিয়াছে।" বাস্তবিকই যে দৃশ্যে জহরা ঘেসিটীর নিকট হইতে চাবি ও রত্নাদি লইয়া যাইতেছে, সে দৃশ্যের অভিনয় এখনও আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। প্রথমে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ-কন্যার নাম ছিল না। নাটক শুনার পর নিখিলবাবু তাহার নামকরণ করেন—বলেন তাহার নাম জউহুরউন্নেসা। এতত্তেও কিন্তু গিরিশচন্দ্র জহরাকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেন নাই। তাই করিম চাচার মুখে তিনি একস্থানে বলাইয়াছেন, "বিবি সাহেব, অনেক খেলা খেল্লে, কিন্তু এত করেও তুমি ইতিহাসে স্থান পাবে না।" 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক pros-

cribed ; যদি উহার প্রচার থাকিত, তাহা হইলে বলিতাম—যদি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে চাও, তাহা হইলে কী করিয়া ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে হয়, 'সিরাজদ্দৌলা' পড়িয়া তাহা শিখ ; ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান, ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ, ঐতিহাসিক গবেষণা, ঐতিহাসিক চরিত্রের মর্য্যাদারক্ষণ—'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রতি অঙ্কে, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি ছত্রে, বিদ্যমান ; অথচ এই 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে নাটকীয় রসের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ভাবের বাহুল্যে ইহার কোন স্থলে সম্বন্ধবিভ্রাট ঘটে নাই ; ঘটনার অস্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মস্তকে বজ্রাঘাত হয় নাই। ইহার কোন অংশই "খেয়ালী ঐতিহাসিক" নহে।

'সিরাজদ্দৌলা' লেখা শেষ হইলে আমরা খুব উৎসাহের সহিত উহা রিহার্স্যাল দিতে আরম্ভ করিলাম। গিরিশবাবুর রিহার্স্যালের পদ্ধতি ছিল এইরূপ,—শিক্ষা-দানের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নাটকখানি আদ্যন্ত নিজে পড়িয়া দিতেন ; সম্প্রদায়স্থ সকলে—স্বত্বাধিকারী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ (Stage Manager), বেশকারী, এমনকি (সিফটার) দৃশ্যবাহক পর্য্যন্ত সকলে আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিতেন। তিনি প্রত্যেক চরিত্রটী যেরূপভাবে অভিনীত হইবে সেইভাবে পড়িয়া যাইতেন। প্রথম পঠনকালে সকলেই নাটকোক্ত চরিত্রগুলির একটা অবয়ব দেখিবার সুযোগ পাইতেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন লাগিল ? এ জিজ্ঞাসায় পণ্ডিত মূর্খ ভেদ ছিল না। একজন অনক্ষর সিফটারের মতও তিনি উপেক্ষা করিতেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মহাশয়, ওকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন ? ও কি বুঝে উত্তর দিতে পারবে ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠিক তোমাদের মত সমালোচক হিসাবে ও উত্তর দিতে পারবে না বটে, আর সে হিসাবে ঠিক জিজ্ঞাসাও করিনি ; পাণ্ডিত্য বা বিজ্ঞতার অভিমানশূন্য ও'র সরল প্রাণে মোটের উপর জিনিষটা ভাল লেগেছে কিনা তা ও ব'লতে পারবে। দেখ, পূর্ণচন্দ্র উঠলে পণ্ডিতেরও আনন্দ হয়, মূর্খেরও আনন্দ হয়। আমি নাটক লিখি শুধু পণ্ডিতের ও শিক্ষিতের জন্য নয়—লিখি সকলের জন্য। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আনন্দ দান নাটকের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই নাটকে বিভিন্ন রসের অবতারণা ক'রতে হয়। ওর মতামতেরও অল্পবিস্তর দাম আছে আমি মনে করি। ওর মতই যদি একজন দর্শক এই নাটক দেখতে আসে, সে না-মনে করে তার অর্থব্যয় ও রাত্রি জাগরণ বৃথা হয়েছে।" গিরিশবাবু শুধু সকলের মত জিজ্ঞাসা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যদি কেহ কোন দৃশ্য বা কোন ঘটনা ভাল লাগিল না বলিত, তিনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া

দেখিতেন এবং তাহা বদলাইতেন। তাঁহার অনেক নাটক সম্বন্ধে এইরূপ পরিবর্ত্তনের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; এই 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠকালে তাহা চাক্ষুষ করিলাম। প্রথম অঙ্ক পড়া শেষ হইলে তিনি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শুনলে?" অনেকেই বলিল, "বেশ"; দু-একজন একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, "প্রথম দৃশ্যটা অন্য দৃশ্যগুলির তুলনায় যেন একটু হাল্কা হয়েছে ব'লে মনে হ'ল।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কিচ্ছুই হয় নি, বুঝতে পেরেছি।" প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এই প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে ছিল মোহনলাল ও মীরমদনের কথোপকথনে বাঙ্গলার তাৎকালিক অবস্থার বর্ণনা। কতকটা পরবর্ত্তী রিহার্স্যালে দেখিলাম গিরিশচন্দ্র উহা বদলাইয়াছেন; প্রথম আরম্ভ করিয়াছেন ক্লাইবকে লইয়া। কিন্তু উহাও সকলের মনঃপূত হইল না, তাঁহারও না। পরে প্রথম দৃশ্যে আসিল ঘেসিটী বেগম ও রাজবল্লভ; সুর একেবারে উচ্চে বাঁধা; সকলেই শুনিয়া একবাক্যে বলিলেন—এইবার চমৎকার হইয়াছে। বাস্তবিকই এই প্রথম দৃশ্য হইতেই 'সিরাজদ্দৌলা' দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত।

কিছু ব্যক্তিগত হইলেও এখানে একটী কথা বলিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেছি। মনে করিতেছি 'পলিত-কেশ, চলিত-কলম' আমার জন্য নহে, নূতন ব্রতীদের জন্য, যাঁহারা রঙ্গালয়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন মনে করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ পথে চরণক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য। সাধনের পথে বিঘ্ন অনেক, শত্রু অনেক; কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায়, জীবনের পঙ্কমাঝে পা দিয়া বুঝিয়াছি, নিজের অপেক্ষা প্রবল শত্রু মানুষের বাহিরে দ্বিতীয় কেহ নাই, যে অতি সহজে, বিনা আয়াসে মানুষকে তাহার অজ্ঞাতে শর্করার প্রলেপে বিষ খাওয়াইয়া মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে, অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। নাট্যকার নাটক লেখেন, নট অভিনয় করেন, নাট্যকারের প্রাপ্য করতালি অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে লুটিয়া লয়েন, নট ফুলিতে থাকেন! বন্ধুবান্ধবেরা বাহবা দেন, নট ভাবেন এ পৃথিবীটা সত্যই যেন মধুপর্কের বাটী। স্বত্বাধিকারী আত্মস্বার্থের জন্য তাহাকে বলেন, "তোমার জোড়া নাই", নট মনে করেন সত্যই বুঝি তাহাই জোড়া মিলাইতে ভগবান ভুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের ঢক্কানিনাদ, বিজ্ঞাপনের ছটাবহুল আড়ম্বর, ছাপার কালিতে বড় বড় অক্ষরে নামের ধ্বজপতাকা প্রভৃতি সপ্তরথী মিলিয়া যখন সংসারে অনভিজ্ঞ নবীন অভিনেতাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তখন আত্মরক্ষা করিবার উপায় বা সাধ্য থাকে কয়জনের? তাহার উপর রোমান্সের রাজত্বে তালপাতের পক্ষীরাজে চড়া কল্পিত 'রাজপুত্তুর' নট দেখেন, পর্দ্দার ভিতর দিকে কেবল আয়েষা

মনোরমার রাজত্ব ! সুতরাং ওসমান পশুপতির প্রতিপদে তাল সামলাইয়া চলা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবেন না। স্বীকার করিতে সঙ্কোচ নাই, তাল সামলাইবার মত সামর্থ্য সে তরুণ বয়সে আমারও ছিল না ; এই সময় হইতেই আমার নটজীবনের গতি ভিন্নমুখী।

এই 'সিরাজদ্দৌলা'র সময়েই নানা কারণে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমার মনোমালিন্যের স্বচনা হয়। দলাদলি যেমন বাঙ্গলার সকল ক্ষেত্রে, সকল কার্য্যে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়াছে, বাঙ্গলার থিয়েটারে তাহার ব্যতিক্রম ইহার সৃষ্টি-দিন হইতে হয় নাই এবং ভগবানের ইচ্ছায় আজও সে বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহতভাবেই তাহার প্রভাব অটুট রাখিয়াছে। আমাদের সময়ও এই দলাদলি—এই ভেদ-নীতি আত্মপ্রকাশ করিতে ক্রটী করে নাই। থিয়েটারে দুইটা দল হইল। 'সিরাজদ্দৌলা'য় প্রথম সিরাজের ভূমিকা দেওয়া হয় আমাকে—অবশ্য ইহা মনোমোহনবাবুর ইচ্ছায়; গিরিশবাবুর অভিপ্রায় ছিল এই ভূমিকা দানীবাবুকে দিবার। দল বাঁধিলেই প্রতি পক্ষই নিজের বল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য, কেহ কাহারও হাতে যাইবেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আমি একদিন মনোমোহনবাবুকে না-বলিয়াই গিরিশবাবুর হাতে সিরাজের পার্টটী ফিরাইয়া দিয়া আসিলাম ; এবং 'সিরাজদ্দৌলা' খুলিবার কিছুদিন পূর্ব্বে ভাদ্র মাসেই—মিনার্ভার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলাম। সে বাঙ্গলা ১৩১২ সালের কথা। এই সংস্রব পরিত্যাগের সময় মনে করিয়াছিলাম—কথার কথা নহে, সত্যই মনে করিয়াছিলাম, থিয়েটারেব গণ্ডীর মধ্যে আর কখনও পা বাড়াইব না। কারণ তখন চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমাদের মত নিতান্ত দলছাড়া কেহ বাহির হইতে আসিয়া ইহার মধ্যে দন্তস্ফুট করিতে পারে এমন সামর্থ্য আর যাহারই থাক, আমার তখন নাই। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞাও আমি রাখিতে পারি নাই, কিছুদিন পরেই পুনরায় দল বাঁধিয়া থিয়েটার করিয়াছিলাম, পুনরায় ধাক্কা খাইয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে কহিব, এখানে নয়।

'সিরাজদ্দৌলা' পুলিশ হইতে পাশ করিবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাণ্ডুলিপির বহু স্থানে আমরা অদল-বদল করিতে বাধ্য হই। শেষে এমন হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রকে একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত পুলিশ আফিসে ধরণা দিতে হয়। সেইদিন অদল-বদলের মধ্যস্থ হয়েন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পুলিশ হইতে অভিনয়ের অনুমতি পাওয়ার পর আমি মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করি। ভূমিকা

নির্ব্বাচন এবং ইহার রিহার্স্যাল দেখিবার সুযোগ কাজেই আমার হইয়াছিল। ইহার প্রথম রাত্রির প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তালিকা এইরূপ :

করিম চাচা	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র
দান শা	...	" অর্দ্ধেন্দুশেখর
মীরজাফর	...	" নীলমাধব চক্রবর্তী
সিরাজদ্দৌলা	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
ক্লাইব	...	" ক্ষেত্রমোহন মিত্র
মোহনলাল	...	৺তারকনাথ পালিত
মীরমদন	...	৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল
উমিচাঁদ	...	শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত
সোকৎজঙ্গ	...	" মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
জহরা	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
লুৎফউন্নেসা	...	পরলোকগতা সুশীলা
ঘেসেটী	...	শ্রীযুক্তা সুধীরাবালা

যে পুস্তকের প্রচার রাজাদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে সে পুস্তকের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে অভিনয়ের দিক হইতে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় তখনকার দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল ; এবং সময়ের উপযোগী বলিয়া তখনকার নাট্যমঞ্চকে ইহা নূতন আকার দিয়াছিল। এই বৎসরই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। 'সিরাজদ্দৌলা'ও এই আন্দোলনের বেশ একটা অংশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সেদিনের দর্শক বোধহয় বিস্মৃত হন নাই—তিলক মহারাজ রয়েল বক্সে প্রবেশ করিবামাত্রই সমগ্র দর্শকের কণ্ঠোচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া ; গিরিশচন্দ্র তখন রঙ্গমঞ্চের উপর করিম চাচার অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই নতজানু হইয়া তিলককে অভিনন্দন করিলেন। তিনি সেদিন ইংরাজীতে এই মান্য অতিথির অভিনন্দনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কাহারও মনে আছে কিনা জানি না, দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন জীবনী লেখকও তাহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তবে শুনিয়াছি সেদিনের দর্শক তাঁহার সেই অভিনন্দন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

'সিরাজদ্দৌলা'র প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকের মধ্য হইতে একজন মুসলমান কবি গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দুই ছত্র কবিতার আবৃত্তি করেন। কবিতাটীর ভাবার্থ এই—"হে গিরিশচন্দ্র, তুমি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

'সিরাজদ্দৌলা' খোলা হয় ১৩১২ সালের ২৪শে ভাদ্র; তখন অধ্যক্ষ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে। শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর উভয়েই। ইহার প্রথম রাত্রির বিক্রয় ৮২১৲, দ্বিতীয় রজনীর বিক্রয় ৭৯৮৲, তৃতীয় রজনীর বিক্রয় ৭৭৩৲। 'সিরাজদ্দৌলা' একাদিক্রমে ২৫ রাত্রি চলিয়াছিল। ইহার পঞ্চবিংশ রাত্রির তারিখ ১৯শে ফাল্গুন ১৩১২ সাল এবং তাহার বিক্রয় ৩৬১৲ টাকা। 'সিরাজদ্দৌলা'র ২৫ রাত্রির গড়পড়তা বিক্রয় প্রতি রাত্রে ৭০০৲। এই 'সিরাজদ্দৌলা'র পর হইতে বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্য, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের ধারা, কীভাবে প্রবাহিত হইয়াছে আমরা এইবার সেই কথাই বলিব।

[১৪]

'সিরাজদ্দৌলা'র পর হইতেই বাঙ্গলার নাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটকের প্লাবন বহিয়া গেল। এই প্লাবনে নাট্যশালার আর্থিক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যের স্বচ্ছ বারি যে ক্রমশঃ পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্য্যাদা-রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। **Sensation** বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়া নাট্যসাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলি-য়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার নাট্যশালা উদর পূরণ করি-য়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাটক লইয়া আমি এ কথা বলিতেছি না; সাধারণ নাটকের যে দুর্দ্দশা দেখিয়াছি তাহারই কথা বলিতেছি।

পাঠক যদি একটু অবহিত হইয়া তখনকার ঐতিহাসিক নাটক এখন পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, কাব্যের অমৃতধারা অপেক্ষা জাতিবৈরতার বিষ তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেখিবেন যে, রাজা বা স্বদেশপ্রাণ উদার চরিত্র আঁকিতে গিয়া কতকগুলি প্লাটফরম স্পীকারের সৃষ্টি করা হইয়াছে; এবং এই অভিনব সৃষ্টির মধ্যে

নরনারীর ব্যাকরণগত প্রভেদ থাকিলেও ভিতরের পার্থক্য কিছুই নাই। দেখিবেন যে, প্রায় প্রতি ঐতিহাসিক নাটকেই দুইটা করিয়া দল আছে, তাহার একদল নির্য্যাতিত আর একদল অত্যাচারী; একদল স্বদেশের জন্য জীবন আহুতি দিতেছে, আর একদল তাহারই বিরুদ্ধে তরবারী ধরিয়াছে। মানুষ যখন তাহার অন্তরের দেবতাকে ভুলিয়া বহির্মুখী হয়, তখন শুধু যে তাহার মনুষ্যত্বের অপহ্নব ঘটে তাহা নহে, তাহার ভিতর সুন্দর যাহা তাহা সে হারাইয়া ফেলে; শেষে তাহার কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। তখনকার বহু ঐতিহাসিক নাটকে এই হীনতা ও দীনতার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইয়াছি। রাজা আছেন, রাজার পিতা, খুল্লতাত প্রভৃতি সকলে সজ্ঞানে দাঁড়াইয়া, বিদেশী দূত আসিয়া জানাইল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের উত্তর কি? সেই রাজমহিমা-মণ্ডিত সভায় একটা সামান্য প্রহরী জুতা ছুঁড়িয়া সেই দূতকে উত্তর জানাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দের ঘন [ঘন] করতালিধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল! এই নীচজনোচিত ব্যবহার, এই ক্ষণিক অস্বাভাবিক উত্তেজনার অবতারণা দর্শক সাগ্রহে লইলেন বটে; কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, এরূপ ঘটনা তাঁহার বাড়ীতে যদি হইত, তবে তিনি ভৃত্যের এই ঔদ্ধত্য কিছুতেই সহ্য করিতেন না। জাতিবৈরতার এই যে মাদকতা, ইহা তখনকার কত নাটকে কতবারই যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না। আদর্শ যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার পরিণতি যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা অনুমান করা সহজ। এই উত্তেজনার মোহে, এই অস্বাভাবিক করতালি লাভ করিবার লোভে কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার নাট্যশালার বহু ঐতিহাসিক নাট্যকার হীন 'মেলোড্রামা'র সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রকৃত নাটক বা সাহিত্যের রস কাজেই তাহাতে বিরল হইয়া পড়িয়াছে। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই ঐতিহাসিক নাটকের যুগে একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজকাল নাটক লিখি না, কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দিই, নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের যাহা ইচ্ছা হয় রাখেন, যাহা তাঁহাদের মনঃপূত না-হয় তাহা ফেলিয়া দেন।" তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক; কিন্তু তিনি নিজেই বলিতেন যে, 'মীরকাসিম' নাটক লিখিতে গিয়া তিনি কেবল মীরকাসিমের ওকালতী করিয়াছেন; মীরকাসিম প্রতি যুদ্ধে হারিয়া পলাইতেছেন আর প্রতিবারই তাঁহাকে বলিতে হইতেছে,—আমি না-পলাইলে, আমি মরিলে কে বাঙ্গলা রক্ষা করিবে? আর প্রতিবারেই দর্শক সেই কথায় করতালিধ্বনি করিতেছে। শক্তিশালী লেখকের লিপিচাতুর্য্যে এইরূপ ওকালতীর মধ্যেও রসসৃষ্টির অপূর্ব্ব পরিচয় বহু স্থানেই পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা ইহার হীন অনুকরণে নাট্য-

কারের তালিকা মধ্যে নিজেদের নাম প্রবেশ করাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নাট্যসাহিত্যকে কতদূর পিছাইয়া দিয়াছেন তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে। এই হীন অনুকরণের দিনে বাঙ্গলায় নাটক লেখা এত সুলভ হইয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর বালককেও আমি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া আনিতে দেখিয়াছি। এইরূপ বালক ও তাহার বড় দাদাদের নাটক অভিনীত হইয়াছে এবং সে নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্যও দর্শক সমাগমের অভাব ঘটে নাই! এইরূপ নাটকে ঐতিহাসিক মুসলমান চরিত্রকেও বেমালুম হিন্দু করা হইয়াছে, এবং হিন্দুকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া নাটকোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দর্শক বা সমালোচক কেহ তাহাতে আপত্তি করেন নাই। তখন আমরা কেবল চাহিয়াছিলাম আস্ফালন; কাজেই বক্তৃতায়, সংবাদ-পত্রে, রঙ্গমঞ্চেও কেবল পাইয়াছি তাহারই প্রতিধ্বনি। ইহার পূর্ব্বে অভিনয়ের জন্য নাটক লিখিয়া আনিতে অনেকেই সঙ্কোচ করিতেন, কিন্তু সে সঙ্কোচের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল যখন জননী জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার এইরূপ সুলভ পন্থা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম। তখনকার সুলভ ঐতিহাসিক নাটকের একটা কালবুট এইরূপভাবেই প্রস্তুত হইয়া গেল:—একদল ভারত আক্রমণ করিবে, একদল দেশোদ্ধারের জন্য আক্রমণকারীকে বাধা দিবে; জহরা, বিজয়া, সত্যবতীর ঘৃণিত অনুকরণে একজন উদাসিনী রমণী স্বদেশী গান গাহিবে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেনাপতি বা রাজার কোমর হইতে তরবারী খুলিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে দেশোদ্ধারের জন্য বক্তৃতা দিবে, প্রয়োজন হইলে ভারতমাতার আদ্যশ্রাদ্ধে কীর্ত্তন গাহিবে; অত্যাচারিতা নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য একদল বোম্বেটে নাটকের কোন না কোন দৃশ্যে অত্যাচারিতের প্রতি পিস্তল ছুঁড়িবে; নায়ক বেচারী কোন দিকে কূল না-পাইয়া নাটকের শেষভাগে হয় গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিবে, না-হয় পাগল হইয়া পরচুলা ছিঁড়িবে; গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের অ[ন]নুকরণীয় অপূর্ব্ব সঙ্গীতের হীন অনুকরণে অর্থহীন শব্দরাশি জলদমন্দ্রে দর্শকের তন্দ্রাভঙ্গ করিয়া রঙ্গমঞ্চে পুনঃপুনঃ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল অগ্নিদাহে সাহিত্যের ভস্মস্তূপ একটা বিরাট ঝঞ্ঝায় উড়িয়া আসিয়া নিতান্ত অসহায়া মা সরস্বতীর চোখে মুখে কানে কালি মাখাইয়া দিবে; নাটকের প্রথম দৃশ্য হইতে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত আদ্যন্ত আমার দেশ, আমার দেশ ইত্যাদি একটা তীব্র বিষের ইনজেকসান নাটককে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিবে। এইরূপ অপূর্ব্ব অবদান লইয়া যে সকল রোমহর্ষণকারী ঐতিহাসিক নাটক বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্য-

কুঞ্জে যে অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে, আমাদের অনুরোধ, পাঠক মৌলিক গবেষণা করিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করিবেন ; আমরা নাম লিখিয়া আর তাহা ধরাইয়া দিব না। তবে এ কথা বলা যায় যে, অনধিকারীর হাতে পড়িয়া এই সময় বাঙ্গলা নাট্যশালায় নাট্যসাহিত্যে একটা অত্যাচারের যুগ বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ভাগ্যে যাহাই হউক এই বিপ্লবের যুগে রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারীরা তাঁহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের যে অবসর লাভ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে, বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এইসব নাটকের দোহাইয়ে—অর্থাগমের সুবিধা যদি না-হইত তাহা হইলে অনেক নাট্যশালার দরজায় চাবি পড়িত।

তখন শনি রবি এক বইয়ের অভিনয় প্রথা প্রচলিত হয় নাই। আমাদের যতদূর মনে আছে, ষ্টার হাতীবাগানের বাড়ীতে যখন 'নসীরাম' খোলেন, তখন প্রথম সপ্তাহে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিনার্ভার প্রতিষ্ঠার সময় গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ'ও শনি রবি দুই দিন অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু সেও বোধহয় দু-এক সপ্তাহের জন্য। 'সিরাজদ্দৌলা' শনিবারে অভিনীত হয়, রবিবারে অন্য বই,—বিক্রয় অপেক্ষাকৃত কম। পৌষ মাসের বড়দিনের সময় গিরিশবাবুর নূতন অপেরা খোলা হইল—'বাসর' ; কিন্তু ইহাও ধোপে টি'কিল না। ডি. এল রায় এখনও পর্য্যন্ত নূতন নাটক মিনার্ভায় কিছু দেন নাই। এই বৎসর মাঘ মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র পুনরভিনয়ের আয়োজন হইল। বহু পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হইয়াছিল ; কিন্তু সে গিরিশচন্দ্রের নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী' নহে। ন্যাশানালেও গিরিশবাবু 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিয়াছিলেন। এবারে মিনার্ভার জন্য তিনি নূতন করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাটকী আকার দিলেন। 'সিরাজদ্দৌলা'র পর 'দুর্গেশনন্দিনী' খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইল। 'দুর্গেশনন্দিনী' খোলা হয়—রবিবার—১৯শে মাঘ ১৩১২ সাল। ইহার প্রথম রাত্রির বিক্রয় ৯৪৮৲ টাকা। প্রধান প্রধান ভূমিকা নির্ব্বাচিত হয় এইরূপ

বীরেন্দ্র সিংহ	...	গিরিশচন্দ্র
দিগ্‌গজ	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর
জগৎ সিংহ	...	পালিত
অভিরাম স্বামী	...	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী
ওসমান	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
আয়েষা	...	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী
বিমলা	...	তিনকড়ি দাসী।

ক্লাশানালে যখন 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হইত তখন গিরিশবাবু জগৎ সিংহ সাজিতেন, বেঙ্গলে জগৎ সিংহ সাজিতেন স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ। শরৎবাবু একজন বড়দরের অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জগৎ সিংহের খুব সুখ্যাতি ছিল; কিন্তু তবুও গিরিশচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি, "দেখ, জগৎ সিংহ আমার অপেক্ষা শরৎবাবু ভাল ক'রতেন।" সে ভাল মন্দ কী আমরা তাহা দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র এই পুনরভিনয়ে নাট্যশালায় বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর বাঙ্গলার নাট্যশালার সংস্পর্শে থাকিয়া আমি রঙ্গমঞ্চের উপর বঙ্কিমের যে প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছি, অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

[১৫]

বাঙ্গলার নাট্যশালার গঠনে প্রথমে দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসন যে সাহায্য করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীও তদপেক্ষা কিছু কম সাহায্য করে নাই। গিরিশ-চন্দ্র নাট্যকার হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও বঙ্কিমচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চ কখনও পরিত্যাগ করে নাই, করিতে পারে নাই এবং নাট্যমঞ্চের উপর বঙ্কিমের প্রভাব কতদিনে যে অপসারিত হইবে,—কখনও হইবে কিনা—তাহাও বলা কঠিন।

বাঙ্গলার নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও যেমন—আজও তেমনি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' বাঙ্গালী দর্শককে প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া সমানভাবেই আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি প্রায় সকল উপন্যাসই বাঙ্গলার নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং আজও পর্য্যন্ত ইহাদের কোনটিই তেমন পুরাতন হয় নাই।

শুধু পুরাতন হয় নাই নহে, নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নাট্যকারের যত নাটক রচিত হইয়াছে তাঁদের অনেকের নাটকেই বঙ্কিমবাবুর প্রভাব প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাহির হইতে দর্শক হিসাবে সকল সময় বঙ্কিমের এই প্রভাব ধরা যায় না, কিন্তু আমরা বহু নাট্যকারের নানা নাটকাবলীর রিহার্স্যাল দিতে দিতে এই প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারি। প্রথমে সেই কথাই বলি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গলার নাট্যশালা তাহার যবনিকা প্রথম উত্তোলন করে। দীনবন্ধুবাবুর এই নাটক-

গুলি কতকটা সামাজিক। 'নীলদর্পণ' তাৎকালিক বাঙ্গলার নীলকর-পীড়িত কতকগুলি পল্লী-সংসারের চিত্র। তাঁহার 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি সামাজিক ব্যঙ্গ-রঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনও বাঙ্গলা সাহিত্যে ঠিক রোমান্সের যুগ আসে নাই। নাটকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', তাৎকালিক সমাজচিত্র লইয়া। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' পৌরাণিক। গিরিশবাবুও ইহার পরে যে সমস্ত নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন তাহার অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সের যুগ আনিল। তখনকার পাঠকসম্প্রদায় বাঙ্গলায় এই নবরসের আস্বাদনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গলার নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ পাঠকের এই আনন্দ দেখিয়া বঙ্কিমের এই সকল উপন্যাস নাটকাকারে দর্শকগণের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গলার নাট্যশালায়ও রোমান্সের যুগ আসিল। বাঙ্গলার সাহিত্যেও যেমন, বাঙ্গলার নাট্যশালায়ও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রই এই রোমান্টিক যুগের প্রবর্ত্তক।

বঙ্কিমবাবুর ঐ উপন্যাসগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়:

(১) রোমান্টিক, যথা:—'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী'।

(২) পারিবারিক, যথা:—'ইন্দিরা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।

(৩) ঐতিহাসিক, যথা:—'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ'।

এইগুলির প্রত্যেকটী রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে, এবং এখনও বেশ আগ্রহের সহিতই অভিনীত হয়। বঙ্কিমের এই ত্রিবিধ নাটকের প্রভাব কীরূপ প্রবলভাবে অন্য নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে আমরা তাহার কথাই প্রথমে বলিব। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া রোমান্টিক নাটক। একজন একজনকে ভালবাসে, যেই সেই প্রণয়ে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইল, একটা কথা চলিত হইয়া গিয়াছে—আমরাও অমনি বলি—অমুকের 'ওসমান' ঐ। কত নাটকে যে, "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" দেখিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র এই কারাগারের দৃশ্য বাঙ্গলার বহু নাটকে স্থানলাভ করিয়াছে; এমন কি, অনেক ঐতিহাসিক নাটকেও এই দৃশ্যের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, অমনি বিমলা ও রহিম আসিয়া দেখা দিল। সেই শেখজীর লম্বা দাড়ী, আর বিমলার কোমল করস্পর্শ, সেই পলায়ন। নায়কের উদ্দেশে নায়িকার গৃহত্যাগ 'মৃণালিনী'তে যেমন আছে, দর্শক রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটকেই

তাহা দেখিতে পাইবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাগুলিকে প্রধানতঃ আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। এক—অতি কোমলা, ভীরুস্বভাবা, প্রকৃতি-সরলা ; যথা : —কপালকুণ্ডলা, কুন্দ, রমা, দলনী, তিলোত্তমা ইত্যাদি, আর এক—মুখরা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী, তেজস্বিনী, কোপ-প্রেম-গর্ব্বস্ফুরিতাধরা রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি; যথা :—মতিবিবি, বিমলা, সূর্য্যমুখী, শান্তি, রোহিণী ইত্যাদি। এক feminine beauty ; আর এক masculine beauty. বাঙ্গলার অনেক ঐতিহাসিক, রোমান্টিক কিংবা পারিবারিক নাটকেই এই দুই বিভিন্ন জাতীয় নারী চরিত্র মিলাইয়া লইবেন। দীন-বন্ধুর 'নীলদর্পণে'র ক্ষেত্রমণি ও রোগ সাহেবের দৃশ্যের অনুকরণ যেমন প্রায় বাঙ্গলার অনেক নাটকের জমাট দৃশ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র সাহেবের গালে চড় মারিয়া বন্দুক কাড়িয়া লওয়ার অক্ষম অনুকরণ অনেক জমাট-নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আজিকালিকার ঐতি-হাসিক নাটকে। রাজা আছেন, মন্ত্রী আছেন, সেনাপতি আছেন, বড় বড় বীর জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন—শত্রু দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছে ; উপায় কী ? রাজা বলিলেন—এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নই, লোকাভাব, যুদ্ধে কাজ নাই, সন্ধি কর। অমনি অপ্রত্যাশিতভাবে একজন রমণী—কে জানে সে ভিখারিণী কি সন্ন্যাসিনী, রাজমহিষী কিংবা রাজকুমারী,—ধূমকেতুর মত আবির্ভূতা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "সন্ধি ? কখন না ; তোমরা কেউ না যুদ্ধ কর, আমি ক'রব।" রাজা থতমত খাইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ ? তা,—তা—লোক কোথায় ?" রমণী উত্তর করিল, "লোক আমি সৃষ্টি করিব।" সেনাপতি বলিলেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু তাহাদের শিখাইবে কে ?" রমণী বলিল, "আমি।" এই যে করতালিধ্বনি সৃষ্টিকারিণী রমণী, ইহা বাঙ্গলার কোন্ ঐতিহাসিক নাটকে যে নাই তাহা তো বলিতে পারি না। সেই বঙ্কিমের শান্তির—বিকল্প, অনুকল্প, দ্বিকল্প !

রোহিণী-কুন্দের অনুকরণে জলে ডোবা, বিষ খাওয়া, গলায় দড়ী দেওয়া, বুকে ছুরী মারা, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের উপর এই যে আত্মহত্যার প্লাবন, কোন পিনালকোডই আজও পর্য্যন্ত ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। জয়ন্তী যুদ্ধক্ষেত্রে গঙ্গারামের বুকে সেই যে ত্রিশূল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আহা! বেচারী যদি জানিত যে উত্তর-কালে তাহার এই ত্রিশূলধারণ বাঙ্গালী দর্শকের হৃদয়ে মুহুর্মুহু শেলাঘাত করিবে তাহা হইলে বোধহয় সে কখনই এ গর্হিত কার্য্য করিত না। প্রতাপের আত্মত্যাগ এবং মৃত্যুকালে সেই আর্ত্তনাদ "কি জানিবে তুমি সন্ন্যাসী"—এ যে এতাবৎ কত বিকৃত ভাষায়, কত বিকৃতভাবে, কত নায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে, এবং রাজা-

নন্দের সেই সান্ত্বনা বাক্য ও শুভাশীর্ব্বাদ—"যাও প্রতাপ সেই অনন্তধামে" শেষে সনাতন হইয়া কত অভিনেতাকে যে গেরুয়া পরাইয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মোটামুটা হিসাব দর্শকগণ একটু চোখ মেলিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন।

'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মাতৃ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন ;—মা আমার যা ছিলেন, যা হইয়াছেন, যা হইবেন। কোন্ ঐতিহাসিক নাটক এই কালবুট বা ছকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? রঙ্গমঞ্চে পুনঃপুনঃ এই জননী জন্মভূমির অবৈধ আবির্ভাবের অত্যাচারে গভর্নমেণ্টকে একটা ডিপার্টমেণ্টই খুলিতে হইল, যেখানকার ফটকে সেলাম না-করিয়া কোনও ঐতিহাসিক নাটকেই "জন্মভূমি" টু শব্দটী পর্য্যন্ত করিতে পারেন না।

'রাজসিংহে'র জেবউন্নিসা মবারককে সাপের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল। প্রণয়ের প্রতিহিংসা লইতে গিয়া ইহার পর কত জেবউন্নিসাই যে রঙ্গমঞ্চে কত হতভাগ্যের মুণ্ডপাত করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কীভাবে বাঙ্গলার বহু নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে মোটামুটী তাহারই কথা বলিলাম। অপ্রিয় হইবে বলিয়া উদাহরণস্বরূপ কোন নাটকের নাম করিলাম না।

সে বৎসর নৈহাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "বঙ্কিমবাবু সাহিত্যে শুধু রথ তৈয়ারী করেন নাই, পথও তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সাহিত্যরথ সেই পথেই চলিতেছে—পথান্তর গ্রহণ করে নাই।" রঙ্গমঞ্চের দিক্ হইতেও কি এই কথা বলা যায় না?

এ পর্য্যন্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার ঔপন্যাসিক আকর্ষণ তেমন থাকে না ; এবং প্রকৃত নাটকের মর্য্যাদাও অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। উপন্যাসে অনেক জিনিষ বর্ণনায় চলে, অনেক জিনিষ পড়িতে পড়িতে পাঠক ভাবিয়া লইতে পারেন ; সময় ও স্থানের কড়া নিয়ম উপন্যাসে না-মানিলেও কোন ক্ষতি হয় না ; বিক্ষিপ্ত ঘটনার সাহায্যে উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা নাই—অবশ্য বিষয় যদি সুচিন্তিত ও সুলিখিত হয়।

উপন্যাসে দৃশ্যবিভাগের কোন বালাই নাই ; পাত্রপাত্রী পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ক্রমাগত পাঠককে তাহাদের কাহিনী শুনাইয়া যাইতে পারেন ; কোন

বিষয়ের বা চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদ প্রথমে না-করিয়া গ্রন্থকার পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত স্থানে তাহা উদ্ঘাটন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না ; পুস্তকের শেষ অংশে কোন নূতন চরিত্রের অবতারণা করিলেও উপন্যাসের কিছু যায় আসে না। দুই বা ততোধিক গল্প পরস্পরের সহিত জড়িত না-করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে দেখান যাইতে পারে, তাহাতে চরিত্রচিত্রণের বা রস-বিকাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না ; কিন্তু নাটকে এরূপ করিবার উপায় নাই। নাটক জন্মায়, তাহাকে তৈয়ারী করিতে হয় না। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ এবং গাছ হইতে ফল প্রসূত হয়, তেমনই নাটকও কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ভাব বা রসকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার ক্রমবিকাশ হয় ; এবং তাহা বীজানুযায়ী বৃক্ষেরই মতই স্বাভাবিকভাবে চরম পরিণতি লাভ করে।

ভাল নাটকের কোন চরিত্র—একটা সামান্য চরিত্রও বাদ দিলে নাটকখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। এই কারণেই অনেক সু-উপন্যাস রস-সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব্ব হইলেও, রঙ্গমঞ্চে সেগুলি শুধু যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহা নহে, অনেক সময় দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠে। পড়িতে পড়িতে যাহা বিসদৃশ মনে হয় না, চক্ষের সম্মুখে অভিনয়কালে তাহা অত্যন্ত অরুচিকর হয়। ঘরের মধ্যে উপন্যাস-বর্ণিত এমন অনেক জিনিষই আমরা বেশ সহজভাবেই পড়িতে পারি যাহা চক্ষে দেখা সহ্য করিতে পারি না, কিংবা যাহা সহ্য করা ভদ্রোচিতও হয় না। অথচ সে সকল দৃশ্য নাটক হইতে বাদ দিলে, শুধু যে উপন্যাসের মর্য্যাদাহানি হয়, তাহা নহে, উপন্যাস লেখকের উপরও যথেষ্ট অবিচার করা হয়। প্রণয় বা নায়কের প্রতি কামজ আসক্তি প্রকাশ, উপন্যাসে নানাভাবে রঙ ফলাইয়া দেখান যাইতে পারে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর সামান্য মাত্রাধিক্য হইলে, শিল্প এবং শিল্পী—উভয়েরই সর্ব্বনাশ। উপন্যাসের এ লিপিচাতুর্য্য অভিনয়চাতুর্য্যে রূপান্তরিত করিলে কোন ভদ্র দর্শকই তাহা সহ্য করেন না। বিধবা নায়িকা খুব সংযত ও মার্জ্জিত ভাষায়, ঘটনা-চক্রে পড়িয়া নায়ককে কোন নিভৃত স্থানে আদর আপ্যায়ন করিতেছে—তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমের অভিব্যক্তি কথায় নহে, কেবল তাহা লজ্জারক্তিম মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে—উপন্যাসের এ দৃশ্য পড়িতে পড়িতে কোন ব্যতিক্রমই চক্ষে ঠেকে না, বরং গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব তুলিকায় তাহা মনোরাজ্যে মনোরম হইয়াই ফুটিয়া উঠে ; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যেই দেখি যে একটী নিরাভরণা যুবতী-বিধবার পরিধানে থান, হাতে পাখা, স্থান নিরালা, সম্মুখে তাহার তাহারই-মনে-মনে-বরিত নায়ক, তখনই তাহার সেই থান কাপড়—রুক্ষ মাথা—নিরাভরণ দেহ, এমন একটা বিসদৃশ ভাব মনে

জাগাইয়া দেয়, যাহা আদৌ সুষ্ঠু ও রুচিকর নহে। অধিকন্তু যে করুণ রসের আভাস উপন্যাসে দেখা গিয়াছে, তাহা বিকৃত রসে রূপান্তরিত হইয়া সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদ্রেক করে! অভিনয়কালেও কোন অভিনেত্রীর পক্ষে কোন কথা না-বলিয়া কেবল ভাবের দিক হইতে রং মাখা মুখে লজ্জার লালিমা ফুটাইয়া তোলাও নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়া অন্য যাঁহাদেরই উপন্যাস অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সে চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে—কখনও তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। নাটকাকারে উপন্যাসের সাফল্য প্রমাণিত হয়—কেবল সমালোচনায় বা শিল্প-চাতুর্য্যে নহে, টিকিট ঘরে টাকার ওজনে সে তাহার দর নিজেই যাচাই করিয়া লয়। অবশ্য ইহাতে এমন কেহ না-বুঝেন যে, যে নাটকের ওজনে রূপার বাটখারা যত ভারী, নাটক তত উৎকৃষ্ট। কেননা এমনও দেখা গিয়াছে যে, অনেক ভাল নাটকও তেমন রজত-কাঞ্চন প্রসব করিতে পারে নাই—যেমন অনেক নিকৃষ্ট চটকদার নাটক করিয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই—যে সকল উপন্যাস বহু দর্শকের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে, সেই সকল উপন্যাসকেই রঙ্গমঞ্চে স্থান দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই প্রতিযোগিতায় আজও পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথও নহেন।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে এত আদর, তাহার আর একটা কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায়ই 'ড্রামাটিক' এবং এই 'ড্রামাটিক' বলিয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের অনুকূল। ইহাতে কেবলই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ঘোরাল প্যাঁচোয়া বিশ্লেষণ নাই—ইহার মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ধারাবাহিক ঘটনা-প্রসবী ঘটনার মধ্য দিয়া,—যে ঘটনাবলী পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুযায়ী,—যে ঘটনাবলী অভীপ্সিত রসবিকাশের উৎসস্বরূপ, যে ঘটনাবলী অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাতসঞ্জাত এবং হৃদয়যন্ত্রের তরঙ্গভঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে সদা লীলাচঞ্চল।

উপন্যাসের সূক্ষ্ম তুলির দাগ অতি মনোরম; কিন্তু নাটকে সব সময় সূক্ষ্ম তুলির ব্যবহার চলে না। পুস্তকে পড়িয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, কল্পনার সাহায্যে যে রস ধরিতে পারি, নাটকে সে সময়ের অভাব; কাজেই সূক্ষ্ম তুলির টানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে অনেক সময়েই মোটা তুলির টানও দিতে হয়। মোটা তুলির টানে আঁকা দৃশ্যপট যেমন দূর হইতে অতি সুন্দর ও শোভন দেখায়, নাটককেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে অনেক সময় সেইরূপ বাহিরের মোটা ঘটনার আশ্রয় লইয়া চরিত্র

অঙ্কনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এই দুই তুলির টান সমানভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপন্যাস—উপন্যাস ও নাটক একাধারে দুই-ই ; এবং এইজন্যই রঙ্গমঞ্চে তাঁহার উপন্যাসের এত আদর। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র কারাগারের দৃশ্য, 'চন্দ্রশেখরে'র অগাধ জলে সাঁতার, 'কৃষ্ণকান্তে'র বারুণী পুকুর, 'দেবী চৌধুরাণী'র বজরায় রাণীগিরি, 'আনন্দমঠে'র মাতৃমন্দির, 'রাজসিংহে'র পার্ব্বত্যপথে চঞ্চলকুমারী, 'কপালকুণ্ডলা'র শ্মশানভূমিতে মিলন ও বিয়োগ প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর সংযোজন রঙ্গমঞ্চে দর্শকের চিত্তে যে বিস্ময়-ব্যাকুল ভাবের উদ্দীপন করে তাহা তো এ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাসে দেখিলাম না। আবার সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের স্বতঃস্ফূরণ—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ", "কেন তুমি তোমার ওই অতুলনীয় দেবমূর্ত্তি নিয়ে আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে", "তোমার জন্য আগরার সিংহাসন ত্যাগ ক'রে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না", "বাদসাজাদীর চোখে জল, বাদসাজাদীও কাঁদে !", "তুমি কি রোহিণী যে তোমার জন্যে ভ্রমর"—এমন কত বলিব, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি চরিত্রমুখে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায় ? এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হইলেও কর্ণের ন্যায় অর্দ্ধরথী নহেন, তিনি মহারথী, অর্জ্জুনের ন্যায় সব্যসাচী, আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যসম্রাট !

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি, অন্য কোন লেখকের উপন্যাস অভিনয়কালে সে আগ্রহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস এক সময়ে থিয়েটারে কিছু চলিয়াছিল ; কিন্তু সে চলা বঙ্কিমের কাছাকাছিও যায় নাই। পুনরভিনয়কালে দেখা গিয়াছে, বঙ্কিমের উপন্যাস যেমন, যখনই খোলা যায় তখনই নূতন, রমেশচন্দ্রের কিংবা অন্য কাহারও উপন্যাস তেমন আগ্রহোদ্দীপক হয় না। আর এক কথা, বাঙ্গলার সকল থিয়েটারই বঙ্কিমের উপন্যাসকে যেন নিজেদেরই একটা গর্ব্বের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। অর্থাগম হিসাবেও বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই বাঙ্গলার বহু নাটক উপন্যাসকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ষ্টারের 'চন্দ্রশেখরে' "বাদুড় ঝুলিত"—ইহা প্রবাদের মতই চলিয়া আসিয়াছে। ক্লাসিকে 'ভ্রমরে'র বিক্রয় এখনও অনেকের স্মরণ আছে। এমারেল্ড থিয়েটার খুব দুর্দ্দশার দিনে 'কপালকুণ্ডলা' খুলিয়া তখনকার আসর জমাইয়া দিয়াছিল। বঙ্কিমের এমন অনেক উপন্যাসেরই নাম করা যাইতে পারে যাহা থিয়েটারের অনেক মেঘ কাটাইয়া দিয়াছে। এ সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাসকারের দেখি নাই।

অভিনেতা অভিনেত্রীরাই বা কেন এত বঙ্কিমের উপন্যাসের পক্ষপাতী, এইবার সেই কথাই বলিব। রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে, প্রায় সব থিয়েটারেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে মাঝে মাঝে নামে ঐতিহাসিক কিংবা অন্য ধরনের নাটকও অভিনীত হইত, যেমন :—প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' বা 'সরোজিনী', কিংবা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ইত্যাদি। রামায়ণ মহাভারত বা কৃষ্ণলীলাকে ছাড়াইয়া কিন্তু কোন সুরই তখনকার নাট্যশালায় স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ এই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখনই দর্শক ও অভিনেতারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি পড়িয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন, সীতা, দময়ন্তী, কলি, শনি, বিভীষণ, রাবণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র, হিন্দু দর্শকগণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও, অভিনেতা অভিনেত্রীরা কখনও ইহাদের সত্যকার রূপ ধারণা করিতে পারেন নাই। এ যুগে এইসব অতি-মানবের চরিত্র কল্পনা-রাজ্যে যতটা স্থান অধিকার করে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলাইতে গেলে, এই ধুলার ধরণীতে তাঁহাদের স্বর্গীয় আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কখনও যাইবে বলিয়া আর আশাও নাই। কাজেই মানুষের পক্ষে তাঁহাদের সত্যরূপ ঠিক ঠিক ফুটাইয়া তোলা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই ! অভিনেতার পক্ষেও যেমন বিপদ, তেমনই পৌরাণিক অবদান লইয়া নাটক বা কাব্য লিখিতে গেলে কবিরও তেমন কম বিপদ নয়। এই ইংরাজী যুগের আদি কবি মাইকেল মধুসূদন পুরাণকে আদর্শ করিয়া কাব্য লিখিতে গিয়া হিন্দুর দৃষ্টিতে তাহা যথোপযুক্ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার এই অপূর্ব্ব কাব্যে, চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়, এক শ্রেণীর পাঠকের চক্ষে কলঙ্কের দাগ বড়ই সুস্পষ্ট দেখায়। একা গিরিশচন্দ্রকেই আমরা পৌরাণিক নাটকে বা দৃশ্যকাব্যে ধরণীর ধুলা মিশাইতে দেখি নাই। ইংরাজী অনুকরণে নাটক লিখিতে গিয়া, বস্তুতন্ত্রের প্রেরণায়, অধুনা অনেক কবিকেই কিন্তু আমরা পুরাণে-কোরাণে মিশাইতে দেখিয়াছি। তাই নবীনচন্দ্রের পৌরাণিক কাব্যগুলি বেদব্যাসের মহাভারত না-হইয়া, 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' হইয়াছে। আর এইজন্যই বোধহয় অনেক পৌরাণিক আদর্শ চরিত্র ইংরাজী নাটকের নায়কের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সীতা সাবিত্রী দেবীত্ব হারাইয়া ইংরাজী বিবির নকলে, মাত্র গাউন ছাড়িয়া শাঁখা শাড়ী পরিয়া দেখা দিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণকেও রামায়ণের উচ্চ আদর্শ হইতে টানিয়া আনিয়া আমাদেরই মত মানুষের স্তরে নামান হইয়াছে। নট নটীর পক্ষে একদিকে

খাঁটি পৌরাণিক চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা ও রূপ-কল্পনা যেরূপ কঠিন হইয়া পড়ে, অন্যদিকে এ্যাংলো-পৌরাণিক চরিত্রও তেমনি তাহাদের মনঃপূত হয় না। দর্শক-গণও বরং যথাযথ পৌরাণিক চরিত্রের অভিনয়ই ভক্তিনত হৃদয়ে উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হ্যামলেটের মত ভীষ্ম, বা রোমিওর মত নল, কিংবা জোয়ান অব আর্কের মত দ্রৌপদী দেখিবার মত দর্শকের সংখ্যা আজও পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্তরূপে বাড়ে নাই। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে, অবশ্যই পুরাণ বাদ দিয়া থিয়েটার করা একরূপ অসম্ভবই ছিল; কারণ যাত্রাপ্লাবিত দেশে "যাত্রা শোনায়" অভ্যস্ত দর্শকবৃন্দকে, ক্রমশঃ পুরাণের মধ্য দিয়াই "নাটক দেখিবার" জন্য প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যে "রথ ও পথ" দুই-ই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রকেও তেমনি এই বাঙ্গলাদেশে নট, নাটক ও দর্শক, এই তিনকেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই ধারাবাহিক পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা মুখ বদলাইয়াছে—বঙ্কিমের উপন্যাস অভিনয় করিয়া। আর এইজন্যই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের এত পক্ষপাতী।

বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং অধ্যক্ষ ৺বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায় প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করেন। পরে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের দুই-একখানি পুস্তক বাদে প্রায় সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বা বিহারীলাল কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' এখন আর চলে না। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'সীতারাম' প্রভৃতি এবং নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'বিষবৃক্ষ' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এখনও শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চের জন্য যে তিনখানি উপন্যাস—'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, তাহার মধ্যে এক 'কপালকুণ্ডলা' ভিন্ন আর দুইখানির অস্তিত্ব এখন আর বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতুলবাবুর 'কপাল-কুণ্ডলা'র মধ্যেও আবার অনেক স্থলেই গিরিশচন্দ্রের লেখা মিশিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা থিয়েটারে শত শত নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, "যত বড় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীই হউন না কেন, যত বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় যত দক্ষতার সহিতই করুন না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দক্ষতার সহিত যাঁহারা অভিনয় না-করিয়াছেন,

তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয়।" অবশ্য ইহা প্রাচীন দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা। তাঁহাদের মধ্যে যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি। তাঁহাদের এ কথা প্রমাণসহ কিনা জানি না; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে অসাধারণ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বরং গিরিশচন্দ্রেরও যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহার পরিচয়ও আমরা নানাভাবে পাইয়াছি। মাইকেল, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র এবং নিজের রচিত নাটকাবলী ভিন্ন, গিরিশচন্দ্র কেবল এক বঙ্কিমের উপন্যাসেই বহু ভূমিকা বহুবার সাগ্রহে অভিনয় করিয়াছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ, 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার, 'সীতারামে' সীতারাম, 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র দত্ত, 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখর, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বহুবার তাঁহার প্রতিভাস্ফুরণের আশ্রয় হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যে, এই সকল বিভিন্ন জটীল চরিত্রের অভিব্যক্তি, রসশিল্পের মধ্য দিয়া যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। বাঙ্গলার অধিকাংশ নট নটী তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আজিও শিক্ষালাভ এবং যশ অর্জ্জন করিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানকালেও লক্ষ্য করিয়াছি, যে উৎসাহ লইয়া তিনি বঙ্কিমের উপন্যাসের রিহার্স্যাল দিতেন, অন্য নাটকের শিক্ষাদানকালে তাঁহার সে উৎসাহ লক্ষিত হইত না। কারণ, সে সব নাটকের চরিত্রচিত্রণ তাঁহার তেমন ভাল লাগিত না। গিরিশচন্দ্রের বঙ্কিম-প্রীতি কতটা ছিল, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একখানি হ্যাণ্ডবিল হইতে যতদূর স্মরণ হয়, দুই-এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। মিনার্ভায় 'সীতারাম' অভিনয়ের প্রথম রজনীর হ্যাণ্ডবিলে তিনি লিখিয়াছেন, "Quarter of a century ago, I tried my prentice hand to dramatise the works of this immortal author."

গিরিশচন্দ্রের গঠিত সম্প্রদায়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বঙ্কিমের উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের অভিনয়ে, বাঙ্গলার দর্শকবৃন্দকে যে রস পরিবেশন করিয়াছেন, ভুক্তভোগী কখনও তাহা ভুলিবেন না। গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিন, মহেন্দ্রলালের নবকুমার, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেখিলে মনে হইত যেন উপন্যাসের ঐ সব নায়ক চরিত্র তাঁহার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের মুখে শুনিয়াছি, শোভাবাজার রাজবাটীতে মহেন্দ্রলালের নবকুমারের অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার বাসনা জাগরিত হয়। এই অভিনয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই অভিনয়ের সহিত গিরিশচন্দ্রের এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা লাভ করি। অভিনয়ের জন্য সকলেই প্রস্তুত, এমন সময় দেখা গেল,

'কপালকুণ্ডলা'র খাতাখানি নাই। বুঝা গেল, এই সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিবার জন্য বিপক্ষ দলের কেহ উহা না-বলিয়া লইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খাতাও নাই; দর্শকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে, অথচ বই নাই; অভিনেতারা সকলেই বিপন্ন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র দমিলেন না। তিনি তখনই একখানি 'কপালকুণ্ডলা' পুস্তক আনাইয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমি মুখে মুখে ড্রামাটাইজ করিয়া প্রম্‌ট্ করিতেছি, তোমরা উৎসাহের সহিত প্লে কর।" হইলও তাহাই; গিরিশচন্দ্র পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, মুখে মুখে ড্রামাটাইজ করিয়া প্রম্‌ট্ করিলেন; আর তাঁহার সুদক্ষ শিষ্যগণও এমনই নিপুণতার সহিত অভিনয় করিলেন যে, দর্শকগণ বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিলেন না। সুকুমারী দত্তের বিমলা, গিরিজায়ার অভিনয় দেখিয়া, প্রবাদ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন, "আজ বিমলা, গিরিজায়াকে জীবন্ত দেখিলাম।" সুকণ্ঠ অমৃতলালের 'চন্দ্রশেখরে' সেই হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ "সনাতন, আবার সংসার?" যেন এখনও কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর মনোরমা যাঁহারা দেখিয়াছেন—"আমি পুকুরে হাঁস দেখিগে গো"—তাঁহারা কখনও ভুলিবেন না। অমরেন্দ্রনাথের গোবিন্দলালও কম উল্লেখযোগ্য নহে। 'সীতারামে' তিনকড়ির শ্রী—বৃক্ষশাখায় দাঁড়াইয়া সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তি—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"—সেই উত্তেজনাব্যঞ্জক ধ্বনিও ভুলিবার নহে। রঙ্গমঞ্চে এই যে বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি দেখিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি, ইহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র; আর এই রসবিকাশের শিক্ষক ও গুরু গিরিশচন্দ্র।

রঙ্গমঞ্চের উপর বঙ্কিমের প্রভাব যেভাবে কার্য্য করিয়াছে, দর্শক এবং অভিনেতারূপে নাট্যমঞ্চের দিক হইতে যাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাই বলিলাম। উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কিছু কিছু যোগবিয়োগের প্রয়োজন হইয়াই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্রকেও সেইরূপ যোগ বিয়োগ কিছু কিছু করিতে হইয়াছিল। চরিত্র ও রসের ব্যাঘাত না-ঘটাইয়া কীরূপ দক্ষতার সহিত তিনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এইবার সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

উপন্যাসে অনেকটা গল্পের বাহার থাকে। বিশেষতঃ প্রাচীন উপন্যাসের গল্পের বাহুল্য কিছু প্রবল। যে দেশের উপন্যাসের আদর্শে আমাদের দেশের উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে দেশের প্রাচীন উপন্যাস অধিকাংশ স্থলে এইরূপ রহস্যময় গল্পাংশ লইয়া রচিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম[দিক]কার উপন্যাসে এই গল্পের—plot-এর উপর কিছু বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসে,

জটীল গল্পাংশ ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিলেও উহা একেবারে প্লট-বর্জিত নহে। মাত্র তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আমরা এই গল্প বা প্লটের বাহুল্য দেখি না— 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'সীতারাম' প্রভৃতি অধিকাংশ উপন্যাসই জটীল গল্প বা প্লট লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং এই গল্পাংশের সহিত তাঁহার উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের সামঞ্জস্য বরাবর রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বর্ণিত গল্প প্রায় অস্বাভাবিক হয় নাই।

দুই-এক স্থানে যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা নাটকে অভিনয়কালে যতটা ধরা পড়ে, পড়িবার সময় ততটা চোখে ঠেকে না। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'তে দেখা গিয়াছে, দুই-চারিটী ঘটনা কল্পনায় বেশ খাপ খায়, কিন্তু অভিনয়কালে—বাস্তব-ব্যবহারে তাহা ততটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কতলু খাঁকে খুন করিয়া বিমলার নির্বিঘ্নে পলায়ন কোন বস্তুতান্ত্রিকই একান্ত সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। 'মৃণালিনী'তেও যখন গৌড়নগরী মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছে, চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা, সে সময়ে ঐ নগরীরই উপকণ্ঠস্থ কোনও উদ্যানে—যেখান হইতে নগর-মন্থনকারী মুসলমান সৈনিকগণের উচ্চ কোলাহল সুস্পষ্ট শোনা যাইতেছে, সেই-খানে মৃণালিনীর মত ভীরুস্বভাবা নারীর নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকা বা ততোধিক নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইয়া পড়া, অনেকটা গল্প বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ অভিনয়-কালে, নেপথ্যে যখন সেনা চীৎকার করিতেছে আর রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকের সম্মুখে মৃণালিনী ও গিরিজায়া ঘুমাইতেছে—ইহা বিসদৃশই ঠেকে। কিন্তু যে কথা হইতে-ছিল; রহস্যময় গল্পের সৃষ্টি করিতে গিয়াই এইরূপ ঘটনার জাল ছড়াইয়া পড়ে এবং সে জালের দুই-একটা বাঁধন আলগাও হয়, পলকাও হয়। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিবার সময় এ সকল ঘটনা বাদ দিলে নাটকের অঙ্গহানি হইয়া পড়ে এবং বাদ না-দিলে এইরূপ স্থলে নাটকও কমজোরি হয়।

আর এক কথা,—গল্পের সূত্র এবং পারম্পর্য্য বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া নাটকও ভারী হইয়া পড়ে। দিন বদলাইতেছে। আগেকার মত ছয় কি সাত ঘণ্টা ধরিয়া নাটক দেখিবার সময় ও সখ এখনকার দর্শকের নাই। যাত্রার আসরে থিয়েটার বসিয়াছিল বলিয়া তখনকার নাটকে বক্তৃতাও যেমন খুব লম্বা লম্বা হইত, ঘটনার পর ঘটনাও তেমনই বিস্তৃতভাবে যোজিত থাকিত। অভিনয়ে অস্তোদয় অতীত হইলেও দর্শক বিরক্ত হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' প্রভৃতির অনেক অংশই এখন বাদ দিয়া অভিনয় করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বই

পড়িয়া পাঠকও এমন অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, অভিনয়কালে এইরূপ বাদ সত্ত্বেও উপন্যাস-বর্ণিত মূল রস উপভোগে কোন ব্যাঘাত হয় না।

যিনি থিয়েটারের জন্য নাটক লেখেন, তাঁহাকে অনেক সময় দল দেখিয়া নাটক লিখিতে হয়। সম্প্রদায়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর সংযোগ যেমন থাকে, সেইভাবেই নাটকের পাত্রপাত্রীকে সাজাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ, অভিনয়ই নাটকের জীবন। সু-অভিনয় না-হইলে অনেক সু-নাটকও মাঠে মারা যায়। রসশিল্পের অণুমাত্র ব্যতিক্রম না-করিয়া বরং নাট্যশিল্পের চরমোৎকর্ষের সহিত যিনি সম্প্রদায়বিশেষের শক্তি ও সামর্থ্য উপযোগী নাটক লিখিতে পারেন, তাঁহারই নাটক শুধু যে তাৎকালিক রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব বিধান করে এমন নহে, নাট্যসাহিত্যেও তাহা চিরদিনই আদর্শরূপে আপনার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র থিয়েটারের জন্য বই লেখেন নাই ; গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যে সম্প্রদায়ের জন্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশ অনুসারে তাঁহাকেও এই উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের তারতম্য করিতে হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত খাতারও এইজন্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ন্যাশানাল থিয়েটারের আমলে জগৎ সিংহের ভূমিকা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিতেন ; ঐ ভূমিকায়ও সেইভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং ওসমান অপেক্ষা তখন জগৎ সিংহই অভিনয়ে ফুটিত অধিক। ওসমান উপন্যাসেও যেমন, নাটকেও তেমনই উপনায়ক (sub-hero) হইয়াই থাকিতেন।

পুরুষ চরিত্রেও যেমন, স্ত্রী চরিত্রেও তেমনি দেখা গিয়াছে, অভিনেত্রীর শক্তি ও স্বভাব বুঝিয়া গিরিশচন্দ্রকে উপন্যাস-বর্ণিত স্ত্রী চরিত্রের উপর নানাভাবে রং ফলাইতে হইয়াছে। এইজন্যই কখন তিলোত্তমা নায়িকারূপে দেখা দিয়াছে, কখনও বা আয়েষা উপনায়িকা (sub-heroine) হইলেও তিলোত্তমাকে চাপা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যখন স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত বিমলা সাজিতেন, তখন আবার লিপিচাতুর্য্যে ও অভিনয়নৈপুণ্যে বিমলাই দর্শকের চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করিত। বঙ্গের অভিনেত্রীকুলরাজ্ঞী বিনোদিনীকে প্রয়োজনানুসারে কখন আয়েষা, কখনও বা তিলোত্তমা সাজিতে হইয়াছে। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভাগুণে এবং গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান ও লিপিকৌশলে, তিনি যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন সেই ভূমিকাই উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইত। কিন্তু এ সকল শোনা কথা, ইঁহাদের এই সকল ভূমিকার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়

আমি দেখিয়াছিলাম। সম্প্রদায়ের সার্বর্থা অনুসারে এই সময় গিরিশচন্দ্র নূতন করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' ড্রামাটাইজ করেন। এবারে আয়েষা শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী, ওসমান শ্রীযুক্ত দানীবাবু এবং বিমলা তিনকড়ি। এবারের অভিনয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল আয়েষা ও ওসমান। গিরিশচন্দ্র দুই-এক রাত্রির জন্য বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ছাপাইয়া আয়েষা ও ওসমান রঙ্গমঞ্চে দর্শকের চিত্তকে অধিক বিভ্রান্ত করেন।

নাটকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল আয়েষাকে ক্রমশঃ বর্ষার মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় আমরা বিষাদ-আচ্ছন্ন দেখি। উপন্যাসে এই বিষাদ গাঢ় হয় আয়েষার জগৎ সিংহকে পত্র লেখার পরিচ্ছেদে। এই বিষাদ উপন্যাসে গাঢ়তর হইয়াছে, যেখানে সে তিলোত্তমাকে অলঙ্কার পরাইয়া বিদায় লইতেছে। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে যখন তিলোত্তমা [আয়েষা] গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গের পরিখা-জলে নিক্ষেপ করিল, তখন এই অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র ভারে ভারে বিষাদরাশি লইয়া পাঠকের সম্মুখে এক অপরূপ বিষাদ-ভারানত-মহিমময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। রঙ্গমঞ্চে তিলোত্তমার নিকট বিদায়ের দৃশ্যে নাট্যকারকে বঙ্কিম-বর্ণিত আয়েষাকে ফুটাইবার জন্য নূতন করিয়া কিছু লিখিতে হয় না। কিন্তু পত্র লেখার দৃশ্যে যেখানে সুদীর্ঘ স্বগত উক্তি ভিন্ন মনোভাব প্রকাশের অন্য কোন উপায় নাই, যে দৃশ্যের সাফল্য নির্ভর করে কেবলমাত্র অভিনেত্রীর অসীম গুণপনা ও অভিনয়নৈপুণ্যের উপর, এবং যেখানে অভিনেত্রীকে সাহায্য করে নাট্যকারের লেখনী—গিরিশচন্দ্রের নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সেই দৃশ্যের অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে পড়িবে,—একজন পরিচারিকা আর আসমানিকে অলক্ষ্যে রাখিয়া তাহাদের কথোপকথনে নাট্যকার কী কৌশলে এই দীর্ঘ পত্রের একমুখী তরঙ্গকে ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং অভিনেত্রীও সেই সুযোগ পাইয়া কী অতুলনীয় অভিনয়-ভঙ্গিমায় আপনার চক্ষের জলে দর্শকের চক্ষে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছেন। তাহার পর, উপন্যাস-বর্ণিত শেষ দৃশ্যের কথা। উপন্যাসে এই শেষ দৃশ্যের পর আর কিছু জানিবার বা দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কবির বর্ণনায় আমরা আয়েষার অঙ্গুরীয় নিক্ষেপে দেখি, এ সেই আয়েষাই বটে—যে একদিন মুক্তকণ্ঠে নিশীথে কারাগারে ওসমান ও জগৎ সিংহের সম্মুখে বলিয়াছিল—"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!" যে দৃঢ়তা লজ্জাবনতমুখী কুসুমকোমলা আয়েষাকে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুখরা করিয়াছিল, সেই দৃঢ়তাই আত্মহত্যার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া আজ তাহাকে সত্যসত্যই রমণীললামভূতা করিয়াছে। উপন্যাসে এ দৃশ্যে আয়েষা যেমন সমুজ্জ্বল, রঙ্গমঞ্চের উপর কেবলমাত্র

স্বগত-উক্তিকারিণী আয়েষার সে ঔজ্জ্বল্য কোথায় ? ওসমানকেও আমরা উপন্যাসে হারাইয়া আসি জগৎ সিংহের সঙ্গে তাঁহার দ্বৈতযুদ্ধে। উপন্যাসের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাঁহাকে না-পাইয়াও তাঁহার জন্য আর কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকের চিত্ত আপনা হইতেই প্রশ্ন করে, ভগ্নহৃদয় প্রত্যাখ্যাত ওসমানের কী হইল ? নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই দুই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষ দৃশ্যে। এখানে বিষাদময়ী আয়েষা বিষাদ-আচ্ছন্ন ওসমানের সঙ্গে কথোপকথনে আপনি ফুটিয়াছে, ওসমানকে ফুটাইয়াছে। স্থান বিষাদময়—নীলবর্ণ গগনমণ্ডলে লক্ষ লক্ষ তারা যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, পেচক ধূৎকারে আয়েষার কর্ণে অবিরাম ধ্বনি তুলিতেছে—বিষাদ—বিষাদ ! গরলাধার অঙ্গুরীয় বলিতেছে, আর কেন, এ জীবন তো বিষাদময়, এস আমার সাহায্যে এ যন্ত্রণার শেষ কর।

গরীয়সী আয়েষা নারীসুলভ দুর্ব্বলতাকে পায়ে দলিয়া পরিখা-জলে অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে ওসমান প্রবেশ করিল, বলিল,—ওসমানের বাক্যে সেই জ্বালা, সেই তীব্র ব্যঙ্গ—"নবাবপুত্রী, একবার দেখতে এলেম। তুমি কেমন আছ দেখতে এলেম, দেখা দিতে এলেম, কেমন আছি বলতে এলেম। দেখছি বড় বিষণ্ণ, কিন্তু কেন ? এত ভালবাসার প্রতিদান পাও নি ?" আয়েষা বলিতেছে—"ওসমান, আমি প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষিনী নই। যদি তোমার তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়, তিরস্কার কর। ওসমান, তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আমি জানি। আমিও বড় কষ্ট পেয়েছি। কী ক'রব ওসমান, আমি নিরুপায়।"

দুই সমব্যথী—দুই বাল্য সহচর সহচরী ; প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়, হতাশ প্রণয়ে দু-জনেরই চিত্তে অশান্তি ! সে শ্রী নাই, সে রস নাই, হৃদয় যেন তপ্ত অঙ্গারের আধার। আয়েষা বলিতেছে—"ওসমান, আমি নারী হ'য়ে সহ্য করচি, তুমি কেন পারচ না ?" উত্তরে ওসমান বলিতেছে—"একবার তোমায় দেখে যাই, কেমন আছ, দেখে যাই ; তুমি কী সহ্য করেচ ? তুমি কদিন জগৎ সিংহকে রুগ্নশয্যায় শুশ্রূষা করেচ ? আমি রণে বনে দুর্গমে শয়নে স্বপনে দিবারাত্রি তোমায় দেখেছি। কী সহ্য করেচ ? আমার মত সহ্য কর নি, আমার মত সহ্য কর নি।"

মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত আয়েষার অস্ফুট কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"হা জগদীশ্বর !" যবনিকা পড়িল, দর্শক পূর্ণ-বিষাদের দুইটী চিত্র তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্য এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে—উপন্যাসের মূল চরিত্রকে অটুট রাখিয়া নাটকীয় সম্পদে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

'সীতারামে'ও গিরিশচন্দ্র এইরূপ একটা গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন —'সীতারামে'র শেষ দৃশ্যের অবতারণায়। উপন্যাসে আছে, শ্রী গঙ্গারামের শব দাহ করিয়া অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। আর রামচাঁদ শ্যামচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে জানাইয়া দিল, মুরশিদাবাদে সীতারামকে নাকি শূলে দিয়াছে; কিংবা "সেই দেবতা" আসিয়া সীতারামকে কোথায় লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে রামচাঁদ শ্যামচাঁদ এই বলিয়া তামাক টানিয়া সাজিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর এ সকল দৃশ্যের কোন সার্থকতা নাই। এত বড় একটা বিয়োগান্ত কাব্য, রঙ্গমঞ্চে তাহার পরিণতিও তদুপযোগী বিয়োগান্ত দৃশ্যে হইলেই সঙ্গত ও শোভন হয়। উপন্যাস পড়িয়া এই বিয়োগান্ত রসের কোন ব্যতিক্রম আমরা উপলব্ধি করি না, কিন্তু অভিনয়কালে শেষ দৃশ্যে এইরূপ তামাক টানিয়া সাজিলে গুড়ুকখোর দর্শককেও দুলিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সীতারাম চরিত্রের বিয়োগব্যঞ্জিত সুরকে অব্যাহত রাখিয়া নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীর সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয় চরিত্রকেই এমনিভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা সত্যই অতুলনীয়। সর্বস্বহারা পরাজিত সীতারাম রণক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন; উদ্‌ভ্রান্ত সীতারাম বুঝিতে পারিতেছেন না, তিনি কোন্ সীতারাম! যবনবিধ্বংসী, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম, না শ্রীর প্রেমে উন্মত্ত সীতারাম? এমন সময় সন্ন্যাসিনী শ্রী পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিতেছে, "আমায় গ্রহণ কর।" সম্মুখে শ্মশান, পশ্চাতে শ্মশান, ঊর্ধ্বে শ্মশান-ধূম, পদতলে হিন্দু-মুসলমানের রক্তরঞ্জিত কর্দম, আর তাহারই মাঝখানে সেই সীতারাম, সেই শ্রী! যেন সমস্ত উপন্যাসের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নরনারীর জীবন-আখ্যায়িকা, মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাহার পরিপূর্ণ স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। শ্রী বলিতেছে, "মহারাজ, আমায় গ্রহণ কর।" সীতারাম বলিতেছে, "করব, তোমায় গ্রহণ করব, কিন্তু কোথায় গ্রহণ করব? অট্টালিকায় তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সেখানে রমা মরেছে; নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সোনার মহম্মদপুরী ভস্মীভূত হয়েছে; কুটিরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, কুটির শূন্য ক'রে কুটিরবাসী পালিয়েছে। করব, তোমায় গ্রহণ করব, আমার এখনও মমতা যায় নি, চল, স্থান খুঁজিগে চল, স্থান খুঁজিগে চল।" উন্মত্ত সীতারাম অনন্তের ক্রোড়ে স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে নদীগর্ভে আশ্রয় লইলেন। শ্রী তাঁহার অনুসরণ করিল। নাটকাকারে 'সীতারামে'র পরিসমাপ্তি এইখানে। নাটকের শেষ হইল,—দর্শকের চিত্ত-নিবদ্ধ বিষাদ-বাষ্প যেন সীতারামের সঙ্গেই কোন অনির্দিষ্ট কল্পনার রাজ্যে গিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাসে শূন্যে মিলাইল। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা অভিনেত্রীও এই দৃশ্যে তাহাদের

অভিনয়কলার চরম বিকাশের সুযোগ পাইল। এই দৃশ্যের অভিনয়ে—সীতারাম-রূপী গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীর ভূমিকায় স্বর্গীয়া তিনকড়ি বা শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ অভিনয় জগতের যে কোনও রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত।

অনেকে বলেন, উপন্যাস হইলেও 'কপালকুণ্ডলা' একখানি শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক জগতে ইহার স্থান কতটুকু জানি না, কিন্তু কল্পনার রাজ্যে ইহা তুলনা-রহিত। শকুন্তলা ও মিরাণ্ডার সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনামূলক সমালোচনা অনেক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চরিত্র বা উপন্যাসের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। রঙ্গমঞ্চের দিক হইতে দর্শক ইহাকে কীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কীভাবে ইহা নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে, আমরা কেবল সেই কথাই বলিব।

কপালকুণ্ডলার ন্যায় নিছক কবিত্বপূর্ণ চরিত্রের অভিনয় সচরাচর জমে না; কারণ এরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা এবং রঙ্গমঞ্চে তাহার বিকাশ যে-সে অভিনেত্রীর দ্বারা সম্ভবপর হয় না। এই সকল কবিত্বপূর্ণ ভাবপ্রবণ চরিত্রগুলি প্রায়ই নাটকে বেশী কিছু কাজ করে না; ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রী কাজ করে, কাজেই পারদর্শিনী অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত না-হইলে, অভিনয়ে এই সকল চরিত্র বড় প্রাণহীন মনে হয়। এইজন্যই অভিনয়ে দেখা গিয়াছে, মতিবিবি দর্শকের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করে, কপালকুণ্ডলা তাহা করিতে পারে না। উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা নায়িকা, কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে চাপা দিয়া মতিবিবি ফুটিয়া উঠে এবং এই মতিবিবিই দর্শকের চিত্তে অবসাদ আসিবার সুযোগ দেয় না। আর গদ্য-কাব্য হইলেও এই কারণেই একটু ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিলেই রঙ্গমঞ্চে কপালকুণ্ডলা বেশ জমে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের আমলে শ্রীমতী বিনোদিনী কপালকুণ্ডলার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তখন শুনিয়াছি, বিনোদিনীর অভিনয়নৈপুণ্যে রঙ্গমঞ্চেও কপালকুণ্ডলাই উচ্চস্থান অধিকার করিত। কপালকুণ্ডলার ভূমিকা অভিনয়ের এই যে সাফল্য তাহা কেবল অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত গুণপণা ও কৃতিত্বের জন্য।

১৮৯০ কি ৯১ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে আমরা প্রথম 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় দেখি; সে অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাকে চাপা দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল মতিবিবি। তখন মতিবিবি সাজিতেন স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত। এই অভিনয়ে যাঁহারা প্রধান-প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন, আমার যতদূর স্মরণ আছে তাহা লিখিতেছি।

নবকুমার সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু। মহেন্দ্রলালের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার কণ্ঠস্বরে; দুঃখাত্মক ভূমিকা, হতাশ প্রেমিকের ভূমিকা তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেমন খাপ খাইত, তেমন আর কাহারও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই তাঁহার নামের তখন বিশেষণ দেওয়া হইত "The Tragedian". কাপালিক সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় মতিলাল সুর। উগ্র নিষ্ঠুর প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার কাপালিক এখনও রঙ্গমঞ্চে অনুকৃত হয়। মতি-বিবির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুকুমারী দত্ত একাধারে সু-গায়িকা ও সু-অভিনেত্রী ছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই যে 'কপালকুণ্ডলা' ড্রামাটাইজ করা হয়, তাহাতে মতিবিবির চরিত্রে অনেকগুলি গান এইজন্যই সংযোজিত হইয়াছিল। সে গানগুলি এত মনোরম ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, এখনও পর্য্যন্ত সেই গানগুলি লোকের মুখে-মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই 'কপালকুণ্ডলা'র সময় গানগুলির সুর সংযোগ করিয়াছিলেন—সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর। কপালকুণ্ডলা—শ্রীমতী হরিমতি (ব্লাকী), পেশমান—স্বর্গীয়া কুসুম-কুমারী (খাড়কাটার কুসুম)। এই কুসুমকুমারীও সুগায়িকা ছিলেন বলিয়া পেশ-মানের ভূমিকায়ও অনেকগুলি গান দেওয়া হয়। এখনও রঙ্গমঞ্চে এই সকল গান খুব প্রশংসার সহিত গৃহীত হয়। এমারেল্ড থিয়েটারের জন্য 'কপালকুণ্ডলা' ড্রামা-টাইজ করেন স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র। অতুলকৃষ্ণ সুকবি ছিলেন। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে। তাঁহার রচিত বহু গীতিনাট্টিকা বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার আদরের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং সে সব অভিনয়ে কোনদিনই দর্শকের অভাব হয় নাই। ছোট কথায় মর্ম্মস্পর্শী গান তিনি অতি সহজেই বাঁধিতে পারি-লেন! দ্বৈতসঙ্গীত রচনায় তাঁহার জোড়া ছিল না, আর এইজন্যই তাঁহার রচিত সঙ্গীত আজও রঙ্গমঞ্চে জীবিত। অতুলকৃষ্ণ সুকবি ও নাট্যকার হইলেও 'কপাল-কুণ্ডলা' তিনি যেভাবে ড্রামাটাইজ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা গিরিশচন্দ্রের অনু-মোদিত হয় নাই; আর অনুমোদিত হয় নাই বলিয়াই গিরিশচন্দ্র প্রায় সাতাশ কি আটাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং 'কপালকুণ্ডলা' ড্রামাটাইজ করেন। বিস্তারিতভাবে আলোচনা না-করিয়া দুই-একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা গিরিশচন্দ্র ও অতুলকৃষ্ণের খাতার তারতম্য কোথায় তাহাই দেখাইতেছি।

অতুলকৃষ্ণ কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখাইয়াছেন—স্থান,—বালিয়াড়ী, দূরে নদী-গর্ভে নৌকা দেখা যাইতেছে, কপালকুণ্ডলা কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিল,

"বাবা, ওটা কি বাবা?

কাপালিক।...গঙ্গাসাগর যাত্রীর নৌকা...।

কপালকুণ্ডলা। ওতে কারা আছে?

কাপালিক। ওতে মানুষ আছে।

কপালকুণ্ডলা। হাঁ বাবা, মানুষ কি বাবা?" ইত্যাদি।

ইহা সেই *Tempest*-এর অনুকরণ, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য নাই; কারণ গ্রন্থের কয়েক পরিচ্ছেদ পরেই কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে বলিতেছে, "যখন তোমার শিষ্য এসেছিল, তখন আমায় তার সঙ্গে যেতে দাও নি কেন?"

অতএব সে মানুষ চিনিত এবং ইহার পূর্বে নৌকা দেখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে মনে করিয়া লইতে পারি। কাজেই অতুলকৃষ্ণের কপালকুণ্ডলার এই প্রথম প্রবেশ ও তাহার এই উক্তি একটা প্রকাণ্ড ন্যাকামীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এখানে বঙ্কিমের উপর কলম চালান নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে দর্শকের সম্মুখে প্রথম ধরিয়াছেন যেমন আমরা উপন্যাসে দেখি, ঠিক তেমনই। সে পথহারা নবকুমারকে দেখিয়া বলিতেছে, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" নবকুমার যে পথিক, কপালকুণ্ডলা তাহা চিনিয়াছিল; তাহার এই প্রথম উচ্চারিত সম্বোধনই দর্শককে স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয় যে, "মানুষ কি বাবা?" বলিবার মত অবস্থা তাহার কোনকালেই ছিল না। শুধু এক-স্থানে নয়, অতুলকৃষ্ণের 'কপালকুণ্ডলা'র অনেক স্থানেই এমন অনেক কথা আছে, যাহা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বিরোধী। গিরিশচন্দ্র অতি সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত কপালকুণ্ডলাকে রঙ্গমঞ্চে কথা কহাইয়াছেন। তিনি অভিনয় জমাইবার খাতিরে কপালকুণ্ডলার মুখে অসঙ্গত বাক্য কিছুই দেন নাই। চটির দৃশ্যে, যেখানে মতিবিবির সহিত তাহার প্রথম দেখা হইল, সেখানে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথনে দুই-চারিটী কথায় গিরিশচন্দ্র বনবিহঙ্গীর ন্যায় স্বভাব-মুগ্ধা সরলা কপালকুণ্ডলাকে দর্শকের সম্মুখে অবিকৃতভাবেই ধরিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা নব-কুমারকে বলিতেছে—"সমুদ্র এখান থেকে কত দূর? আমি যেন এখানে ব'সে সেই কল-কল্লোল শুনতে পাচ্ছি" ইত্যাদি।

কপালকুণ্ডলার এই ভাবের দুই-চারিটী কথায় দর্শককে বিনা আড়ম্বরে বুঝাইয়া দিতেছে যে, সে হিজলী ত্যাগ করিলেও হিজলী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। যে বনে, যে সমুদ্রতীরে সে পালিতা হইয়াছিল, সেই সমুদ্র তখনও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিতেছে। সে সেখান হইতে যতদূরেই যাক্-না কেন, এই বন্ধনই বুঝি আমরণ

তাহার সঙ্গে-সঙ্গে যাইবে। এই যে ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ, ইহাই নাট্যকারের লিপি-চাতুর্য্য।

ক্লাসিকের জন্ত গিরিশচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'র যে ড্রামাটাইজ করেন, তাহাতে বিশেষ-বিশেষ ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম দিতেছি।—

নবকুমার—স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমরেন্দ্রবাবু এই ভূমিকায় সুখ্যাতি লাভ করেন। কাপালিক সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক। অঘোরবাবু সু-গায়ক ছিলেন। এমারেল্ডের কাপালিক গাহিতে পারিতেন না; অঘোরবাবুর জন্ত গিরিশ-চন্দ্র কাপালিকের মুখে একটী গান দিয়াছিলেন। নবকুমারকে বধ্যভূমি দেখাইয়া কাপালিক গাহিতেছে—তাহার প্রথম লাইনটী এই,—

"নররুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে"

গানটী এমন সুরে ও ভঙ্গিমায় গীত হইতে যে দর্শক সভাই শিহরিয়া উঠিতেন। কপালকুণ্ডলা সাজিতেন সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী; মতিবিবির ভূমিকা লইয়াছিলেন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী। এই অভিনয়ে তখনকার রঙ্গমঞ্চে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রতিযোগিতায় তখনকার মিনার্ভা থিয়েটার অংশকক্ষের 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় আয়োজন করিয়াছিল। সেখানে মতিবিবির ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসীকে। নবকুমার দেওয়া হইয়াছিল প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষকে এবং কাপালিক দেওয়া হইয়াছিল এখনকার প্রবীণ কিন্তু তখনকার নবীন উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেবকে। গিরিশচন্দ্র মতিবিবির চরিত্রচিত্রণ এমন নিপুণতার সহিত নাটকাকারে-গ্রথিত-পুস্তকে করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীও এরূপ সুন্দর ও সঙ্গত অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সে অভিনয় দেখিয়া সকলকেই বলিতে হইয়াছিল, মতিবিবির পুরাতন ধারা তারাসুন্দরী বদলাইয়া দিয়াছিলেন। যে দৃশ্যে মতিবিবি পেশমানকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দিয়া আগ্রা হইতে চিরবিদায় লইতেছে, সেই দৃশ্যে, গিরিশচন্দ্র কয়েকটী ছত্রে মতিবিবির চরিত্রের এমন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন এবং মতিবিবিও অভিনয়ে এমনই মর্ম্মস্পর্শীভাবে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, আজও তাহা দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।—মতিবিবি পেশমানকে বলিল,

"আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকতে, জল অধোগামী কেন?

পেশমান। কেন?

মতিবিবি। ললাট-লিখন।...পেশমান, তুই-ই সুখী। রূপের মোহিনী কখনও তোর নয়নপথে পতিত হয় নি; তোর পূর্ব্বস্মৃতিতে সুন্দর স্বামীর গলে বরমাল্য

প্রদান নেই। আবার অনেক দিনের পর সে সুন্দর মূর্ত্তি তুই দেখিস নি, তার কথা শুনিস নি, তার দ্বারা বিপদে উদ্ধার হ'স নি, তার যত্ন পাস নি, মুমূর্ষু অবস্থায় তার কাঁধে ভর দিয়ে চলিস নি—সে যে আবার অন্যের হয়েছে—এ জ্বালা কখনও সহ্য করিস নি; পেশমান, আমার প্রাণ বড় অসুখী!"

উপন্যাসে এই পরিচ্ছেদ-শেষে আছে, পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল, পাষাণ দ্রব হইতেছিল। রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র সে দ্রবীভূত পাষাণ, মতিবিবির মুখে ভাষায় দেখাইয়াছেন, নহিলে দর্শকের চিত্ত দ্রব হয় কি করিয়া?

[১৬]

১৩১৩ সালের ২রা আষাঢ় (১৯০৬। ১৬ জুন) গিরিশচন্দ্রের এবারের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাসিম' খোলা হয়।

'মীরকাসিমে'র প্রথম রাত্রের বিক্রয় এক হাজার আশী টাকা। দ্বিতীয় রাত্রে এক হাজার ষোল, তৃতীয় রাত্রে এক হাজার পনের, চতুর্থ রাত্রে এক হাজার আটাশ টাকা। ইহাও 'সিরাজদ্দৌলা'র ন্যায় একাদিক্রমে পঁচিশ রাত্রি চলিয়াছিল এবং ইহার শেষ রাত্রির বিক্রয় পাঁচ শত সত্তর টাকা।

ইহার গড়পড়তা প্রতি রাত্রির বিক্রয় নয় শত টাকা। 'সিরাজদ্দৌলা' হইতে 'মীরকাসিমে' টাকার দিক হইতে দুই শত টাকা সুর চড়িয়াছে। পাঠকের বোধহয় স্মরণ আছে 'সিরাজদ্দৌলা' খুলিবার কিছু পূর্বে আমি মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করি; তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর থিয়েটার করিব না, কিন্তু আমি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই। মিনার্ভায় 'মীরকাসিমে'র যখন চতুর্থ কি পঞ্চম রজনীর অভিনয় চলিতেছে, সেই সময় আমার অকৃত্রিম সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঁয়ার আমাকে ষ্টারে লইয়া যান। আমি গিয়া দেখি ষ্টারে ক্ষীরোদবাবুর 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'র রিহার্স্যাল চলিতেছে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নূতন নাটক লিখিয়া অভিনয় করার দুঃসাহস ষ্টারের বোধহয় এই প্রথম। যখন মিনার্ভায় 'মীরকাসিমে'র ষষ্ঠ অভিনয় সেই সময় ষ্টারে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' খোলা হইল। অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনা লিখিব না; কারণ উভয় নাটকই প্রধানতঃ মীরকাসিম চরিত্র লইয়া লিখিত হইলেও ইহার গল্প-বিন্যাসপদ্ধতি বিভিন্ন; সুতরাং তুলনায় সমালোচনা একক্ষেত্রে মূল্যহীন; বিশেষতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ রাজ আজ্ঞায় নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকাভুক্ত; সুতরাং ইহাদের লইয়া সমালোচনা একেবারেই অচল। ষ্টারে মীরকাসিম সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয়

অমৃতলাল মিত্র ; তাঁহার অভিনয় যে অপূর্ব্ব হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ষ্টারে অমৃতলাল যখন মীরকাসিম সাজিতেন তখন শরীর তাঁহার ভাঙিয়াছে, তাহার সেই বীরোচিত দীর্ঘ বপু ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই বিচিত্র স্বরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য তাঁহার সেই পরিচিত কণ্ঠকে মমতার আবেগে তখনও বাহু বেড়িয়া ধরিয়া আছে, পরিত্যাগ করিতে পারে নাই !

সিংহ স্থবির, রোগ-জীর্ণ, কিন্তু তবু সেই বৃদ্ধ কেশরী 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে' মাঝে-মাঝে যে বিদ্যুতের চমক দিতেন তাহাতে দর্শকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'র মীরকাসিমই অমৃতলালের নূতন নাটকে শেষ ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম ষ্টারে গিয়া আমি তাঁহার সহিত এই নাটকে একটী ছোট ভূমিকা অভিনয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করি ; আমি সাজিয়াছিলাম মোহনলাল। এই প্রথম পরিচয় হইতে আমি অমৃতলালের নিকট যে অমায়িক ব্যবহার, যে উৎসাহ, যে প্রীতি, যে স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার এই ক্ষুদ্র নটজীবনে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে সব কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল, এখন মিনার্ভার কথাই বলিতেছি, তাহাই বলিয়া যাই।

এই সময় একই নাটক যতই জমুক-না কেন সপ্তাহে একবারমাত্র অভিনীত হইত। 'মীরকাসিম' যখন সতেজে চলিতেছে, সেই সময়ে রবিবারের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য একখানি নূতন বই খুলিবার প্রয়োজন হইল। মিনার্ভায় তখন তিনজন নাটাকার বিদ্যমান—গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র। ১৩১৩ সালে ২৮শে ভাদ্র রবিবার অতুলবাবুর নূতন অপেরা 'শিরী-ফরহাদ' খোলা হইল। আমার মনে হয়, লেখনীকে অনেকদিন বিশ্রামদানের পর অতুলবাবুর এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

'শিরী-ফরহাদ' খুব জমিয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতুলবাবুর অপেরা লিখিবার হাত ছিল খুব ভাল। তিনি এই 'শিরী-ফরহাদ' হইতে আরম্ভ করিয়া মিনার্ভায় যে কয়খানি বই দিয়াছিলেন, তা[হা]র একখানিও 'ফেল' হয় নাই। ভাল অপেরা ভালভাবে অভিনীত হইলে, সে যে ষ্টেজ-জমান নাটকের মতই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে যুগে লিখিত অতুলবাবুর গ্রন্থগুলি। এইখানে বিক্রয়ের একটু হিসাব দিতেছি, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

'হিন্দা হাফেজ' ও 'তুফানী'		'দুলিয়া'		'তুফানী' ও 'নূরজাহান'	
১ম রাত্রি—	১২২৮৲	১ম রাত্রি—	৬৩৮৲	১ম রাত্রি—	৬৩০৷৹
২য় "	১২০৮৲	২য় "	৮০২৷৹	২য় "	৭২৫৲
৩য় "	১১২৩৲	৩য় "	৮০৫৷৹	৩য় "	৮৩৯
৪র্থ "	১১২০৲	৪র্থ "	৬৮৮৷৹	৪র্থ "	৮০১৲
৫ম "	১০৪১৲	৫ম "	৭৭৯৲	৫ম "	৯৪৭৷৹
৬ষ্ঠ "	১০০৮৲	৬ষ্ঠ "	১০০৯৲	৬ষ্ঠ "	৯৬৫৷৹
৭ম "	১০৯৯৲	৭ম "	৭৪৯৲	ইত্যাদি—ইত্যাদি—	
৮ম "	১০৪০৲	৮ম "	৭৫১৲		
৯ম "	১২৪৪৲	৯ম "	৭২৯৲		
		১০ম "	১০৪৬৲		

অতুলবাবুর এই সমস্ত বইয়ের রিহার্সাালের ভার থাকিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের উপরে। এই যে বই জমান, ইহার অনেকখানি কৃতিত্ব অর্দ্ধেন্দুশেখরের। তাঁহারই শিক্ষকতাগুণে 'তুফানী'র মত একখানি ছোট বইও—কয়েকটী তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা এবং সঙ্গীত দলের কয়েকজন অভিনেত্রী এমন জমাইয়া তুলিয়াছিল, যাহার ফলে মিনার্ভা এক সময় পড়িতে-পড়িতেও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই যে ছোট বই কেমন করিয়া জমিল, তাহা বুঝাইতে গেলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আমার কর্ত্তব্য। অর্দ্ধেন্দুশেখর শুধুই বড় নট ছিলেন না—তিনি খুব বড় শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু শুধু বড় নট ও বড় শিক্ষক বলিলেও তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ বলা হয় না। তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি কীরূপ ছিল—আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর পারি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে পাঠকগণ বিশেষতঃ অভিনয়শিক্ষার্থিগণ যদি তাঁহার শিক্ষাদান-কৌশলের কিছু আভাস পান, তাহা হইলে আমার চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বড় নট সম্বন্ধে লিখিয়া বুঝাইবার বিশেষ কিছু নাই। অমৃতলাল ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—"দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায়!"—কথাটা খাঁটি সত্য। রঙ্গমঞ্চের উপর হইতে অপসৃত হইলেই নটকে সকলে ভুলিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হইতে যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, সে ঘন-ঘন করতালি, সে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি, সে উত্তেজনা, সে অবসাদ, সে হাসির রোল, তাহার তো কোন চিহ্নই

থাকে না! রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহারা মুখ লুকাইয়া কাঁদে! সমব্যবসায়ী না-হইলে সমাজের আর কেহ যবনিকার অবগুণ্ঠন সরাইয়া নটের কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি বড় দেখে না, আর দেখিলেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, কী প্রকার সে মোহিনী শক্তি যাহার প্রভাবে নট রঙ্গমঞ্চের উপর হইতে সহস্র-সহস্র দর্শককে হাসাইতেন, কাঁদাইতেন, ভাবাইতেন ও মাতাইতেন! গ্যারীকের অভিনয় দেখিয়া দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হইত, আপনাকে ভুলিয়া যাইত, উত্তেজনা ও অবসাদের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের একপ্রকার সাময়িক মোহ হইত, আর সে মোহকে লোকে বলিত—'গ্যারীক ফিবার।' কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সে 'গ্যারীক ফিবার' যে কী, গ্যারীকের জীবনী পুনঃ-পুনঃ পাঠ করিলেও তাহা বুঝা যায় না।

বাঙ্গলায় অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন বড় অভিনেতা ছিলেন। যাঁহারা ইউরোপে নানা দেশীয় রঙ্গমঞ্চে বড়-বড় অভিনেতার অভিনয় দেখিয়াছেন, আর বাঙ্গলায় অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইউরোপে জন্মিলে তিনি ইউরোপের নট-তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। অথচ অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই অপূর্ব্ব অভিনয়ভঙ্গী যে কেমন, তাহা লিখিয়া জানান অসম্ভব। কতকগুলি বাছা-বাছা বিশেষণ ছাড়া নটের অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নই থাকে না, এবং সে সব বিশেষণ পড়িয়াও সাধারণ পাঠকের কিংবা রঙ্গজীবীরও বিশেষ কোন লাভ হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুশেখর কেবল নট ছিলেন না, তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য্য; শিক্ষকতায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সুতরাং নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বুঝিবার বা জানিবার সুযোগ এখন আর না-থাকিলেও আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি হইতে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। আমি সৌভাগ্যবশতঃ বহু বর্ষ ধরিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের রিহার্সাল দেওয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এবং তাঁহার নিকট কিছু-কিছু শিখিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম। কাজেই কীভাবে তিনি প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন, সংক্ষেপে আমি আজ তাহাই বলিব। ইহাতে সাধারণের না-হউক, প্রথম শিক্ষার্থিগণের কিছু উপকার হইতে পারে।

প্রথম শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষণীয়—সু-আবৃত্তি করা। আগে এই আবৃত্তির কথাই কিছু বলিব।

উচ্চারণের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। চরিত্রভেদে তিনি উচ্চারণের তারতম্য করিতেন। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা—লঘু, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের প্রয়োগ তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া শিখাইতেন। হ্রস্ব দীর্ঘের মাত্রা বজায় রাখিয়া তিনি যাহা

পাঠ করিতেন, তাহা বড়ই শ্রুতিমধুর হইত, কোনমতে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখে এই উচ্চারণভঙ্গী যেমন মিষ্ট লাগিত, অনেক সময়ে তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যার মুখে তেমনি মিষ্ট লাগিত না। তাঁহার মুখে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক,—অন্তের মুখে অনেক সময়েই তাহা শ্রুতি-কটু ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত। ছন্দ কাটিয়া যাইত, কিংবা উচ্চারণের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া ভাব বেচারী মাঠে মারা যাইত।

এই উচ্চারণ 'দুরস্ত' করিবার নিমিত্ত তিনি প্রথম শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত স্তবস্তোত্র পাঠ করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাতে জিভের আড় ভাঙ্গে; আর উচ্চ-কণ্ঠে ছন্দ ও মাত্রা বজায় রাখিয়া সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করায়,—নটের আর একটা বড় লাভ হয়—তাহার দম বাড়ে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রকেও বলিতে শুনিয়াছি, বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিলে নটের ইহকালে প্রত্যক্ষ লাভ হয়—তাহার দম বাড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুর ছেলের পরকালের জন্যও কিছু পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে।

প্রত্যেক শব্দটীর প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, আবৃত্তি এমনই হইবে যেন প্রত্যেক কথার অর্থ, রস ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। অনেক নট মোটামুটি আবৃত্তি করেন মন্দ নয়, কিন্তু নাটককার প্রত্যেক কথাটী ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন করিয়া যেমনভাবে বসাইয়াছেন, তাহার প্রতি অনেক সময়েই আবৃত্তিকারীর লক্ষ্য থাকে না। ইহাতে নাট্যকারের শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্য 'মাঠে মারা' যায়। ব্যষ্টিকে লইয়া সমষ্টি, সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক ভাব প্রকাশও হয় না। কিন্তু এইরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণের ও প্রত্যেক কথায় অর্থ ও রসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবৃত্তি করায় আর একটা বিপদ আছে। বলিবার অভ্যাস স্বভাবে পরিণত না-হইলে এই আবৃত্তি অনেক সময় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে।

অভিনয়কালে, দীর্ঘ বক্তৃতা বলিবার সময়, অনেক অভিনেতাকেই হাঁপাইয়া পড়িতে দেখা যায়। অনেকে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করেন—কিন্তু প্রত্যেক ছেদের পূর্ব্বের কথা দমের অভাবে ডুবিয়া যায়, শ্রোতারা শেষের কথাগুলি শুনিতে পান না; এবং শেষের কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলেন, মনে হয় যেন তিনি মোট ফেলিয়া বাঁচিলেন। আবৃত্তির পক্ষে ইহা অতি নিন্দনীয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষার্থীকে প্রথমেই বলিতেন, "দেখ বাপু, লোকে পয়সা খরচ ক'রে তোমার কথা শুনতে এসেছে। গ্যালারীর যে দর্শক আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে সকলের শেষ বেঞ্চে বসে, সে যদি তোমার সব কথা শুনতে না-পায়, তাহ'লে মনে রেখো তুমি তাকে

আট গণ্ডা পয়সা ঠকালে। এরূপ জুয়াচুরি করবার কোন অধিকার তোমার নেই; প্রত্যেক কথাগুলি সুস্পষ্ট হবে, আর তা অডিটরিয়ামের সকল স্থান থেকেই শোনা যাবে, এমনিভাবে বলা অভ্যাস কর।" বলিতে-বলিতে যাহাতে বে-দম না-হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার উপদেশ ছিল, একটা দীর্ঘ ছত্র বলিবার পূর্ব্বে এক পেট নিশ্বাস টানিয়া লওয়া, এবং ধীরে-ধীরে নিশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে ছত্রটী শেষ করা। ছত্র সুদীর্ঘ হইলে বা আবৃত্তিকারীর দমে না-কুলাইলে মাঝে-মাঝে চোরা দম লইবার ব্যবস্থাও ছিল। এই চোরা দম খুব বেশী অভ্যাসের কাজ। চুরির বাহাদুরী, যদি না-পড়ে ধরা। অনেক কাঁচা চোর এই চোরা দম লইতে গিয়া আপনাদের অক্ষমতাকে সুস্পষ্ট করিয়া শ্রোতাকে ধরাইয়া দেন। তাঁহারা যখন আবৃত্তি করেন, তখন দম লইবার সময় তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে — এমনি বোমা বসাইলে "কোঁক" বাহির না-হইলেও — 'কোঁক্ — কোঁক্' করিয়া একরূপ বিকৃত শব্দ বাহির হয়। এইরূপ আবৃত্তি করাকে 'গুলটানা' বলে। নাক দিয়া নিশ্বাস না-লইয়া মুখ দিয়া তাড়াতাড়ি নিশ্বাস টানিতে গেলেই — এই গুলটানার শব্দ জোরের হইয়া পড়ে। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই গুলটানা আবৃত্তির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।

শিক্ষাদানকালে অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থীকে লইয়া হাসির হররাও উঠিত। 'নীলদর্পণে' এক পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিরাজের ভূমিকা আছে। কবিরাজ বলিতেছেন, "ডাক্তারী চিকিৎসা বড় ব্যয় বাহুল্য"। এই "ব্যয় বাহুল্য" কথাটা পূর্ব্ববঙ্গীয় ধরনের উচ্চারণ শিখাইবার সময় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি হাস্যজনক। অভিনেতা কিছুতেই বলিতে পারিতেছেন না — "ব্যাবাহুল্য!" অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহাকে বলিলেন, "পাঁঠা কি করিয়া ডাকে?" উত্তর — "ব্যা-ব্যা।" "আচ্ছা, এইবার বল 'ব্যা-বা হুল্য!'" শিক্ষাদানও হইল, হাসিরও রোল উঠিল।

শিক্ষাদানকালে উচ্চারণের প্রতি তিনি কীরূপ লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা বলিলাম। কিন্তু কেবল উচ্চারণই অভিনয়ের সবটা নহে। চরিত্রেরও conception (অনুধ্যান) এবং তদাশ্রিত রসের বিকাশই অভিনয়ের প্রাণ। সুমিষ্ট স্বর — যে স্বর ইচ্ছামত ও সহজে উচ্চ ও নিম্ন গ্রামে আনা যায়, সেই স্বরই বহু রসবিকাশের উপযোগী। এইরূপ গলা তৈয়ারী করিতে রীতিমত সাধিতে হয়। সংস্কৃত স্তবাদি পাঠ ও আবৃত্তি [illegible] শব্দ দম বাড়াইতে হয়, তেমনি উচ্চৈঃস্বরে — 'মেঘনাদবধ', 'পলাশীর যু[illegible] ক্ষর ছন্দে লেখা কোন নাটক হইতে উত্তেজনাপূর্ণ কোন অংশ লইয়া নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবৃত্তি করিতে হয়। এবং এইরূপ

আবৃত্তি করিবার সময় ভাব ও সু-উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে, গলাও সহজে তৈয়ারী হইয়া যায়।

স্বর তৈয়ারী হইলে স্বর-সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এই স্বর-সংযম কী? অভিনয়কালে প্রতি অভিনেতা যদি উচ্চকণ্ঠে অভিনয় করিয়া যান, তাহা হইলে অভিনয় নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত চেষ্টা করা,—যতটা সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে অভিনয় করা। গলা গভীর না-হইলে নিম্নস্বরের উচ্চারিত কথা গ্যালারী পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন অনুসারে স্বর গম্ভীর ও উচ্চ করিবার নামই স্বর-সংযম। অনেকে বড় অভিনেতার অভিনয় অনুকরণ করিতে গিয়া—স্বর-সংযমের অভ্যাস বা শক্তি না-থাকায়, অভিনয় এমন শ্রুতিকটু করিয়া ফেলেন যে তাহা দর্শকের নিকট নিতান্ত একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুশেখর এইরূপ বিকৃত ও অস্বাভাবিক অভিনয়ের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁহার বরাবরই চেষ্টা ছিল, তাঁহার নিকট যাঁহারা শিখিবেন, তাঁহারা যেন অভিনয় করিতেছি—এমনই একটা বিকট ভঙ্গীর সহিত অভিনয় করিয়া রসের বিপর্যয় না-করেন। কিন্তু ইহার ফলে—অনধিকারীর হাতে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষায় একটা উল্টা বিপত্তিও হইত। অভিনয়কে স্বাভাবিক করিতে গিয়া অনেকে এমন স্বাভাবিক করিয়া ফেলিতেন যে, অনেক সময় তাঁহাদের অভিনয় ডাল-ভাত খাওয়ার মত অত্যন্ত ম্যাদমেদে হইয়া পড়িত। শুধু আবৃত্তি ও উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিনয়কে এইরূপ স্বাভাবিক করিতে গেলে অভিনয় প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে। অভিনেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় দুইটি দল আছে। একদল স্বাভাবিক অভিনয়ের পক্ষপাতী আর একদল একটা-না-একটা বিশেষ ভঙ্গীর সহিত অভিনয় করিয়া থাকেন। এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের দলের পক্ষপাতী দলের লড়াই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। কোনটা যে ঠিক তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন এবং দর্শকরাও যে, যেটি ঠিক, অভিনয়কালে তাহার মূল্য ধরিয়া দেন না, তাহাও নহে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "অভিনয় জিনিষটাই ঠিক স্বাভাবিক নহে। ইহা —an if natural।" বঙ্কিমবাবুর ভাষায় ইহাকে "স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত" বলিতে পারা যায়। নাটকে বাস্তবও আছে, স্বভাবাতিরিক্তও আছে। যাহা বাস্তব, তাহার অভিনয়ে স্বাভাবিকতার প্রয়োজন; যাহা স্বভাবাতিরিক্ত, কাল্পনিক, তাহার সুর বস্তুতন্ত্রের ঊর্দ্ধে বাঁধা। স্বাভাবিক কান্না, নাটকের কান্না নহে, কারণ উভয়ের ভাষায় বিভিন্নতা বর্ত্তমান। নাটকের পাত্রপাত্রী বিশেষ-বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে ফুটিয়া উঠে। লিয়রের অভিশাপ প্রদান, আর রাম শ্যামের স্বাভাবিকভাবে

অভিশাপ প্রদানের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। অভিশাপদানের উপলক্ষ্য স্থান ব্যক্তি ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া মহাকবির লেখনী যে ভাষা প্রসব করিয়াছে,—অভিনয়ে তাহার রস ফুটাইতে হইলে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতা দুইয়েরই মিশ্রণ প্রয়োজন। এইরূপ মিশ্রণে যে অভিনয় হয়, তাহাতেই art ফুটিয়া উঠে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর সুর-বর্জ্জিত আবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, যাহাতে blank verse গদ্যের ন্যায় উচ্চারণে অভিনীত হয়। সুরটানা বা সুরেলা অভিনয় তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। পাঠক দেখিবেন—ইহাও ঐ স্বাভাবিক অভিনয়ের ঝোঁকের ফল। আজিকালি এই সুর-বর্জ্জিত অভিনয়ের দিকে অনেক অভিনেতার ঝোঁক অধিক। ইহা অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রবর্ত্তন। তাহার সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার দিকেও অর্দ্ধেন্দুশেখরের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তিনি শিক্ষাদানকালে ক্রমাগত expression ও অঙ্গাদির সুষ্ঠু চালনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। কলের পুতুলের মত একস্থানে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সু-আবৃত্তি ও সু-অঙ্গ চালনার দিকে তাঁহার সমানই দৃষ্টি থাকিত। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অত্যধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা অভিনয়কে হাস্যজনক করিয়া তুলে। 'মেঘনাদবধে'র—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা!
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ বলে
কাতর—"

রাবণের এই অংশের অভিনয় তিনি অত্যধিক অঙ্গভঙ্গী সহকারে এমন করিয়া বলিতেন যে, তাহা যে শুনিত সে হাসিয়া লুটাপুটি যাইত। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবদ্দশায় এদেশে বায়স্কোপের ততটা প্রচলন হয় নাই; সবে আমদানী হইতে শুরু হইয়াছে। আমাদের দেশে যে জিনিষ আসে তা সে বিলাতী মদই হউক—আর আচার-ব্যবহারই হউক, আমরা প্রথমে ব্যবহার করি তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া। কয় বৎসরের মধ্যে বায়স্কোপের চলন দেশে খুবই হইয়াছে। বায়স্কোপের দর্শকও থিয়েটারের দর্শক অপেক্ষা অধিক। এই বায়স্কোপ প্রচলনের পর হইতে দেশে অভিনয় সম্বন্ধেও একটা নূতন অনুকরণের প্রবল বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। বাক্যহীন ভাষাহীন মূক অভিনয় এক—আর স-বাক অভিনয় আর। কিন্তু প্রথম অনুকরণে কোন জিনিষেরই সংযমের বাঁধ থাকে না। অনেক স্থানে—এই বায়স্কোপী অনুকরণে অভিনয় নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কুস্তীর প্যাঁচ-কসার মত হইতেছে। ইহা art-এর পরিপন্থী। স্বর-

সংযমের ন্যায় অঙ্গভঙ্গীর ও ভাবের অভিব্যক্তির জন্য মুখের মাংসপেশীর সঙ্কোচ-প্রসারণেরও সংযম-জ্ঞান থাকা অভিনেতার একান্ত আবশ্যক। অভিনয় কসরৎ নহে, কুস্তীর প্যাঁচ নহে, ইহা সৌন্দর্য্যের জনক। রসের পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।

যাক, আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, এখন তাহাই বলি।

১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' খুব ধুমধামের সঙ্গে খোলা হইল। 'নূরজাহানে'র প্রথম কয়রাত্রির বিক্রয় খুব ভালই বলিতে হইবে, কিন্তু ইহা 'সিরাজদ্দৌলা' কিংবা 'মীরকাসিমে'র মত চলিল না। ইহার বিক্রয় ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে ৮ম অভিনয় রাত্রে হইল ১৩৬৲ টাকা। নবম রাত্রে ইহার সঙ্গে 'আলিবাবা' জুড়িয়া ৩৪৯৲ টাকায় দাঁড়াইল। এই সময় মিনার্ভার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। সে সময় হাতের কাছে এমন কোন নাটকও ছিল না, যাহার সাহায্যে এই ধাক্কা সামলান যায়। গিরিশচন্দ্র তখন কোন্নগরে। কর্ত্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না-দেখিয়া, অতুল বাবুকে মলেয়ারের *The Blunderer* বইখানি বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করিতে বলেন। সোমবারে বই লেখা আরম্ভ হইল - সঙ্গে-সঙ্গে রিহার্সালও চলিল। বই ছোট—দুই অঙ্কের, নাম হইল 'তুফানী'। ১৩১৫ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ—'নূরজাহানে'র দশম অভিনয় রজনীর সঙ্গেই 'তুফানী' খুলিয়া বিক্রয় হইল ৬৩০ টাকা। এই বিক্রয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া প্রায় হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। 'তুফানী'র এরূপভাবে জমিবার প্রধান কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতা। অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেও এই বইএ একটা ছোট পার্ট লইয়াছিলেন।

১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে আমি মিনার্ভা থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করি। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়ী হাইকোর্টের প্রকাশ্য নীলামে খরিদ করিলেন—আমাদের বাল্যবন্ধু শরৎকুমার রায়। শরৎবাবুর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া রাখি। ইঁহার নিবাস—নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছি গ্রামে। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার রায় এম.এ., বি.এল. হাইকোর্টের উকীল ও কুড়ুলগাছির জমীদার। শরৎবাবু বি.এ. পাশ করিয়া কণ্ট্রাক্টারী করিতেন। মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় ইঁহার একজন অন্যতম অংশীদার ছিলেন। যে সময়ে মনোমোহনবাবু মিনার্ভার একমাত্র স্বত্বাধিকারী, সেই সময় শরৎবাবু প্রায় নিত্যই থিয়েটারে যাতায়াত করিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ বাবুটী কে?" এই জিজ্ঞাসার কারণটুকুও এখানে

বলিয়া রাখি। তাহা শুনিলে পাঠকবর্গ, গিরিশচন্দ্রের লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা কীরূপ ছিল, তাহাও একটু বুঝিতে পারিবেন।

সেদিন 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় হইতেছিল, যোগেশ—গিরিশচন্দ্র। বিক্রয় খুব বেশী, রঙ্গালয় দর্শকে পরিপূর্ণ। ভিতরে—অভিনয়ের অবসরে যেখানে গিরিশবাবুর কাছে আমরা দু-চারজন বসিয়া ছিলাম, শরৎবাবু হঠাৎ সেইখানে আসিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ—কী বিক্রী!"

তারপর শরৎবাবু চলিয়া গেলে—গিরিশবাবু যখন জানিতে চাহিলেন—"বাবুটী কে?" উত্তরে আমি বলিলাম, "মনোমোহনবাবুর বিশেষ বন্ধু।" গিরিশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধুত্ব আর বেশীদিন থাকবে না।"

সকলেই বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মশাই?" গিরিশবাবু উত্তর করিলেন, "শুনলে না ওঁর কথা, কীভাবে বললেন, "উঃ কি বিক্রী?" এই বিক্রী দেখে ওঁর আনন্দ হয় নি। ওঁর মনে দারুণ লোভ আর হিংসা জন্মেছে। দেখে নিও, ইনি এককালে থিয়েটার করবেন, তখন আর বন্ধুত্ব থাকবে না।" ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে শরৎবাবু সত্যই ক্লাসিকের বাড়ী ক্রয় করিয়া থিয়েটার করেন এবং সেই থিয়েটারের নাম হয় কোহিনূর থিয়েটার।

এই কোহিনূর খুলিবার আগে আমি প্রায় আট মাস কাল স্টারে ম্যানেজারভাবে কার্য্য করিতেছিলাম। শরৎবাবুর ক্লাসিকের বাড়ী কেনা হইলে, আবার থিয়েটার করিবার জন্য কোমর বাঁধিলাম। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর দু-জনেই তখনও মিনার্ভায়। আষাঢ় শ্রাবণে—গিরিশবাবুর নূতন বই 'ছত্রপতি' খোলা হইবে—ইহা বাজারে কানাঘুষা শুনা যাইতেছে। আমরা থিয়েটারের বাড়ী তো লইলাম, কিন্তু কাহাকে লইয়া থিয়েটার খুলিব?—দল কোথায়? বই কোথায়? শ্রদ্ধেয় চুনীলাল দেব—চুনীবাবু, তাঁ[হা]র ভাই নিখিলবাবু, এবং আর-আর যে সব এ্যাক্টর-এ্যাক্ট্রেস বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের লইয়াই স্বতন্ত্র দল গড়া হইবে, কোন থিয়েটার হইতে কাহাকেও ভাঙান হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পরামর্শ-পর্ব্বেই চুনীবাবুর সহিত নানা বিষয় লইয়া মতের গরমিল হইল। তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। দল ভাঙাইয়া দল গড়া ভিন্ন আমাদের তখন আর উপায়ান্তর রহিল না। পরামর্শ করিবার জন্য আমরা প্রথমে গেলাম স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকটে। তিনি বরাবরই দল ভাঙানর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনিও পরামর্শ দিলেন—নূতন লোক লইয়া শিখাইয়া দল তৈয়ারী কর। আমরা বলিলাম, কোন আপত্তি নাই, যদি তিনি আমাদের আচার্য্য হইয়া নূতন দল তৈয়ারীর ভার গ্রহণ

করেন। দুই-চারিদিন পরামর্শের পর অমৃতবাবু বলিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, যদি তাঁহাকে ছয় মাসের সময় দেওয়া হয়। যদিও তিনি তখন ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী, কিন্তু ষ্টারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। ক্ষীরোদবাবুর 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'নন্দকুমার' আর্থিক হিসাবে বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। তখন কেবল একা মিনার্ভাই জোর চলিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথও তখন গ্রাণ্ড থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা অমৃতবাবুর কথায় সম্মত হইতে পারিলাম না। কারণ, ছয় মাস অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। আমাদের ঘাড়ে তখন থিয়েটারের ভূত চাপিয়াছে। শরৎবাবু অমৃতবাবুকে বলিলেন, "আমরা ছয় মাস অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক মাসের নোটিস দিয়া আসিতে সম্মত হন, আমরা ছয় হাজার টাকা বোনাস ও আপনার মর্য্যাদা অনুরূপ এ্যালাওয়েন্স দিতে প্রস্তুত আছি।" অমৃতবাবু বলিলেন, "দেখুন এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেলে আমার খুব উপকার হয় বটে, কিন্তু আমি হঠাৎ কী ক'রে ছেড়ে যাই? আপনারা যদি অপেক্ষা করতে না-পারেন তো অন্য চেষ্টা দেখুন।" আমরা অন্য চেষ্টাই দেখিলাম।

থিয়েটারের বাড়ী লইয়া পর্য্যন্ত আমরা গিরিশবাবুর নিকট যাই নাই। বাড়ী মেরামত ও দৃশ্যপটাদির জন্য ধর্ম্মদাস সুরকে লওয়া হইয়াছিল মাত্র। অমৃতবাবুর নিকট ধাক্কা খাইয়া এইবার আমরা গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। গিরিশবাবু বলিলেন যে, "একা গিয়া নূতন করিয়া দল গড়িবার মত স্বাস্থ্য ও বয়স আমার নাই, এবং সেভাবে নূতন দল গড়িতে সময়ও লাগিবে প্রায় এক বৎসর—সে খরচও বড় কম নয়। তার চেয়ে তোমরা অন্য সব থিয়েটার হইতে বাছিয়া-বাছিয়া লোক ভাঙ্গাইয়া লও। আর, আমি একা গেলেও, আমার হাতে কোন বই মজুদ নাই—আমার 'ছত্রপতি' মিনার্ভায় রিহার্স্যালে পড়িয়াছে, সে বই ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই।"

আমরা গিরিশবাবুর ইঙ্গিত গ্রহণ করিলাম। নূতন নাটকের জন্য ষ্টার হইতে ভাঙ্গান হইল ক্ষীরোদপ্রসাদকে, আর মিনার্ভা হইতে লওয়া হইল হাবুবাবু, মণ্টুবাবু, শ্রীমতী তিনকড়ি ও কিরণবালাকে। ন্যাশানাল হইতে ভাঙ্গান হইল রাণুবাবু ও তারাসুন্দরীকে। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র তখন কোন থিয়েটারে ছিলেন না, তিনি সকলের আগেই আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পর মিনার্ভা হইতে দানীবাবুকে ভাঙ্গাইয়া লওয়া হয়। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারের অবস্থা হইল এই—"আজ যারে হেরি, কাল না নেহারি।" আমরা ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিলাম

না। প্রত্যেকের নাম লিখিয়া তালিকা বাড়াইব না। সকলের শেষে গিরিশচন্দ্র এই দলে আসিয়া যোগদান করিলেন। তখনকার দিনে একটা নূতন থিয়েটার করিতে হইলে কীরূপ অর্থ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইত, এই কোহিনূরের প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

যখন অমৃতবাবু আসিলেন না, গিরিশবাবুও যখন বলিলেন, বাহির হইতে নাটক যোগাড় কর, তখন আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইল ক্ষীরোদবাবুকে দলে আনা। ক্ষীরোদবাবু কি সহজে আসিতে চাহেন? তিনি 'জেনারেল এসেম্ব্লি'র (এখন যাহার নাম 'স্কটিশ চার্চ') প্রফেসারি ছাড়িয়া ষ্টারে কায়েমী হইয়া বসিয়াছেন। 'প্রতাপাদিত্যে'র পর তাঁহার প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু আমাদের তখন 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ক্ষীরোদবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যখন আমরা হালে পানী পাইলাম না, তখন গিয়া সুরেশবাবুকে ধরিলাম। তাঁহারই মধ্যস্থতায় ক্ষীরোদবাবু ষ্টার ছাড়িয়া কোহিনূরে আসিয়া যোগ দিলেন। বই লেখা আরম্ভ হইল—'চাঁদবিবি'। দানীবাবুকে ভাঙাইয়া আনিতে তিন হাজার টাকা বোনাস লাগিল। শ্রীমতী তিনকড়িকে হাজার, তারাসুন্দরীকে হাজার, আর সব—পাঁচশো আড়াইশো ইত্যাদি।

নাট্য-যজ্ঞের ষোড়শোপচারে পূজার সমস্ত আয়োজনই হইয়াছে—বাকী কেবল প্রধান পুরোহিত গিরিশচন্দ্র। এই ভাঙনের মুখে মিনার্ভা যায়-যায়, ষ্টারের অবস্থাও তথৈবচ। মিনার্ভা কতকটা সামলাইবার জন্য লইয়াছিলেন অমরেন্দ্রনাথকে, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন, অতুল মিত্রও ছিলেন, তবু তাঁ[হা]রা গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িতে নারাজ। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি,—এগ্রিমেন্ট থাকা সত্ত্বেও মনোমোহনবাবু দানীবাবুকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গিরিশবাবুর এগ্রিমেন্ট ছিল না। গিরিশবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের কথাবার্ত্তা হয়, সে সময় ষ্টারও গিরিশচন্দ্রকে দলে পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মিনার্ভার মহেন্দ্রবাবু তো গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে ধন্না দিয়াছিলেন, পাছে বিপক্ষ দল তাহাকে ছিনাইয়া লয়।

গিরিশবাবুকে ভাঙাইয়া কোহিনূরে আনিবার মূল পাণ্ডা ক্ষেত্রবাবু ও আমি। আমরা নিরিবিলি কথা কহিব বলিয়া গিরিশবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখি—মহেন্দ্রবাবু আসর জমাইয়া বসিয়া আছেন। আমরা বেগতিক দেখিয়া—উপরে উঠিবার সিঁড়ির পাশে গোয়ালঘরে আশ্রয় লইলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মহেন্দ্রবাবু উঠিলেন, আমরা ভাবিলাম এইবার গিয়া আসন দখল করিব। ও হরি! মহেন্দ্রবাবুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে খবর আসিল, ষ্টারের হরিবাবু আসিতেছেন! রাত্রি অমাবস্যা

কিনা মনে নাই, নক্ষত্র অন্ধোবা কি মথা জানি না, কিন্তু সেই সিঁড়ির পাশে পরিত্যক্ত গোয়াল — নিষ্প্রদীপ — নিস্তব্ধ ! সেখানে আমি এবং ক্ষেত্রবাবু এই দুইটী প্রাণী, আর অসংখ্য মশা। বাগবাজারের সবই কি বড় — এক একটা মশা মৌমাছির চেয়েও বৃহৎ। সিগারেটের ধোঁয়ায় তাহাদের আর কত তাড়াইব ? রাত্রি দশটা হইতে ক্রমে একটা বাজিল — মহেন্দ্রবাবু গেলেন, হরিবাবু গেলেন। আমরা বসিয়া মিনিট ও ঘণ্টা গণিতেছি ; — এক-একজনের যাওয়া-আসা তো নয় ! আমাদের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে — গিরিশবাবুকে কে দলে টানিয়া লয় ! ষ্টারে যান, কি মিনার্ভায় থাকেন ? বনে কি পর্ব্বত-গুহায় তপস্যা কি এর চেয়েও কঠোর ? হায় — থিয়েটার করিবার বাতিক ! তুমি সেই প্যাণ্ডোরার মশা তাড়ান হইতে কোহিনূরের পর্ব্ব পর্য্যন্ত একভাবেই আছ ! যাহা হউক, এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলাম আমরাই। গিরিশবাবু ষ্টারে গেলেন না, মিনার্ভাও তাঁহাকে রাখিতে পারিল না, আমরা তাঁহাকে দশ হাজার টাকা বোনাস ও বেতন মাসিক পাঁচ শতে রাজি করাইয়া কোহিনূরে আনিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলাম।

আমার যতদূর মনে হয়, গিরিশবাবু মিনার্ভায় পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন — ১৩১৪ সালের শ্রাবণের মাঝামাঝি সময়ে। কারণ, অমরবাবু মিনার্ভার ম্যানেজার বলিয়া ঘোষিত হন — ১৩১৪ সালের শ্রাবণের ২১শে হইতে। যাক্‌, ক্ষীরোদবাবু প্রায় এক মাসের মধ্যেই 'চাঁদবিবি'র চতুর্থ অঙ্ক শেষ করেন, কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের কয়েকটি খণ্ডিত দৃশ্য ছাড়া আর কিছু লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই পঞ্চম অঙ্কের ভার গিরিশবাবুকেই লইতে হইয়াছিল।

'চাঁদবিবি' খুবই জমিল। খুবই জমিল বলিলেও ঠিক বলা হয় না। কারণ 'চাঁদবিবি'র প্রথম রাত্রির বিক্রয় ছাব্বিশ শত টাকা। স্থান থাকিলে বোধহয় আরও ছাব্বিশ শত বিক্রয় হইত। সে সময়ে শনি ও রবি উভয় দিনে একই পুস্তক অভিনয়ের রীতি ছিল না ; থাকিলে বোধহয়, খুব শীঘ্রই শরৎবাবুর খরচ উঠিয়া যাইত। এই 'চাঁদবিবি'র প্রধান ভূমিকাগুলির তালিকা দিলাম।

আদিল শা	...	৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
ইব্রাহিম	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
এখ্‌লাশ খাঁ	...	৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
মিয়ানমঞ্জু	...	৺অটলবিহারী দাস
রঘুজী	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
মাল্লজী	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চাঁদবিবি	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
খোশিবাই	...	৺তিনকড়ি
মরিয়ম	...	শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট)
তাজবিবি	...	৺কিরণবালা

এমন সমারোহের সহিত অভিনয় ইতঃপূর্ব্বে আর কোন রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় নাই। আমরা এইখানেই প্রথম পর্ব্ব শেষ করিলাম।

নির্দেশিকা

—